কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন

কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন

ডঃ দীপক চন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুয়ারী
১৯৬৩

শ্রীরণধীর পাল

ও

শ্রীমতী মন্দিরা পাল

প্রিয়বরেষু

॥ দৃষ্টিকোণ ॥

মহাভারতের বিশাল ক্যানভাসে লেখা আমার উপন্যাসগুলোতে মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রের এক অন্যস্বাদ সৃষ্টি করেছি। কিন্তু ঐ কাহিনীতে একটা প্রধান চরিত্রের নীরব কার্যকলাপকে বলতে ভুলে গেছিলাম। দ্বীপবাসী অনার্য রমণীর কানীন পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস শুধু মহাভারত রচয়িতা নন, নিজেই একজন কুশীলব। বলতে ভুলে গেছলাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্রষ্টা তিনি; কৃষ্ণ নন। মহাভারত কাহিনীর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত আছেন তিনি। এত প্রচ্ছন্নভাবে আছেন যে তাঁকে কয়েকবার খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা গিয়েছিল। কখনই মনে হয় না তাঁর কলকাঠি নাড়ায় মহাভারত যুদ্ধ হয়েছে।

এর অর্থ যেন না কেউ মনে করেন আমি তাকে অশ্রদ্ধা করছি। ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ঐতিহাসিকও বটে। ইতিহাস রচনায় তিনি নিরপেক্ষ নন, কেন? স্বয়ং পাণ্ডব পক্ষে অনেক সহায়তা করলেন কেন? ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের সঙ্গে তার সমান সম্পর্ক। তবু ধৃতরাষ্ট্র এবং তার পুত্রদের সব কাজের বিরোধিতা করলেন। কেন? তার জীবনে কি কোন কষ্ট ছিল? নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় ব্যথা তার লুকোন ছিল। আলোচ্য উপন্যাসে আমি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের জীবনে সেই দুঃখ. কষ্ট, বেদনা ও বঞ্চনাকে আবিষ্কার করিছি।

মহাভারত কুরু বা পুরু বংশের পারিবারিক ইতিহাস। শান্তনু থেকে তার সূত্রপাত। এখান থেকে পুরু বংশের অভ্যন্তরে এক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হল। এর স্রষ্টা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তাই পুরুবংশের নতুন কালের বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্বৈপায়নের জন্মবৃত্তান্ত এসেছে অনিবার্যভাবে। কাহিনীকারের বর্ণনা অনুসরণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্যাসদেব জারজ পুত্র হলেও তার শরীরে পুরু বংশের রক্তের ছিটে ফোঁটা আছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পুরু বংশের জিন তার শরীরে ছিল এটা বোঝাতে রাজা উশীনরের গল্প। পুরু বংশোদ্ভূত নৃপতি উশীনর কামমোহিত হয়ে বলপূর্বক অনার্য রমণী অদ্রিকার কৌমার্য হরণ করল। এই অবাঞ্ছিত মিলনে অদ্রিকার গর্ভে পুরু বংশের রক্তে জন্ম হল সত্যবতীর। পরাশর মুনির কাম চরিতার্থ

করতে সত্যবতীর গর্ভে যে শিশুটির জন্ম হল সেও তার জননীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পুরু বংশের রক্ত পেল। সুতরাং পুরু বংশের উত্তরাধিকারীর সংকট মোচন করতে পুরু বংশের রাজমহিষী সত্যবতী গর্ভজ জারজ পুত্র দ্বৈপায়নকে দিয়ে এক জারজ বংশ সৃষ্টি করল। কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্ররা কেউই একেবারে বংশ ছাড়া হল না।

বিরোধের সূচনা এখানে। এ বিরোধ ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের। বললে ভুল হবে না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—দুই ভাইর সেই বিরোধের পরিণতি। ভীষ্ম ও কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দুই ভাই। এঁদের উভয়ের মাতা ও পিতা আলাদা। তবু এরা ভাই হল পরস্পরের। তাদের ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধের সূত্র সত্যবতী।

বিরোধের উৎপত্তি নিয়তি নির্বন্ধ। মানুষের কোন হাত ছিল না। তবু সত্যবতী তার নিমিত্ত হল। সত্যবতীর পালক পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ভীষ্ম চিরকুমার থেকে গেল। সংকটের সূত্রপাত এখান থেকে। শান্তনু ও সত্যবতীর বিবাহের ফলে আর্য-অনার্যের মিলন যেমন ঘটেছিল, বিবাদও চলেছিল। ভীষ্মর সঙ্গে সত্যবতীর এবং তার গর্ভজ পুত্র অনার্য দ্বৈপায়নের। মহাভারতের কাহিনীতে ভীষ্মকে যত মহৎ করেই দেখানো হোক; সত্যবতী কখনও তাকে সে চোখে দেখেনি। মহাভারতে ভীষ্মর সঙ্গে দ্বৈপায়নের সম্পর্ক কেমন ছিল তাও ভাল করে আঁকা নেই। কিন্তু তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কৌরব-পাণ্ডবের শিবিরে দু'জন পৃথক পৃথকভাবে যোগ দিয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের উপর যে অবিচার, অন্যায়, অপরাধ করুক না কেন, ভীষ্ম কখনও তার প্রতিবাদ করেনি। নীরব দর্শক হয়েছিল। কূটবুদ্ধির প্যাঁচে কে কতখানি জয় আদায় করে নিতে পারে তার জন্যে পাণ্ডবদের গিনিপিগের মত ব্যবহার করা হয়েছিল।

অথচ এমনটা যে ঘটতে পারে বা ঘটা আদৌ সম্ভব মহাভারতের পাঠকের মনে তার কোনো পূর্বাভাষ ছিল না। বেদব্যাস, ভীষ্ম দু'জনই ব্রহ্মচারী, দুজনই অকৃতদার। ভীষ্ম বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর, দ্বৈপায়ন সৌম্য সাধু সন্ন্যাসী মানুষ। সুতরাং, ঘর সংসার, ছেলেপুলে নিয়ে কোন বিরোধ সংঘাত যে তাদের হবে না এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু ভাই-পো'দের নিয়ে লড়াইটা হল তীব্র। আলোচ্য গ্রন্থে তার উপর মনস্তত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের আলো ফেলে ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের দুঃখ, ব্যথা ও বিরোধ বিদ্বেষের ক্ষেত্র চিহ্নিত করিছি।

মানুষের সমস্ত কর্মধারায় পেছনে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক সর্বদা কাজ

করে। ডেসডিমনার রুমাল হারানোর মত তুচ্ছ একটি ঘটনা যেমন ওথেলোর মনকে এক লহমায় বিষিয়ে দিয়েছিল, তেমনি কুৎসিৎ দর্শন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দ্বৈপায়নকে বরণ করতে বিচিত্রবীর্যের শ্বেতাঙ্গিনী প্রধান মহিষী অম্বিকার মনে যে অজস্র কুণ্ঠা, দ্বিধা, জড়তা আর ভয় সঞ্চার হয়েছিল তা মুহূর্তে ব্যাসদেবের কাছে এক ভয়ংকর কৃষ্ণাঙ্গ ঘৃণা অপমান ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপার হয়ে উঠল! ব্যাসদেবের মন থেকে অম্বিকার ঐ অবহেলার নিদারুণ ব্যথা আর কোনদিন মুছল না। অম্বিকার অপমানের অনাদরের সব রাগ গিয়ে পড়ল তার অন্ধ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের উপর। ভয়ংকর প্রতিশোধ-স্পৃহায় দ্বৈপায়ন ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠুর হল। দ্বৈপায়ন সারা জীবন ধরে তার অমঙ্গল এবং ক্ষতিই কামনা করল শুধু। ভীষ্মও গোপনে তাকে হস্তিনাপুরের মাটি ও পরিবার থেকে উৎখাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হল। কিন্তু সত্যবতীর অধিকার সূত্রে হস্তিনাপুরের উপর ব্যাসদেবেরও একটা দাবি ও অধিকার জন্মেছিল। কিন্তু ভীষ্ম তাকে গোপনে উৎখাত করার যে ষড়যন্ত্র এবং কৌশল করল ব্যাসদেব তাকে ভাল মনে নিল না। দ্বৈপায়ন তার দাবি ও অধিকার ফিরে পেতে নিজের অজান্তে ভীষ্মের সঙ্গে এই হস্তিনাপুরের সঙ্গে এক গোপন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এর বিষফল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে আমি অন্যান্য উপন্যাসে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই বলেছি। এখানেও তার ব্যতিক্রম করিনি। কেবল দ্বন্দ্বের পরিবেশ ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। গোটা মহাভারত কাহিনী ও যুদ্ধ এই দুই ভাইয়ের বিরোধ ও বিদ্বেষের ফলশ্রুতি। শ্রীকৃষ্ণ রাজনৈতিক ঘটনার রাশ ধরেছিল আর ব্যাসদেব তার ভেতরটা জীর্ণ করার ইন্ধন জুগিয়েছিল।

এক

জঙ্গলের সরু পথ ধরে দ্বৈপায়ন একা একা চলেছে হস্তিনাপুরের দিকে। সংসারত্যাগী, স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল, শান্ত তপোবনবাসী, সাধকের অন্তঃকরণ সহসা জননীর আহ্বানে কিছু চঞ্চল। এই কথাটা পথে যেতে যেতে দ্বৈপায়ন চিন্তা করছিল। এখন সে বালক নয়, বিগতপ্রায় যৌবন পুরুষ। তথাপি জননীর কথা মনে পড়লে বুকটা ব্যথিয়ে উঠে, শ্বাস দ্রুত হয়। আবার, একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করতে থাকে চারপাশ।

সে ঋষি। ঋষির জীবনে লৌকিক হৃদয়চর্চার কোন স্থান নেই। জপতপ নিয়ম পালনের কঠোরতায় বুকের অভ্যন্তরে ভালবাসার পুকুর শুকিয়ে গেছে, আবেগও ফুরিয়েছে, সংসার ও পরিজনদের প্রতি কোন আন্তরিকতাও অনুভব করে না। তাহলে, ভিতরে ভিতরে এ কোন্ অস্থিরতা সে টের পাচ্ছিল? এই অনুভূতি কিসের? ব্যথা নয়, বেদনা নয়, জ্বালা নয় একটা কিসের ভার যেন হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে আছে।

জঙ্গলের নিরন্ধ্র গাছের শাখায় লুকিয়ে একটু কুম্ভাটুয়া পাখি অবিরাম ডাকছিল। বহুদূর পর্যন্ত তার গুব্ গুব্ একটানা ডাক জঙ্গল ভেদ করে দ্বৈপায়নের কানে আসছিল। পাখিটা চোখে দেখা না গেলেও তার বাদামী রঙের পালকে আবৃত শরীর, লম্বা কালো লেজখানা, কালো মাথা, কুঁচের মত লাল দুটি চোখ দ্বৈপায়ন কল্পনার চোখে দেখতে লাগল। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরেও কুম্ভাটুয়ার ডাক কানে যাচ্ছিল। আনমনা চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে গাছের ডালে পাখিটাকে খুঁজল কিছুক্ষণ।

বেলা দুপুরে চড়া রোদ বাতাসে তেতে উঠেছে। শৈত্যভাবটুকু কেটে গেছে। রোদের তাপে গায়ের চামড়া জ্বালা করছে। তবু, দ্বৈপায়ন রোদ অগ্রাহ্য করে পাখির ডাকে শুনতে লাগল।

কুম্ভাটুয়া কাউকে ডাকছিল না। হয়তো ডাকার মত ওর কেউ ছিল না। তবু এই ঘন গভীর জঙ্গলে ও যে বেঁচে আছে, একেবারে নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব হয়েও যে বেঁচে আছে; এই জানানটাই জানান দিতে যেন ও তারস্বরে ডাকছিল। দিকে দিগন্তরে এই বার্তাটাই যেন পৌঁছে দিচ্ছিল: আমি একা। আমার বুকভরা একাকীত্বের যন্ত্রণা এই হাহাকার আমার সারাক্ষণের সঙ্গী।

চলতে চলতে দ্বৈপায়নের বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। এ ত পাখির ভাষণ নয়, এ তার গভীর অভ্যন্তরের কথা। এই নির্জন বনভূমিতে বাতাসে সেই কথাই ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে দ্বৈপায়ন অনুভব করল সে একা। ভীষণ একা। এই কুম্ভাটুয়া পাখির মতই একা। কিন্তু চিৎকার করে জানানোর মত কথা নেই। তার নিজের কথা এই ফিস ফিস বাতাসের মত তার বুকের ভেতর, অনুভূতির মধ্যে ফিস ফিস করছিল। তার নিজের সব কথাও ভাল করে শোনানোর কোন লোক নেই, যার কাছে দুদণ্ডের জন্য মনটাকে মেলে দিয়ে একটু হাল্কা করে। জননীর আসন্ন সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় কি তার মনটা চঞ্চল?

এই মুহূর্তে দ্বৈপায়ন নিজের ভেতরের প্রতিক্রিয়াটা টের পাচ্ছিল। বুকটা একটু কেমন করছিল। শরীরের ভিতরে একটা চিনচিনে আনন্দের মত কিছু হচ্ছিল। কল্পনেত্রে জননী সত্যবতীর মুখটা হঠাৎ সে দেখল। অমনি বুকে হৃৎস্পন্দনের শব্দ দামামার মত বেজে গেল। ঐ ছোট্ট কল্পনাটুকু দেবলোকের স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ নিয়ে এল। মনে হল, বাৎসল্যের তৃষ্ণা অনন্ত। তার কোন বয়স নেই। সেখানে সবাই চিরশিশু। একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল দ্বৈপায়নকে।

মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত যে চির শিশুটি এতকাল নিদ্রিত ছিল তার ভিতরে, বাল্যে জননীর সংস্পর্শেও যার পুরোপুরি ঘুম ভাঙেনি, সেই শিশুটিকে হস্তিনাপুরের রাজমহিষী যেন জাগিয়ে তুলল আজ। স্নেহ-কাঙাল মনটা অমনি দীন হয়ে গেল, মাথা নুয়ে এল আবেগে। আজ সমস্ত সত্তার ভেতর দ্বৈপায়ন জননীকেই পেতে চাইল।

অকস্মাৎ এক ঝাঁক টিয়া আর ময়নার কিচির মিচির শব্দে দ্বৈপায়নের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। দুটি চোখ শব্দকে অনুসরণ করল। ঝকঝকে রোদে ওদের মসৃণ ডানাগুলো চকচক করে উঠল। নিজের আনন্দে ওরা ডানা ঝাপটায়। এক পাক ঘুরে এসে, ডালে বসে। ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। রমণ করে, শৃংগার করে।

পথ চলতি চিতল হরিণের দল হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়ায়। এক দৌড়ে রোদ্দুরে বাদামী ঝলক তুলে রাস্তা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। শুকনো পাতা মচমচ করে উঠে তাদের পায়ের তলায়। নিজের পায়ের শব্দে চমকে উঠে। ভয়ে ডান দিকের জঙ্গল থেকে বাঁদিকের জঙ্গলে যায়, কেউ আবার দলছুট হয়ে একা একা দৌড়ে মরে।

হেমন্তের দুপুরে একা একা বনের পথে হাঁটতে ভীষণ ভাল লাগে দ্বৈপায়নের।

গভীর জঙ্গল থেকে একটা আশ্চর্য রহস্যময় ফিসফিসানি হচ্ছিল। একা একা পথে চললে কত কি ভাবা যায় নিজের মত। ভাবতে চমৎকার লাগে। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়, টের পাওয়া যায় না।

দ্বৈপায়নের মনে হল জঙ্গলের ফিসফিসানির মতন তার বুকের মধ্যেও ফিসফিস করে কে যেন অজস্র কথা বলছে। চোখের তারায় কত ছবি আঁকা হচ্ছিল তার। মাথার ভিতর দিয়ে খণ্ড খণ্ড মেঘের মত চিন্তা ভেসে যাচ্ছিল। দাসপল্লী, যমুনার উত্তাল ঢেউ, তীরে বাঁধা তরণী, নীল আকাশ, শান্ত চর, দুপাশের উদাসীন তীর, তীরের অনতিদূরে আদিগন্ত বন, পাহাড়—এই সব দৃশ্যের ভেতর এক আর্য ঋষির মুখ উঁকি দিল। তার মত শত্রু দ্বৈপায়নের দ্বিতীয় নেই। তিনি ঋষি পারাশর। পিতা হলেও তার শত্রু। শত্রুতা রক্তের সংস্কারে হৃদয়ের বন্ধনে। তক্ষুণি, কৃষ্ণবর্ণ এক বালকের অসহায় আর্তকান্নার স্বর বুক থেকে উঠে এল যেন। মস্তিষ্কের সকল সীমায় আবদ্ধ হয়ে কেবল এক বদ্ধ কুঠরির মধ্যে বাজতে লাগল আকুল করা 'মা', 'মা' রব। জননীর মুখখানা মনে পড়ল দ্বৈপায়নের।

দ্বৈপায়নের মুখে কথা নেই। যেন এক যন্ত্রণাবিদ্ধ জিজ্ঞাসার কাছে উৎকর্ণ বোবা। ছলছলে চোখে কি গভীর মায়া আর করুণা তার। পরাশরের কাছে ভিক্ষা চাইছে তার কালামানিক কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে। দুচোখের কোণ দিয়ে টপটপ করে জলের ধারা গড়াচ্ছে। মুখমণ্ডল ও গণ্ড প্লাবিত হচ্ছে। অশ্রুপাতে কোন শব্দ নেই। তবু কেঁদে কেঁদে হিক্কা উঠছিল তার। তার দুই হাত পুত্রের দিকে প্রসারিত। মাটিতে মাথা কুটে কত মিনতি জানাচ্ছে। তবু আর্য ঋষির পাষাণ হৃদয় দ্রব হল না। কোন করুণা সঞ্চার হল না। কৃষ্ণবর্ণ ঔরসজাত পুত্রের প্রতি তার কোন অনুকম্পা জাগল না। কালান্তকের মত তাকে মাতৃবক্ষ হতে নিয়ে গেল। মূর্ছা গেল জননী।

এই সব দৃশ্য ও অনুভূতি যা তার ভিতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তা অকস্মাৎ কোথায় যেন একটা ধাক্কা দিল। একটা চমকানো ব্যথায় বুকের ভেতর টনটন করতে লাগল। একটা দুরন্ত অভিমান, রাগ, বিদ্বেষ—এই সবের ইন্ধন পেয়ে হঠাৎ যেন ফুঁসে উঠল। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল পিতার উপর, আর্যদের উপর। অনুভূতিটা আচমকা মনে উদয় হল। বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল পথে কয়েকমুহূর্তের জন্য। তার শান্ত ও হিসেবী মনটা কোন ব্যাপারে অসতর্ক নয়। তাহলে এই ধরনের একটা ধারণা মনে জাগল কেন? এর কোন সুস্পষ্ট উত্তর তার জানা ছিল না। তবে, এই চিন্তাটা মনে হওয়া থেকে একটা স্বস্তি তার ভিতরটায় ছড়িয়ে পড়ল। বারংবার মনে হতে লাগল, একটা কিছু হবে, একটা কিছু ঘটবে জীবনে। একঘেঁয়ে জীবনটা হয়ত নতুন কোন মোড় নেবে। এরকম একটা ভাবনায় তার মনটা প্রসারিত হয়ে গেল বহুদূর পর্যন্ত।

দ্বৈপায়নের দ্বাদশ বছর বয়সের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল তার। দিনটি তার স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

বাইরে ঝিমঝিম করা ভরা দুপুর। গোটা পল্লীটা যেন সূর্যের কড়া রোদের তাপে ঝিমিয়ে পড়েছে। সমস্ত স্থানটা নির্জন, নিরিবিলি অথচ রোদে ঝলমলে। ভরা দুপুরে ঘুঘুর ডাকে এক অদ্ভুত শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

মস্ত ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় একটা বেদীর উপর সত্যবতী দুই হাঁটুর উপর মুখ রেখে থম ধরে বসেছিল চুপচাপ। তার খুব কাছে বসে দ্বৈপায়ন আপন মনে বিদ্যাভ্যাস করছিল।

ছাদের কার্নিসে, বারান্দার রেলিং-এ পায়রারা গদগদ স্বরে এক অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি করল।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে। সূর্য পশ্চিম দিকে একটুখানি হেলেছে। কিন্তু সূর্যের দিকে ভাল করে তাকানো যায় না। ধূ-ধূ করছে নীল আকাশ। স্তব্ধ দুপুরটা যেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে সত্যবতীর মুখের দিকে।

দ্বৈপায়নের পাঠে মন বসল না। গভীর এক দৃষ্টিতে জননীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। অনামনস্ক চোখে সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। সত্যবতীর চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর। কি গভীর মায়া, আর কত ছলছলে, আর কত করুণ। একবার তাকালে আর ফেরান যায় না। ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

সত্যবতী পুত্রকে দেখছিল না। প্রকৃতি দেখছিল। জননীর নির্বিকার ঔদাসীন্য দ্বৈপায়নকে একটু অভিমানী করল। কিন্তু মা যে একটা ভীষণ কষ্ট আর দুঃখে আছে সেটা বালক হলেও টের পাচ্ছিল। তাই সমস্ত মনটা মায়ের দিকে টানছিল। বুকের ভেতর টনটন করছিল। নিজের অজান্তে তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মাতার নীরবতার মধ্যে যে একটা রহস্য আছে তা তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। বিষন্নকণ্ঠে মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত করল। পাঠ ফেলে সত্যবতীর কোল ঘেঁষে দাঁড়াল।

সত্যবতী একটু চমকায়। বিব্রত হয়। অপ্রতিভ হাসে।

একটু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ মাগো তোমাকে গম্ভীর দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে, কষ্ট হয়। ক'দিন হল, তুমি ভীষণ বদলে গেছ।

স্নিগ্ধ ও স্মিতমুখে সত্যবতী দ্বৈপায়নের দিকে কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থেকে তাকে কাছে টেনে নিল। মাথার উপর হাত রেখে বলল ঃ দূর বোকা! চুপ করে থাকলেই বুঝি মনে কষ্ট হয়, দুঃখ হয়? ওসব তোর চোখের ভ্রম।

দ্বৈপায়ন একটু অবাক হয়ে সত্যবতীর দিকে তাকাল। সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে বলল ঃ ভ্রম বলছ কেন? শরীরে ব্যাধি দেখা দিলে, তা প্রকাশ পাবেই। কিছুতে তাকে লুকানো যায় না। তেমনি মনের প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। শীতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা জল শরীরে কোথাও লাগলে গোটা শরীরটাই কুঁকড়ে

আসে। পরিবতর্তনটা শরীরের স্নায়ুতন্ত্রে এত দ্রুত ঘটে যে চক্ষু তাকে ধরতে পারে না, ইন্দ্রিয় বিশ্লেষণ করতে পারে না। কেবল তার প্রতিক্রিয়াটা আচরণে প্রকাশ পায়। অভিব্যক্তিগুলোর ভেতর দিয়ে তার একটা সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ছে অন্যের চোখে। মানুষের অভিব্যক্তি তার অনেকগুলি আচার আচরণের সমষ্টিমাত্র।

পুত্রের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় সত্যবতী অবাক হল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা খুঁজে পেল না। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাসমোচন করে বলল ঃ কৃষ্ণ, তুই এত জানিস বাবা! তোর দর্শন জ্ঞান আমাকে চমৎকৃত করল। কিন্তু জীবন আর দর্শন কখনও এক হয়? ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। দর্শনে জীবনকে উপভোগের কিছু নেই। ফুল আর সৌন্দর্যের মধ্যে যে তফাৎ, দর্শন ও জীবনেরও সেরূপ তফাৎ। আমার নীরবতার সঙ্গে তোমার কতকগুলো মুখস্থ করা দর্শন জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বৈপায়ন একটুও দমল না। বরং উৎসাহ পেল। দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ঃ সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তুমিও পার্থক্য করতে পারছ না। মুখ মনের দর্পণ। মনের অতলে নিরন্তর নানাবিধ যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার ছাপ পড়ে মুখে। মুখের খুব কাছে দর্পণ ধরলে ভাল দেখা যায় না। একটু দূরে ধরলেই তবে তা স্পষ্ট হয় এবং সুন্দর দেখায়। জীবনের সঙ্গে দর্শনের এতটুকুই দূরত্ব। যে প্রদীপশিখাটি স্থির হয়ে জ্বলছে তাকে একটা প্রদীপশিখা বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে প্রতি নিমেষে শিখাটি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে একটি নতুন শিখার সৃষ্টি করছে। জীবন ও দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধটা অনেকটা সেরকম। তর্ক থাক। দর্শন বিষয়ে জ্ঞান দেয়ার জন্যে আমি তোমার কষ্টের কথা জানতে চাইনি। বলছিলাম, মনটা তোমার বড় অশান্ত। কি হয়েছে?

সত্যবতী গভীর এক দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকিয়ে রইল। দুই চোখ আনন্দে চক্-চক্ করতে লাগল। ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপছিল। মায়াবী দৃষ্টি মেলে এক অদ্ভুত চোখে দ্বৈপায়নকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। দুটি চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু একটা খুশিখুশিভাবে মুখটা টৈটুম্বুর ছিল। শিশুর অপ্রত্যাশিত সাফল্যে মায়ের মুখে যে তৃপ্তি এবং চোখে বিস্ময় ফোটে অনেকটা সেরকম প্রশান্তিতে আচ্ছন্ন ছিল। কথা বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। খুব মৃদু স্বরে বলল ঃ কৃষ্ণ, তোমার মেধা আমাকে অশ্চর্য করেছে। আমার সব যুক্তি তোমার বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যার কাছে হার মানছে। আমি দিশেহারা বোধ করছি। কি বলব আমি? একদিন এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হও এই আশীর্বাদ করি। অক্ষয় হয়ে থাকুক তোমার কীর্তি। মহাকালেরও সাধ্য নেই তোমার অমর কীর্তির কেশাগ্র স্পর্শ করে। কৃতী পুত্রের কীর্তিক জননীও ধন্য হবে। এই সুখটুকু আমার সকল দুঃখ কষ্টের

প্রদীপ হয়ে জ্বলবে। তুমি আমার ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো। ওটুকু হারানোর ভয়ে আমার মন ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছে।

সত্যবতীর কথা শুনতে শুনতে দ্বৈপায়নের সারা শরীর শির্ শির্ করে উঠল। বুকের মধ্যে জলপ্রপাতের মত শব্দ হচ্ছিল। মায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল, সত্যবতীও স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির ভাবটি অটুট রেখে যখন কথাগুলো বলছিল তখন এক আশ্চর্য শারীরিক তৃপ্তির অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল দ্বৈপায়নের চেতনা। সত্যবতীর খুব কাছ ঘেঁষে বসল সে। মায়ের দুই হাঁটুর উপর চিবুক রেখে দ্বিপ্রহর দেখছিল আর কথাগুলো উপভোগ করছিল।

সত্যবতীর গলা হঠাৎ ধরে গেল। দু ফোঁটা গরম জল তার পিঠে পড়ল। সচকিত হয়ে সত্যবতীর চোখের দিকে তাকাল। তৎক্ষণাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। দ্বৈপায়ন আরো ঘন হয়ে বসল। দু'হাতে সত্যবতীকে জড়িয়ে ধরল। বিব্রত বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সত্যবতীর দিকে। ঠোঁট দুটি কান্নায় বেঁকে গেল। কখনও অল্প ফাঁক হয়ে ছিল।

এক মায়াবী আলো ঘিরে আছে সত্যবতীর মুখমণ্ডলে। দ্বৈপায়নের বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। নিজের চোখেও জল এল। কাঁদ কাঁদ স্বরে ডাকল ; মা, তোমার কি হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন?

সত্যবতীর দুই চোখ ভেজা। কান্নার বেগ সংবরণ করতে কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বলল: ও তুই বুঝবি না বাবা। আজ তোকে যত কাছে টেনে এনেছি, এত কাছে টানা উচিত হয়নি। তোকে একটু তফাতে, একটু দূরে রাখলেই ভাল ছিল।

দ্বৈপায়ন এ কথায় অসহায়ভাবে সত্যবতীর দিকে তাকাল। লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে তার বুক পুড়ে যাচ্ছিল। আত্মাভিমানে একটা কান্না নাভিকুণ্ড থেকে যেন উঠে এল। ভাঙা বিকৃত গলায় বলল: কে তোমাকে বলেছিল কাছে ধরে রাখতে? ভালবাসা, স্নেহ, আদর কে চেয়েছিল? ছোটবেলায় জঙ্গলে ফেলে দিলেই'ত পারতে? পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেও পারতে।

সত্যবতীর অধরে বিষণ্ণ হাসি। চোখে অশ্রু। দ্বৈপায়নকে বাহু বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরল। বুকের মধ্যে টেনে নিল। গালের উপর মুখ রাখল। আদর করল। হতাশ গম্ভীর গলায় বলল: সমস্যাটা সেখানেই। বারো বছরের দিন তোমার পিতা আসবেন তোমাকে নিয়ে যেতে। আজই তাঁর আসার কথা। অস্থিরতা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। বুকের ভেতর কি যেন একটা খামচে ধরছে। আমার পরিণতি কি হবে জানি না। তবে মরণ পর্যন্ত মনে থাকবে তোর এই স্পর্শ। আমি যদি না থাকি আমাকে তোর মা বলে একটু পরিচয় দিস; একটু ভালবাসিস তা-হলেই হবে।

দ্বৈপায়ন খুব করুণ দৃষ্টিতে সত্যবতীর মুখখানার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। পরিবেশের মধ্যে সত্যবতীর অশ্রুমাখানো মুখখানা যেন সীমানা ছাড়িয়ে চারদিককার অপরাহ্নের আলোছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। বড় সুন্দর সে রূপ। চোখে জল এল দ্বৈপায়নের।

সত্যবতীর বুকের ধক্‌ধক্‌ শব্দ দ্বৈপায়ন নিজের বুকে শুনল। অনেকগুলো মুহূর্ত্ত এইভাবে কাটল। সত্যবতীর কথায় হঠাৎ তার চমক ভাঙল। আর্ত্তস্বরে বলল ঃ ঐ যে আসছে কৃষ্ণ।

সত্যবতী আতঙ্কিত চোখে চেয়ে থাকে পাহাড়ী পথের দিকে। চোখের দৃষ্টি হরিণের মত ভীত ও চঞ্চল। শরীরে তার এক অপ্রতিরোধ্য অস্থিরতার অভিব্যক্তি।

দ্বৈপায়ন সত্যবতীর কথায় চমকে পাহাড়ী জঙ্গলের পথের দিকে তাকাল। তার হাত-পা একটা কিছু ঘটার আতঙ্কে কাঁপছিল। বুকের ভেতরটা উল্টোপাল্টা উথাল পাতাল হচ্ছিল। দ্বৈপায়ন চারদিক ত্রস্তভাবে চাইল। ভয় পেয়ে শিশু যেমন অসহায় ভাবে জননীকে জাপ্টে ধরে দ্বৈপায়নও সত্যবতীকে তেমনিভাবে আঁকড়ে ধরল। মায়ের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কাঁপা গলায় বলল ঃ না, আমি যাব না। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না! কোথাও না।

দ্বৈপায়নের বুকের মধ্যে ধক্‌ করে উঠল। সত্যবতীর চোখের দিকে অসহায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়েছিল। তার বুকের মধ্যে টনটন করছিল। সত্যবতীর দুই চোখ ভেজা। মুখে কষ্টের ছায়া। দেশ কাল পরিস্থিতির বাস্তবতায় জননী মনের অস্থিরতাকে চাপা দেবার জন্য নিজের মনকে শক্ত আর কঠিন করল। বিসর্জন দেবার মত দৃঢ় ভাবটাকে আনল। দ্বৈপায়নের ভীষণ ভয় করছিল। আশ্চর্য এক গভীর অনুরাগ আর মায়ায় সে মাকে আঁকড়ে ধরল। সত্যবতীও ধরল তাকে, যেন অশুভ অমঙ্গলের আক্রমণ থেকে বুকের মধ্যে আগলে রাখার জন্য।

মাকে ছেড়ে থাকার এক কষ্টকর অনুভূতিতে তার বুক টাটাচ্ছিল। পিতা তার প্রতি স্নেহাসক্ত কিনা জানা নেই। পিতা-পুত্রের বাৎসল্যের কোন ভিত নেই। অপরিচয়ের ব্যবধান এবং দূরত্বের সীমানা লংঘন করে তারা পরস্পরের কতটা আপনজন হয়ে উঠবে তার সংশয় দ্বৈপায়নের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। প্রাপ্তির আশ্বাসে মনটা কিছুতে ভরে উঠল না। ঋষি পরাশরকে বাবা বলে ভাববার যত চেষ্টা করল কিছুতে মন সায় দিল না। তার মূর্ত্তিও চোখের উপর ভেসে উঠল না। উঠবে কোথা থেকে? পিতা নামক ব্যক্তিটির সঙ্গে তার ত কোন আত্মীয়তাই গড়ে উঠেনি। পরাশরকেও আগে দেখেনি কখনও। জননীর মুখেও শোনেনি তাঁর গল্প। পিতার প্রতি কোন ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ তার মনে নেই। এরকম একটা লোক যে তার অত্যন্ত আপনার এই মন তার মরে গিয়েছিল। অনুভূতি গিয়েছিল শুকিয়ে। তাই এই

মুহূর্তে পরাশরকে পিতা বলে মনে প্রাণে কিছুতে গ্রহণ করতে পারল না। সত্তায় সত্তায় পিতার দুশ্চরিত্রতার প্রতি ধিক্কার জাগল। তার এই ভাবনার ভেতর যুক্তি ও বিচার তত ছিল না, যতটা ছিল আবেগ। নির্দোষ বালক পুত্রকে পরিত্যাগ করার ক্ষোভ, দুঃখ তাকে নিরন্তর আঘাত করছিল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তার ও জননীর সমস্ত জীবনটা যেন ব্যর্থ করে দিয়েছে এই লোকটা। তীব্র সন্দেহের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পরাশরকে একটা দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর, নোংরা লোক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিল না। সত্যবতীর করুণ বিষণ্ণ মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠল। অমনি সারা অন্তঃকরণ ঘৃণায় বিষিয়ে গেল। কিছুতে সে মনটা আর পরাশরের প্রতি সহজ হতে চাইছিল না।

দ্বৈপায়নের কোন দোষ ছিল না। সত্যবতীই কাঙালের মত তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। পরাশরের বিপুল প্রভাব, ক্ষমতা থেকে পুত্রকে দূরে রাখতে সত্যবতী শিখিয়েছিল, জন্ম দৈবের অধীন। কিন্তু পুরুষত্ব মানুষের নিজের করায়ত্ত। জীবনের ওটাই যা পুরুষোচিত। নিজেকে নিজে রক্ষা করার শিক্ষা যদি সম্পন্ন না হয় তা-হলে হয়ত কারো সাধ্য নেই বহির্বিশ্বের নানাবিধ আক্রমণ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করে।

বালক দ্বৈপায়ন জননীর কথাগুলো মন দিয়ে শুনত আর বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করত। ঐ বয়সে বোধ বুদ্ধি তার পরিণত নয়। তথাপি মনের আলো আঁধারির আবহাওয়ায় কত চিন্তার ছবি ভেসে যেত। পিতা সত্যই উপলক্ষ্য। সন্তানের জীবনে জননীই সব। জননীর স্নেহ আদর সতর্কতা ঘিরে থাকে তাকে। পিতা পুত্রের জীবনে ছায়াবৃত্ত বৃক্ষের মত। সেখানে চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ নেই। সত্যবতী সেই কথাটা ভাল করে বোঝানোর জন্যে বলেছিল, বিখ্যাত ব্যক্তির পুত্ররা বড় দুর্ভাগা। পুত্রের নিজের ক্ষমতা, মেধা, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পিতার ঔজ্জ্বল্যের পাশে তারা মিট মিট করে। লোকে তাদের আমল দেয় না। তারা সহজে স্বীকৃতি পায় না। তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না নিজের মত করে। ব্যক্তিত্বকে নিজের পথে বিকশিত করতে পিতার পরিচয় জানতে চেয়ো না। আর্য পিতার দয়া ছাড়াও যে অনার্য জননীর দায়-দায়িত্বে বিকশিত হওয়ার সুযোগ আছে, এ কথাটা ভুলো না কোনদিন। আর্যদের ঘৃণায় অবহেলায় আমার ভেতরটা তেতো হয়ে আছে।

কথাগুলো দ্বৈপায়নের মনের ভেতর শিকড়ের মত গেড়ে বসেছিল। জননীর আর্তস্বর শোনামাত্র তার নানা অনুভূতির মধ্যে এই কথাগুলো ঝংকারে বাজল। কিশোর প্রাণে একটা যন্ত্রণায় পাক দিয়ে উঠল। দ্বৈপায়ন গায়ের মধ্যে সত্যবতীর উৎকণ্ঠিত কষ্টের একটা তরঙ্গকে টের পেল। জননীর প্রতি সমবেদনায় তার উদ্গত নিশ্বাস বুকের পাঁজরের খাঁচায় আটকে যায়, ব্যথা করে।

পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমেই নিকটতর হল সে শব্দ। মাতা ও পুত্রের মুখ পাংশু হয়ে গেল।

পরাশর এল দাসরাজাকে সঙ্গে নিয়ে। গর্বভরা বুক নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সত্যবতীর মুখোমুখি। কাউকে সে চেনে না। সত্যবতীকেও তার মনে নেই। তথাপি প্রসন্ন কণ্ঠে উচ্ছ্বাস মেশানো স্বরে বলল : আমি এসেছি।

সত্যবতী কপট অবাক স্বরে প্রশ্ন করল : কে আপনি ?

পরাশরের মুখে হাসি, চোখে ঝকঝকে দৃষ্টি। একটা খুশিখুশি ভাব নিয়ে বলল : আমি ঋষি পরাশর। বারো বছর পূর্ণ হবে সন্ধ্যা সমাগমে।

সত্যবতী পরাশরের ঝকঝকে চোখের দিকে তাকিয়ে কয়েক পলক কথা বলতে পারল না। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে তার মনে উৎকণ্ঠা জাগল। জিজ্ঞেস করল : কার কথা বলছ ঋষি ?

পরাশর খুব লাজুক মুখে হেসে বলল : এসেছি পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে নিতে।

পরাশরের কথায় সত্যবতী বিব্রত হল। দ্বৈপায়নের সর্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল। কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় কাঁপছিল তার বুক। এরকমটা আগে হয়নি কখনও। কথাটা কিন্তু বিদ্যুৎচমকের মত সমস্ত চেতনা জুড়ে একটি স্ফুরিত ঝংকারে বাজছিল কেন, কেন, কেন ? ওই বারংবার প্রশ্নটা তার বুকের মধ্যেও আঘাত করল।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। অভিমানাহত চিত্তে সত্যবতী বলল : জঠরে ভ্রূণরূপে যাকে তুমি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কালগর্ভে নিক্ষেপ করলে তাকে পুত্র বলে দাবি করছ কোন্ অধিকারে ?

পিতার অধিকারে।

পিতার কোন কর্তব্য করেছ হে ঋষি ? পুত্র নিজ চেষ্টা বলে হয়েছে সুপণ্ডিত। বেদে তার পূর্ণ অধিকার।

সুবিদিত আছি কল্যাণী। কৃষ্ণ আমার হেলায় ফেলে দেয়া হারানো রতন। আঁচলে বেঁধে রাখার রত্ন কৃষ্ণ নয়। সে আমাদের হীরের টুকরো। আকরিক হীরের কোন দাম নেই। যে হীরের যত দ্যুতি তার মূল্য তত বেশী। হীরে কাটলে তবে দ্যুতি বের হয়। কৃষ্ণের ভেতর হীরের লুকনো দ্যুতিকে কেটে বার করার কাজ আমার। ওকে আমার কাছে তাই নিয়ে যেতে চাই। মৎস্যগন্ধা তুমি রত্নগর্ভা, আর আমি তার মণিকার। পরাশরের কণ্ঠস্বরে প্রেম স্নেহ, গর্ব টলটল করতে লাগল।

পরাশরের সৌম্য মূর্তি, চোখ ধাঁধানো রঙ, তুলি দিয়ে আঁকা মুখ, চোখ, তুষারের মত শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু তাকে চুম্বকের মত টানতে লাগল। বারো বছর পর দ্বৈপায়ন দেখল পিতাকে। কোনদিন যাকে চোখেও দেখেনি, যার কোলে উঠে আদর খায়নি কখনও ; তাকে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে বুক কেঁপে উঠল বার বার। ইচ্ছে হল কথা বলে, 'বাবা' বলে ডাকে। মুগ্ধতা তার অন্তরে শ্রদ্ধা ও অনুরাগে

রূপান্তরিত হল। পিতা সম্বন্ধে কেমন একটা খুশি আর গৌরব বোধ জাগল তার অন্তরে।

পরাশরের কথায় সত্যবতীর বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে উঠল। নিজেকে তার কেমন অশক্ত লাগছিল। বুকের ভেতর ঝটিতি অজস্র কথা একসঙ্গে উথাল পাথাল করে উঠল। অথচ একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। চকিতে দ্বৈপায়নের হাত দুটি ধরে পরাশরের হাতে দিয়ে বলল: ঋষিবর, এই তোমার পুত্র। গচ্ছিত ধনের মত আমার সমস্ত দিয়ে ওকে আগলে রেখেছি। তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি ভারমুক্ত হলাম। কৃষ্ণ, ইনি তোমার পিতা। এঁকে প্রণাম কর। এখন থেকে তুমি ওঁর সঙ্গেই থাকবে।

কথাগুলো সত্যবতী অন্তর থেকে বলল না, যন্ত্রের মত বলল, একটা প্রবল কান্না তার বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। নিজেকে সে আর সামলাতে পারল না। ঝড়ের বেগে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

দুই

সত্যবতী জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রাসাদের উঁচু প্রাকার পেরিয়ে তার দৃষ্টি অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এখান থেকে পূর্ণ আকাশ দেখা যায় না। আধখানা খোলা খোলা আকাশ অনন্ত প্রশ্নের মত সত্যবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রশ্ন, প্রশ্ন—কত প্রশ্ন তার মনে এল। কেন এল? মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে—যার কোন প্রয়োজন নেই। এর আরম্ভ সে দেখতে পেল কিন্তু শেষ খুঁজে পেল না।

সকাল থেকে আকাশখানা ঘোলা ঘোলা। এক ফোঁটা রোদ্দুর নেই কোথাও। রহস্যময় অস্পষ্টতা থম থম করছিল। সেই বিষণ্ণ স্তব্ধতা সত্যবতীর হৃদয়কেও ভারাক্রান্ত করল। তার শান্ত ও ভাবলেশহীন মন আজ কিছু চঞ্চল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। গাছগুলো ভিজছিল। বাদলা পোকারা চারিদিকে পরীর মত উড়তে লাগল। পাখিরা ভিজে ভিজে তাদের ধরতে লাগল। ওরা হাজারে হাজারে মরল। তবু ওরা উড়ছিল।

নির্নিমেষ চোখে দৃশ্যটা দেখতে লাগল সত্যবতী। কত দার্শনিক চিন্তা মনকে ছুঁয়ে গেল। জীবনপ্রবাহ অনন্ত। তার শেষ নেই, ক্ষয় নেই। কোন কারণেই নিরবচ্ছিন্ন গতি রোধ করা যায় না। নদী-স্রোতের মত গতিধারা বদলে বদলে চলে।

জানলার ধারে পালঙ্কের উপর খুবই চিন্তিতভাবে দু হাঁটু জড়ো করে তাতে থুতনির ভর রেখে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে সামনের দিকে। মনটা ভীষণ অস্থির, এলোমেলো। সত্যবতী বেশ বুঝতে পারছিল, বিষণ্ণতা তার মনের অভ্যন্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে। একে সহজে উপড়ানোর নয়। এর প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ এবং একে আবিষ্কার এক নাছোড় নেশা তাকে পেয়ে বসল। কত কথা তার মনে হতে লাগল।

এ জীবন তার নানা দিক থেকে কানায় কানায় পূর্ণ। তাতে কোন ক্ষোভ দুঃখ থাকার কথা নয়। নিজের পেটের ছেলের চেয়ে দেবব্রত কি গভীর ভালবাসে তাকে। কি গভীর বিশ্বাস তার উপরে। শুধু পিতাকে সুখী ও আনন্দিত করার জন্যে নিজেকে রাজ্য সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার কোন ক্ষোভ তার মনে নেই। বিমাতা বলে সত্যবতীকে কোন অশ্রদ্ধা করে না। বরং ভালবাসার মহিমা, শ্রদ্ধা ও

পূজার সঙ্গে মিশিয়ে নিবেদন করেছে তাকে, সত্যবতীর জীবন কৃতার্থ হয়ে গেছে। তবু কয়েকদিন ধরে জীবনের আস্বাদ কি রকম বদলে গেল। কি দারুণ অতৃপ্তি বুক জুড়ে হাহাকারে বাজতে লাগল অবচেতনের গভীরে। সত্যবতীর বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। ঝড়ের মুখে একটা ছোট্ট বিপন্ন পাতার মত কাঁপছিল। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, সে তার কালের পিছনে অর্থাৎ অতীতের দিকে ফিরে যাচ্ছে। কি করে সম্ভব হল এটা।

কালের নিজের কোন উদয় অস্ত নেই। মহাকালের দাপটে সব লুপ্ত হয়ে যায়। পরক্ষণেই প্রশ্ন জাগল, সত্যই কি তাই? কাল কি শুধু ধ্বংস করে? পুরনো করে? —নতুন করে না? জীবনটা তার পুরনো হয়ে গেছে, বয়সে যৌবনের লালিত্য গেছে, চেহারায় রূপান্তর হয়েছে—কিন্তু মন? যে মন তার অতীতকে দেখতে ব্যগ্র। সেই কৌতূহলী উৎসুক মন নতুন। এই সময় প্রবাহের সৃষ্টি। তাহলে কালস্রোতের গর্ভে সব বিনাশ হয় না, ধ্বংস হয় না—তার রূপান্তর হয় শুধু। পুরনো নতুন হয়। আসলে কাল নিরপেক্ষ। সবাইকে সে কেবল আকর্ষণ করে। তাকেও করছে বোধ হয়। নিজেকে তার কালের এক অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টি মনে হল। শরীর মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্যে কোথা থেকে একটা তরঙ্গ এসে লাগল। সেই তরঙ্গে ভাসতে ভয় করল তার। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে জগৎ, তাকে সত্যবতী চেনে এবং জানে। সেখানে তার সত্তা খণ্ডিত এবং সীমাবদ্ধ। তার বাইরে পা দিতে সাহস হয় না। তাকে ভয় করে। যে ভাবনাটা পলকের জন্যে মনে উদ্ভাসিত হল সেটা ভয়ানক এবং বিপর্যয়কারী। চল্লিশ বছর আগের একটা ঘটনা তাকে সব গোলমাল করে দিল।

সত্যবতীর বারংবার মনে হতে লাগল, সে মহাকালে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। সময় তার পিছনে কিংবা পাশে নেই—একেবারে সামনে, প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়েছে। সব সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠেছে। হঠাৎ চল্লিশ বছরের গণ্ডিটাকে এক নিমেষে পার হয়ে গেল। যে বিস্ময় তার বুকে জাগল সে ত আজকের পঞ্চান্ন বছরের হস্তিনাপুরের রাজমহিষী সত্যবতীকে দেখে নয়। তার মুখে এখন বয়সের বলিরেখা, চুলে সাদা রঙ। দেহ সৌষ্ঠবহীন। কিন্তু তার দৃষ্টি এই সীমা ছাড়িয়ে গেছে বহুদূরে। সে দেখতে পাচ্ছিল চতুর্দশী মৎস্যগন্ধাকে। পঞ্চান্নে পা রেখেও সে ত্রিশ বছর আগের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল। চোখে কোন দৃষ্টি নেই। চোখে স্মৃতি ভারাক্রান্ত। বহুদিন আগেকার একটা দৃশ্য দেখছিল।

কল কল করে বয়ে চলেছে যমুনা। উচ্ছ্বাসে হাস্যে কলগীতিতে সে যেন তার খুশী ছড়িয়ে দিয়েছে। বসন্তের রতিরঙ্গের সুখ লেগেছে তার ঢেউএর দোলায়। ভুবন-মোহিনী নটীর মতই অভিসারে চলেছে সে।

ঋষি পরাশর যমুনার তীর ধরে চলেছেন খেয়াঘাটের দিকে। হঠাৎ যমুনার

কলধ্বনির মত নূপুরধ্বনি শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একটা ছোট্ট আনন্দের বিদ্যুৎ তাঁর শরীর মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল।

চল্লিশ বছর হয়ে গেল—মাঝে মাঝে তার অতীত মনকে ছোঁয়। যখনই পরাশরকে মনে হয়েছে তখনই ভ্রূকুটি করেছে নিজেকে। কেন এমন ঘটনা ঘটল? না ঘটলেই ভাল ছিল। তখনই লজ্জা বিষম লজ্জা তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। সেই স্মৃতিকে অবচেতনের গভীরে নির্বাসিত করলেও চোখের তারায় ফুটে উঠে। কিন্তু তার সবটা দৃশ্য নয়, কিছুটা অব্যক্ত, রহস্যে ঢাকা। সত্যবতীর দেখার কথা নয় তা। কিন্তু পরাশরের শরীরের ভেতর যে প্রতিক্রিয়া তাকে উত্তেজিত ও ইন্দ্রিয়দমনে অসংযত করেছিল, সত্যবতী তার কাল্পনিক রূপ দেখতে পায়।

সূর্যের নিস্তেজ আলো পড়েছিল পরাশরের বয়স্ক মুখে। সত্যবতী কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই তার পাশ দিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে মন্থর পায়ে হেঁটে গেল। তার অঙ্গ-সৌরভ মিশে বাতাস হল গন্ধবহ। যেতে যেতে সত্যবতী জোরে জোরে ঘ্রাণ নেয়ার শব্দ শুনল। অমনি এক দুরন্ত কৌতুকে, কৌতূহলে সে পিছন ফিরল। দেখল এক অপরিচিত ঋষি নাক ও ঠোঁট কুঁচকে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। তার ঐ দশা দেখে কিশোরী সত্যবতীর ভীষণ হাসি পেল। নাভিমূল থেকে একটা দুরন্ত বেপরোয়া হাসির স্রোত ঠেলে বেরিয়ে এল। নিজেকে সংযত করার সব চেষ্টা ভেসে গেল। গালের কোণে আঙ্গুল ছুঁয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। পুরুষটির কিন্তু ভাবান্তর নেই। নির্নিমেষ চোখে সে শুধু তাকেই দেখছিল। হঠাৎ, একটা বিস্ময়বোধ ফুটে উঠল সত্যবতীর। বিব্রত লজ্জায় নিজেই সংকুচিত হল। পুরুষটি বয়স্ক হলেও যৌবনোচিত আকর্ষণ তার কিছু কম ছিল না।

মানুষের মন বড়ই রহস্যময়। সত্যবতীর অনুভূতিশীল মনের মধ্যে নারীপুরুষের বোধ হঠাৎ তাকে সচকিত করে দিল। মুহূর্তে এক দায়িত্বশীল, দেহসচেতন নারীতে রূপান্তরিত হল সে। অন্তর্বাসহীন বুকের আঁচল যথেষ্ট শালীন থাকা সত্ত্বেও আঁচলটাকে খুলে সে আরো কষে টেনে বাঁধল। তাতেই চতুর্দশীর উন্নত বক্ষ গোলক দুটি আরো উদ্ধত ও অনম্র হয়ে উঠল। বড় বড় চোখ চেয়ে ঋষি পরাশর সে দৃশ্য নিঃশেষ করে দেখতে লাগল। চতুর্দশী সত্যবতীর বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। কি মনে করে সেখান থেকে দৌড়ে পালাল। পায়ের নূপুর রুনু ঝুনু করে মিষ্টি ছন্দে বেজে উঠল। কখনো মৃদু কখনো উচ্চ ঝংকারে।

শান্ত জিতেন্দ্রিয় ঋষির বুকের ভেতর সেই ধ্বনি সহসা অবিরাম দ্রুত লয়ে বেজে গেল। এক নিমেষে ঋষি পরাশর অন্য মানুষ হয়ে গেল। রক্তে তার বিপুল উত্তাপ শিরায় শিরায় টাটানো যন্ত্রণা।

সত্যবতী কিছুদূর গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে তাকাল। দেখল ঋষিও তাকে অনুসরণ করছেন। এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কখনও তার

কৃষ্ণবর্ণ উ'চু বুকের সুডোল মাংস পিণ্ডের উপর তাঁর স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম দৃষ্টি ন্যস্ত। চোখের পলক পড়ছিল না মোটে। ঋষির অনুরাগদীপিত চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় রক্তিম হল সত্যবতী। পরাশরের মদির বিহ্বল চাহনি তাকে এক প্রবল সম্মোহনে আটকে রাখল। পা দুটো ভারী বোধ হল। পরাশরকে দেখে তার প্রথম নিজের কাছে ভালো লাগা ও লজ্জা একসঙ্গে তার মুখের ও চোখের রূপ বদলে দিয়েছিল। কেমন একটা খুশী আর গৌরব বোধ মনে জাগছিল। তথাপি, নারীসুলভ একটা সংকোচ এত গভীরভাবে তাকে নাড়া দিল যে পরাশরের দিকে তাকালে লজ্জা পাচ্ছিল। অন্যদিকে চোখ ফেরাল। সত্যবতী আচ্ছন্নের মত তার স্বল্পবাস টেনে দিল বুকের উপর।

পরাশরের বুকে জাগল মত্ত কামনার জোয়ার। স্লথ পায়ে মাটি মাড়িয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ধীবর বালার দিকে। আশ্চর্য উজ্জল অথচ দ্বিধাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় অনেক কিছু খুঁজল পরাশর। তারপর, কাঁপা কাঁপা গলায় মধুর কণ্ঠে বলল: কী দুরন্ত সুন্দর তুমি!

খুব কাছে থেকে পরাশরের মুখে রূপের প্রশংসা শুনে সম্মোহিত হয়ে গেল সত্যবতী। কী সুন্দর কথাটা শরীর ও হৃদয় জুড়ে দামামার মত বেজে যাচ্ছিল। বয়সের দুস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরাশরের ফর্সা শরীর, নগ্ন বুকের ভ্রমর কালো লোমগুলির অনির্বচনীয় কান্তি, মাথায় লম্বা চুলের চুড়া, শান্ত, সৌম্য তাপস মূর্তির এক তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ সত্যবতীকে তার দিকে যে টানছিল তা টের পেল। কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম। আকর্ণ বিস্তৃত সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার ওষ্ঠাধরে। লজ্জা আর আনন্দ ঢাকার জন্য তাড়াতাড়ি বলল: আমি এই মৎসদেশের ধীবর কন্যা। আমার পিতা দাসরাজ। এই ঘাট তাঁর। মাঝে মাঝে তাঁর অবর্তমানে এই ঘাটের দেখাশুনো আমাকে করতে হয়। আমি নিজেও নৌকা চালাতে জানি। নদী পারাপার করলে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি।

সত্যবতী এই আমন্ত্রণ ভালমন্দ বিচার করে করেনি। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবন স্পর্শে সে পরাশরকে আহ্বান করেছিল শুধু। পরাশরের লুব্ধ অন্তর এই আমন্ত্রণের অপেক্ষায় ছিল। সত্যবতীর প্রস্তাবে পরাশরের মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। মনে হল, এ যেন রূপকথার গল্প। পরাশর একটু প্রগলভ হয়ে সাহস করে বলল: তাই যাব সুন্দরী।

সত্যবতীর বুকের ধকধকানিটা শুরু হল এ সময়ে। চতুর্দশী সত্যবতী রক্তের কলধ্বনিতে টের পাচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে। এ হল তার ভূমিকা। সেই চরম ঘটনাটা কি। তাও কতকটা আন্দাজ করতে পারল। কিন্তু তবু কেমন একটা লোভ হল। ইচ্ছে হল। নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারল না।

একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তীব্র চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হল তার। কথাটা হঠাৎ বলে যে ভুল করেছে, তার গুরুত্ব অনুভব করতে পারল। কিন্তু কথাটা তৎক্ষণাৎ

ফিরিয়ে নেয়ার যুক্তি খুঁজে পেল না। ঋষি-শাপে যদি কোন অনর্থ হয়, অমঙ্গল হয়—এই ভাবনায় দিশাহারা হল। যুগপৎ ভয় ও ভাবনায় শুধু বলল : তাহলে নৌকায় আরোহণ করুন ঋষি।

কুয়াশা এবং অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল যমুনার বুকে। মন্দির থেকে শঙ্খধ্বনি ভেসে এল বাতাসে। যমুনার ধারে বাঁধা ডিঙ্গি নৌকোর একটি দড়ি খুলে স্রোতের মুখে ঠেলে দিয়ে সত্যবতী নিজে উঠল। ঋষিকে বসাল। নৌকোয় দুজনেই চুপচাপ। সত্যবতী নৌকোর বৈঠা ধরেছিল।

ছোট খেয়া নৌকোটি মৃদুমন্দ গতিতে ভেসে চলেছিল! পরাশরের লুব্ধ দুটি চোখ চতুর্দশী সত্যবতীর ভরা যৌবনের রূপ দেখছিল। তার নিটোল সুঠাম দেহকান্তি, উন্নত বক্ষের দিকে তার দৃষ্টি আঠাকাঠির মত লেগে ছিল। পরাশর কিছুতেই সে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকো চালানোর সময় তার শরীর, পেশী, বক্ষ, জঙ্ঘা, নিতম্ব নানা ছন্দে হিল্লোলিত হতে লাগল। কটির নিচে থেকে দুই উরু স্তম্ভে যেন ঝড়ের কম্পন অনুভূত হচ্ছিল। যমুনার হিল্লোলিত তরঙ্গের মত তার স্তন, কটি, জঙ্ঘা, পদদ্বয় নৃত্যছন্দে আন্দোলিত ও আবর্তিত হতে লাগল।

ঐ দৃশ্য দেখে পরাশরের বুকের ভেতর এক অবোধ রহস্যময় অনুভূতির খামচা খামচি শুরু হয়ে গেল। সমীরণ যেমন যমুননাকে প্রতিমুহূর্ত আলিঙ্গন করে তেমনি এক মিলনের আর্তি জাগল তার শরীরে। সারা দেহে উচ্ছ্বসিত রক্ত অসহ্য-তাপে অস্থির হচ্ছিল শিরায় উপশিরায়। ঘূর্ণি-ঝড় উঠল পরাশর বুকে। ভয়ংকর উত্তেজনা তাঁকে পেঁছে দিল নিজের শরীরের এ যাবৎকালে অচেনা এক গভীর উপলব্ধিতে। নিজেরও যে একটা শরীর আছে একথা ঋষিবর জানত না যেন। যা জানত তা শুধু—সংযম আর নিদিধ্যাসন। পরাশর এই ক্ষুব্ধ উত্তেজিত শরীরটা নিয়ে কি করবে, ভেবে পেল না। কেবল অনুভব করতে পারছিল, এখুনি এই শরীরটা সব শাসন সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে বন্য আর বর্ব্বর হয়ে উঠবে। বেশীক্ষণ আর পরাশর স্থির থাকতে পারল না। অকস্মাৎ উঠে দাঁড়াল। সত্যবতীকে ভাববার অবসর না দিয়ে নিবিড় বাহু বন্ধনে বাঁধল। বিম্বাধরের মত ওষ্ঠদ্বয়ের উপর এঁকে দিল এক চুম্বন। উদ্গত নিশ্বাস বুকে চেপে তার চোখে চোখ রাখল। অঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগল। সত্যবতীর চেতনা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে এল। বাধা দেওয়ার মত শক্তি ছিল না। সারা শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল সুখের সঙ্গীত। যা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে দুই বিপরীত শরীরের সংস্পর্শ।

সত্যবতীর সারা শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত শিহরণ আর ভাল লাগার আবেশ। ঘোর লাগা মুহূর্তের এই মধুর আমেজটুকুর ভেতরে তার চেতনা একটু একটু করে ডুবে গেল। পরাশরের মাথা নুয়ে এল। তার ঠোঁট সত্যবতীর ঠোঁটের কোণ, গাল

স্পর্শ করল। সত্যবতী কয়েকমুহূর্তের বিভ্রমে পরাশরের গলা জড়িয়ে ধরল। পরাশর সত্যবতীর ঠোঁট একটু একটু করে ভিজিয়ে দিল এবং সেই স্পর্শ যেন চুম্বনে অনভিজ্ঞা কিশোরীর অনুভূতিতে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করল। সত্যবতীর গলা জড়ানোর আকর্ষণের ঘনত্বে, পরাশরের শরীরের নিবিড় স্পর্শে তাদের উভয়ের রক্তে যেন বারুদের আগুন লাগল। সত্যবতীর প্রতিটি অঙ্গ দুরন্ত উত্তাপে দপদাপিয়ে উঠেছিল এবং আবেশের তীব্রতায় অনভিজ্ঞা কিশোরী বালিকা তৃষ্ণার চুমুকে এক গভীর সুখের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। সঘন নিঃশ্বাসে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য ঠোঁটের স্পর্শ বিচ্ছিন্ন করে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়েছিল, অমনি নারীসুলভ একটা লজ্জা সংকোচ তাকে আড়ষ্ট করল। একটা অপমান এতো গভীরভাবে তার বুকে বাজল যে তৎক্ষণাৎ চকিত বিদ্ধ ব্যথায় ঝংকার দিয়ে বলল: এ কি আচরণ আপনার ঋষিবর! এই নির্জন নদীবক্ষে আমাকে একা পেয়ে আপনার এরূপ উন্মত্ত আচরণ শোভা পায় না। ধিক আপনার ঋষিত্বকে।

পরাশর সতৃষ্ণ নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মৃদু হেসে সবিনয়ে বলল: তোমায় দেখে আমি মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। এখন তোমাতে আসক্ত আমি। আমার রক্তে দুরন্ত তৃষ্ণা, কোষে কোষে প্রবল ক্ষুধা। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে আমি তোমাকে বক্ষে নিষ্পেষিত করেছি। জীবনধর্মের বাইরে কোন আচরণ করিনি রূপসী। তোমার মধুর সান্নিধ্য লাভ করে বুঝলাম, রমণীর মত সুন্দর উপভোগ্য সম্পদ পৃথিবীতে আর নেই। তুমি কত সুন্দর। কী অপরূপ তোমার আকর্ষণ। তোমাকে পেয়েও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। সাধ মিটছে না। অনন্ত কাল ধরে তোমার সঙ্গ পেলেও আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না। আজ এই ক্ষণে মনে হচ্ছে, জীবনের চরম প্রাপ্তি —এবং পরম নিবৃত্তি হল নারী। জীবনকে ফাঁকি দিয়ে বৃথাই মোক্ষ খুঁজেছি। আজ তোমার ঐ বরতনুর কাছে এক নতুন শিক্ষা পেলাম। তুমিই আমার ধর্ম। আমার জীবন সর্বস্ব। তোমাকে আমার হৃদয় সমর্পন করলাম। আমাকে গ্রহণ করে চরিতার্থ কর সুন্দরী।

পরাশরের কথায় কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় সত্যবতীর বুক কেঁপে গেল। বারংবার শিহরিত হল সর্বাঙ্গ। এরকম আগে কখনও হয়নি। এক বিভোর তন্ময়তা তাকে পেয়ে বসল। মুগ্ধতা, কাম, তীব্র আকর্ষণ। বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেল সত্যবতীর। সব হিসাবে সে ভুল করে বসল। একটা ঘন শ্বাস ছেড়ে আবেগমথিত স্বরে বলল: ঋষিবর, আপনার প্রার্থনা উপেক্ষা করি এমন শক্তি আমার নেই। আপনি আমাকে সম্মোহিত করেছেন।

সত্যবতী, সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়!

পরাশর দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। উপোসী দেহ এতদিন পরে তার অলক্ষ্যের দাবিটা নিয়ে পুরোপুরি হাজির হল। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল

তার। যমুনাও যেন চন্দ্রের আকর্ষণে উত্তাল হয়ে উঠল। রতিসুখের উল্লাসে সেও মেতে উঠল পরাশরের সঙ্গে।

তারপর থেকে নিদারুণ বেদনা জড়ানো দুঃসহ গ্লানি আর এক অজানিত আতঙ্কে দিনগুলো বিভীষিকাময় হয়ে উঠল। জঠরে পরাশরের ভ্রূণ চন্দ্রকলার মত বাড়ছে। সত্যবতীর বুকে ঝড়। চরম অপমান আর গ্লানির আঁধার-কালো ঝড়।

লজ্জা আর পিতার সম্মান বাঁচানর জন্যে সত্যবতী পালাতে চাইল। কিন্তু দাস-রাজার জন্যে হল না শেষ পর্যন্ত। ধরা পড়ে গেল। দাসরাজার ডাকে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তার বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে মাথা হেঁট হয়ে এল অপমান বোধ আর লজ্জায়। যে নিষ্ঠুর দৈত্য তার জীবনে সব শ্রী সৌন্দর্য বিষিয়ে দিয়ে গেল তার কথা কোন্ মুখে জানাবে পিতাকে? সত্যবতী কাঁপছিল লজ্জায় আর সংকোচে। দু'চোখে তার নিবিড় ভাষাহীন কান্না।

দাসরাজ ধরা গলায় ডাকল : সত্যবতী।

অমনি সারা শরীর জুড়ে তার শিহরণ বয়ে গেল। ভয়ে অপমানে বেদনায় তার বুক টাটাতে লাগল। সত্যবতী ভাল করেই জানে, এই মানুষটা কোন অবস্থাতে তাকে ত্যাগ করবে না। এ জীবনে তার একান্ত নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আগামী দিনে তার জীবনে যাই ঘটুক, তাকেও স্বীকার করে নেবে। কিন্তু তার মহানুভবতার পরম দান গ্রহণ করার মত মনের অবস্থা তার নেই। তবু তাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভেবে আঁকড়ে ধরল। বুকের উপর মুখ লুকিয়ে শিশুর মত কাঁদল।

দাসরাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে কান্না নেই। চাহনিতে ফুটে উঠেছে বিজাতীয় মানুষের উপর একটা তীব্র ঘৃণা। সত্যবতীকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই! তার মুখ আজ নির্মম কলঙ্কের কালিতে ভরে উঠেছে। অথচ, পিতা হয়ে তাকে সে আত্মগ্লানি থেকে কিছু না করতে পারার অক্ষমতা তাকে নিদারুণ কষ্ট দিচ্ছিল। সত্যবতী নিজের বুকে পিতার সেই অব্যক্ত হৃদয়যন্ত্রণার ধকধক শুনল।

কান্নাভেজা চাহনিতে সত্যবতী চেয়ে থাকে আলোভরা বনের দিকে। সত্যবতীর সর্বশরীর ও মন যেন বিষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছিল। স্বস্তি পাচ্ছিল না। সারা দেহ মন পাপের বোঝায় ভারী হল। প্রসবের পর নিজের সন্তানের উপরও তার কোন অধিকার নেই। সে কথা মনে এলে বুক ঠেলে কান্না উঠে আসে।

নির্বাক সত্যবতীর দু'চোখে জমাট আতঙ্কের ছায়ার দিকে দাসরাজ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্নেহমধুর স্বরে ডাকল : সত্যবতী, কোথায় যাচ্ছ মা? কার ভয়ে পালাচ্ছ তুমি?

ভীরু কান্নাভেজা চাহনি মেলে সত্যবতী তাকাল তার পালক পিতার দিকে। কথা বলতে গিয়ে কান্না এল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ঠোঁট কামড়ে বলল : এক

নির্লজ্জ ঋষির লালসার বিষে আমার দেহ মন বিষিয়ে উঠেছে। অভিশাপের অঙ্কুর আর বয়ে বেড়াতে পারছি না।

দাসরাজ একটু অপ্রতিভ মুখে বলল : জানি আমি।

সত্যবতীর মনটা ছাঁৎ করে উঠল। কেমন একটা লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সে। একটা দারুণ অস্বস্তি আর অজানা ভয়ে সে চমকানো স্বরে আর্তনাদ করল : পিতা!

দাসরাজ অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল : এত আতঙ্কের হল কি? ভয়ের কি আছে? যে আসছে তাকে আসতে দিতে হয়। কোন্ উদ্দেশ্যে কার জন্ম কে বলবে? বিষের যে জ্বালায় বুক অহরহ জ্বলছে তার জ্বালা জুড়নোর জন্যে একটা জায়গা ত চাই। এই সন্তান যে সে কাজ করতে জন্মাবে না—কে বলবে?

সত্যবতী দাসরাজের কথার মর্মোদ্ধার করতে পারল না। বুকের মধ্যে অভিমানের একটা তুফান উথলে উঠল। অস্থিরতায় বার কয়েক মাথা নাড়ল। শ্বাস ফেলতে গিয়ে টের পেল শ্বাসের বাতাসটা কাঁপছে। নিজের উপর তার রাগ হল। ঘৃণা জন্মাল, অনুতাপে অনুশোচনায় বারংবার ধিক্কার দিল। মস্তিষ্ক তার কাজ করছিল না। কেবল একটা কান্না বুকের তল থেকে উঠে এসে তার নয়ন ভাসিয়ে দিল। ফোঁপানিতে তার স্বরগুলো অনুচ্চারিত, অস্পষ্ট, এবং ভাঙা। ভাঙা স্বরে ধরা গলায় বলল : পিতা, সন্তান যদি পুত্র হয় তাহলে জননীর কোন দাবি থাকবে না তার উপর। দ্বাদশ বৎসর অন্তে ঋষি তাকে নিয়ে যাবে আশ্রমে। তখন আমার কি হবে?

দাসরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার চুল এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা শ্বাস পড়ল তার। হতাশ গলায় বিমর্ষ স্বরে বলল : আমাদের কোনদিন কিছু করার থাকে না। শুধু ভাবনা থাকে। কৃষ্ণবর্ণা রমণীদের আর্যরা কোনদিন সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা করেনি। তাদের খুব সস্তা আর সহজপ্রাপ্য মনে করে! কৃষ্ণবর্ণা অনার্য রমণীরা আর্যপুত্রদের শুধু লালসা চরিতার্থতার যন্ত্র। এই পাপাচারের কোন প্রতিকার নেই, প্রতিরোধ নেই বলে দিনে দিনে তা শুধু বেড়ে যাচ্ছে। বাহুবলে লোকবলে তাদের সমকক্ষ আমরা নই বলে, মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। কিন্তু দুর্বলও কৌশলে জয় আদায় করে নিতে পারে এই সহজ কথাটা আমাকে ইদানীং ভাবিয়ে তুলেছে। আমি তোকে অস্ত্র করেই একদিন এদের বিরুদ্ধে লড়ব।

দাসরাজের কথায় সত্যবতী সহসা চমকে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল তার সর্বশরীর। দাসরাজ নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছে। সত্যবতীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর কি মনে করে চোখ বুজল। অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থাকল। মনটাকে কঠিন ও নির্বিকার করার একটা অক্ষম চেষ্টা করল। স্ফুরিত অধরে এক ফালি হিংস্র হাসি ফুটে উঠল। স্বগতোক্তি করে বলল : একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল কেন একজনের জীবনে? এ কোন্ মহা রহস্যের

ইঙ্গিত ? তবে কি বিধাতা অন্তরের কথা শুনতে পেয়েছে?—সত্যবতী, তোর গর্ভস্থ সন্তান মহাকালের পরোয়ানা নিয়ে আসছে। ও এই কালো দ্বীপবাসী অনার্যদের জীবনে দুঃখ জ্বালা, ক্ষোভ, বঞ্চনা, বেদনার প্রতিহিংসা নিতে অবতীর্ণ হচ্ছে। ঐ পুত্র পূর্ণ অবতার।

সত্যবতীর মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। কোন ভাবনা-চিন্তা সে করতে পারছিল না। মুখ দিয়েও কোন স্বর বেরোল না।

দাসরাজ সত্যবতীর অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। সেই হাসিতে রোজকার দেখা দাসরাজ বদলে গেল। বার দুই ঢোঁক গিলল। একটা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। নিজের সেই বিস্ময়টাকে চট করে লুকিয়ে হেঁসে বলল : এ সব হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাস, স্বপ্ন ছাড়া অসহায় দুঃখী মানুষের আর কীই-বা আছে।

সত্যবতী কি উত্তর দেবে ? তার বুক কাঁপছিল। চুপ করে বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে করতে প্রশ্ন করল : আমাকে তুমি খারাপ ভাবছ না তো ?

দাসরাজ একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল। মাথা নেড়ে বলল : দূর বোকা।

তারপর একদিন যথাসময়ে অসহনীয় গর্ভযন্ত্রণা দাঁত টিপে সহ্য করে জন্ম দিল পরাশরের পুত্রকে। আর্য-জাতির রক্তবাহী শিশুটি অনার্য মায়ের গর্ভ থেকে নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হল। পুত্র দেখে দাসরাজের খুশির অন্ত নেই। কিন্তু সত্যবতী নিঝুম শরীরে এক ধরনের শীতলতা টের পাচ্ছিল। শীত নয়। কেমন জমাট শক্ত পাথরের মত অমোঘ এক শীতলতা তার শরীরকে অবশ করছিল। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল বার বার। চোখের সামনে নানারকম দৃশ্যাবলী ভেসে যাচ্ছিল। তার সবটার কোন অর্থ নেই।

সত্যবতীর সেই গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সাকারের একটু আনন্দ দেবার জন্য দাসরাজ সদ্যজাত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যবতী, এ ছেলে তোর, ওর বাপের নয়। বাপের রঙও পায়নি। আমাদের গোষ্ঠীর রক্তে ওর শরীর তৈরী। সে কথাটা জানান দিতেই যেন কষ্টিপাথরের মত রঙ নিয়ে এসেছে। দাদু আমার রসের নাগর। আমার স্বপ্ন সার্থক হল। আমার এই দ্বীপের কালো ছেলের নাম থাকল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। এই নাম কোনদিন ওকে আমাদের কথা, ওর মায়ের কথা ভুলে থাকতে দেবে না।

সত্যবতী তার এই বিষণ্ণতার ভেতরে হঠাৎ একটু দুঃসাহসী হল। আচমকা প্রশ্ন করল : আচ্ছা পিতা, আমার একটা কথার জবাব দেবে আজ ?

দাসরাজ সস্নেহে সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি তার মুখখানি উদ্ভাসিত করল। মাথা নেড়ে বলল : নিশ্চয়ই বলব মা। কী কথা শুনতে চাও বল।

আমার এই নারীজন্ম সার্থক করতে কে আমাকে এনেছিল পৃথিবীতে ? তার

কথা বলনি কোনদিন। বুঝতে দাও নি কে আমার আসল পিতা মাতা! কিন্তু তোমাদের কথাবার্তায় আমি তার ফাঁক টের পাই।

দাসরাজ একটুও দ্বিধা করল না। খুব সহজ কণ্ঠে বলল: তোমাকে কে কি বলেছে জানি না, কিন্তু একথা সবাই জানে তুমি আমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। আমি পথের থেকে এক হীরের টুকরো কুড়িয়ে কাপড়ের খুঁটে বেঁধেছি। তোমার মা এই ধীবর পল্লীর মেয়ে অদ্রিকা। পিতা পুরুবংশীয় চেদিরাজ উপচির বসু। একদিন ধীবর পল্লী দিয়ে উপচির বসু মৃগয়া করতে যাচ্ছিলেন। পথে সুদর্শনা ধীবরবালা অদ্রিকাকে দেখে কামাসক্ত হন। বলপূর্বক তাকে হরণ করে নিজের বিলাসকুঞ্জে নিয়ে গেলেন। তারপর একদিন সে ফিরল ধীবর পল্লীতে। অদ্রিকার শরীরে মাতৃত্বের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিজের ঘরে তাঁর ঠাঁই হল না। আমার ঘরেই তাকে রাখলাম। তার 'বাবা' ডাক আমার নেশা ধরিয়ে দিল। কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারলাম না। যমজ পুত্র ও কন্যা প্রসব করে সে হাঁফিয়ে মারা গেল। সেই তুই আমার বুক জুড়ে আছিস। আর, তোর যমজ ভাইটি বড় হলে উপচির বসু জোর করে তাকে একদিন নিয়ে গেল। অভাগা মায়ের মতই তোর ভাগ্যে সুখ সইল না।

শুনতে শুনতে সত্যবতীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চোখটা জলে ভরে গেল। দাসরাজও তাড়াতাড়ি চোখের জল গোপন করতে উঠে গেল দরজার বাইরে।

সত্যবতীর জননী-হৃদয় দ্বৈপায়নের জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। কতকাল দ্বৈপায়নকে দেখে না। দ্বৈপায়নের বয়স্ক মুখখানা কিছুতে কল্পনায় আসে না। একটা অস্পষ্ট ছায়া কেবল চোখের উপর ভেসে ওঠে। সত্যবতী হঠাৎ যেন টের পেল তার সব ছেলেদের মধ্যে সংসার-উদাসীন, ব্রহ্মচারী এই ছেলেটির প্রতি তার হৃদয়ের টান এবং গভীর ভালবাসা একটু বেশী। তার স্নেহ-কাঙাল-অন্তর এই সন্তানেরই সান্নিধ্য, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ চায় বেশি করে। সত্যবতী এই প্রথম অনুভব করল জীবনে সে কত রিক্ত আর শূন্য। তার সমস্ত জননী সত্তা এই পুত্রটির সান্নিধ্য লাভের জন্য আজ কাঙাল হয়ে উঠেছে। প্রতিটি মুহূর্তে তার উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় কাটতে লাগল।

দ্বার ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করল দ্বৈপায়ন। জটাবাকল পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত দ্বৈপায়নকে চিনতে সত্যবতীর কোন অসুবিধা হল না। এক গহীন চিরপ্রদোষে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে আছে—দ্বৈপায়নের মুখমণ্ডলে ঋষির জ্ঞানও উপলব্ধির স্নিগ্ধ মহিমা মিশেছে তাতে। মুগ্ধ সত্যবতীর বিহ্বল দুটি চোখের ছায়ায় মায়া সুনিবিড় হল। পলকহীন বিস্ফারিত দুই চোখে তাকিয়ে ছিল দ্বৈপায়নও। দামামার শব্দ বেজে যাচ্ছিল তার বুকের রক্তে। সত্যবতীর বুকের মধ্যেও নানারকম বিস্ফোরণ

ঘটতে লাগল। বুকের মধ্যে গতিময় তীরের মত এক দুরন্ত আবেগ এল। সত্যবতী হাত বাড়াল। দ্বৈপায়ন শিশুর মত মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সত্যবতী তাকে চেপে ধরল বুকের অভ্যন্তরে। উদ্গত আনন্দাশ্রুতে সহসা সত্যবতীর দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। দরবিগলিত ধারায় ঝরতে লাগল অশ্রু। কতবার দ্বৈপায়নের গণ্ডে স্নেহ চুম্বন এঁকে দিল। কপাল থেকে চুলগুলো যত্ন করে সরিয়ে দিল। কি যেন খুঁজল ললাটে? একটা গভীর তৃপ্তির শ্বাস পড়ল সত্যবতীর।

দ্বৈপায়ন জননীর কাণ্ড দেখে মৃদু হাসে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: ছোটবেলায় দাদামশাই এমন করে তন্ন তন্ন করে কপাল দেখত।

সত্যবতীর মুখে টেপা হাসি: তোর মনে আছে?

চপলতা প্রকাশ করে দ্বৈপায়ন বলল: থাকবে না আবার? ছোটবেলার কোন কথা ভুলিনি। ভুলব না কোনদিন।

কি ভুলবি না?

তুমি যা দেখলে?

আমি আবার কি দেখলাম?

তুমি জান কি দেখেছ। তবে দাদামশাই আমাকে বারণ করেছে, খবরদার কাউকে বলবি না। তোমাকেও বলব না।

সত্যবতী একটু ম্লান হেসে বলল: বেশ বাবা, বেশ। কিন্তু তারপরেই অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল কণ্ঠে, সবাইকে আপন বলে ভাবা উচিত নয়, বিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

একটা বিদ্যুৎস্পর্শ করে দ্বৈপায়নকে। নিজের শ্বাসের মধ্যে তার মৃদু কম্পন টের পায়। দুই সন্তানের জননী সত্যবতী। হস্তিনাপুরের রাজমহিষী। তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে তার দিকে ধাবমান। উজান বাইবার শক্তি যেন নেই তার। সত্যবতীর অভ্যন্তর ভেসে যাচ্ছিল এক অমোঘ লক্ষ্যে, নিয়তির নির্দেশে। দ্বৈপায়নের বুক ব্যথিয়ে উঠল জননীর কথা ভেবে। কিন্তু তার ভিতরকার বুদ্ধিমান বিবেচক ও প্রজ্ঞাবান ঋষিটি যেন সাবধান করে দিল তাকে। সত্যবতীর অভিমানের কষ্ট লঘু করে দেবার জন্য বলল: মা, তুমি ও-সব বিশ্বাস কর? রাজটীকা কত ছেলের আছে। তারা কি সবাই রাজা হয়? রাজার ভাগ্য পায়?

দ্বৈপায়নের 'মা' ডাকে সত্যবতীর মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিবতার ভার নামাল। চোখ দুটিতে কি গভীর মায়া, কি করুণা আর কত ছলছলে দেখাল। সত্যবতী মাতৃসম্বোধনে সহসা কেমন যেন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা না বলে দুটি চোখ পেতে রাখল দ্বৈপায়নের মুখের উপর। তারপর এক গভীর তৃপ্ত সুখের উল্লাসে তার ভেতরটা গলে গলে পড়ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সত্যবতী কথা বলতে পারল না।

জননীর ভাবান্তরে দ্বৈপায়নের বুকের ধকধকানিটা শুরু হল একসময়। সে বুঝতে

পারছিল জননী তাকে কিছু বলতে চায়। কিন্তু এক অপ্রতিরোধ্য স্নেহের প্লাবন তাকে শুধু টানছিল। আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠায় দ্বৈপায়ন বিব্রত বোধ করল। একটু ম্লান হেসে বলল ঃ তোমার ঐ গম্ভীর থমথমে ভাবটা এখনও গেল না। এত ভাব কি বলত? সত্যি তুমি এখনও সেই আগের মত কত সরল! একটুও বদলালে না। বলার মত কোন ঘটনা এটা। তুমিও দেখছ, আমার নাসিকামূল থেকে প্রশস্ত কপাল ভেদ করে যে মোটা শিরাটা মাথা স্পর্শ করেছে তা আজও তেমনি সরল ও সুস্পষ্ট। তোমাদের ভাষায় স্পষ্টত তা রাজটীকা।

বিস্ময়টাকে চট করে লুকিয়ে সত্যবতী দ্বৈপায়নের মুখ চাপা দিল। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ঃ চুপ কর্, চুপ কর্—ওরে পাগল ছেলে। এ সব নিয়ে কৌতুক করতে নেই। শত্রুর অভাব নেই। কার মনে কি আছে, কে জানে? সুলক্ষণ দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে হয়ত বিষই খাওয়াবে তোকে।

দ্বৈপায়ন একটু প্রগল্ভ হয়ে বলল ঃ দূর! আমি সন্ন্যাসী। সংসারের কিছু গায়ে মাখি না। তারপর প্রসন্ন কৌতুক করে বলল, তুমি কিন্তু দাদামশাইর বারণ শোননি। তোমার ভুলে আমার আর রাজা হওয়া হল না। একেই কপাল বলে।

সত্যবতী ঠাট্টা বুঝে হাসল। স্নিগ্ধ স্বরে বলল ঃ রাজমাতার পুত্র তুমি।

অবশ্যই, তাতে ভুল নেই কোন।

সত্যবতী একটু অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। প্রসঙ্গটা তার কাছেও অস্বস্তিকর। ভিতরে এক শিহরিত লজ্জার উত্তেজক স্পর্শ তার চোখ মুখকে রাঙিয়ে দিল। বলল ঃ পুত্র, আমি যে স্বস্তিতে তৃপ্তিতে নেই।

থমথমে গম্ভীর মুখে দ্বৈপায়ন প্রশ্ন করল ঃ কি হয়েছে তোমার?

সত্যবতী দ্বৈপায়নের চোখে চোখ রেখে বিবশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। বুক-জোড়া ভয়, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, মাথায় এলেমেলো হাজার চিন্তা। ক্ষীণ গলায় বলল ঃ অনেক কথা মনে পড়ছে। তুমি এখন পথশ্রান্ত। বিশ্রাম করগে। পরে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

দ্বৈপায়ন কিছু ভুরু কুঁচকে সত্যবতীর শ্রীময় মুখখানা দেখল। একটা ভারী সুন্দর হাসি হাসল। বলল ঃ আমি তোমার কাছেই থাকব। সমস্তক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করব। তোমার আমার হারিয়ে যাওয়া সম্বন্ধটা তাতেই গভীর হয়ে উঠবে। তখন আর দ্বিধা হবে না মনে।

সত্যবতীর সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। মনে মনে বলল ঃ জীবনের সংকট সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা ভীষণ জরুরী ব্যাপার। কিন্তু কোনদিন এই সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। কথাটা মনে হতেই নিজেকে সে দায়িত্বশীল করার প্রতি সতর্ক হল। দ্বৈপায়নকে দেখা থেকে বুকের অভ্যন্তরে সে একটা শক্তি টের পাচ্ছিল। ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। আর লজ্জা নেই, সংকোচ নেই; বরং প্রচণ্ড

একটা তেজে ধক্‌ধক্‌ করছিল তার দুই চোখ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল: পুত্র! সেই যে গেলে তারপর আর কোন খবর নিলে না জননীর। দুঃখিনী, অভাগিনী জননীর জীবন দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেল। কত ঘাত-প্রতিঘাত এল আর গেল তার হিসাব নেই। আমার জীবনে সে একটা গল্প। সে কাহিনী তোমাকে শোনাব বলে ডেকেছি। আমার জীবনের যে দিকটা অন্ধকার। যে পিঠে সূর্যের আলো পড়ে না, যা আমাকে সর্বদা সংকুচিত করে রাখে, তার কথা আজ বলার সময় হয়েছে। সব শুনে তুমি যা স্থির করবে, তাই হবে।

তারপর সত্যবতী ধীরে ধীরে আরম্ভ করল, তার গল্প। একরকম বেপরোয়া মুখে স্তিমিত গলায় বলল: ঋষি পরাশর তোমায় নিয়ে গেলে চোখে অন্ধকার দেখলুম। নিদারুণ মর্মব্যথায় বুক আমার টাটাচ্ছিল। মনে স্বস্তি ছিল না। অহরহ কি যেন সূঁচের মত বিঁধতে লাগল। শান্তি পাবার আশায় একদিন সন্ধ্যেবেলায় লিঙ্গরাজের মন্দিরে গেলাম একা।

মন্দির অন্ধকার। লোকজন নেই। দেয়ালের ছোট ফোকরে প্রদীপের মিটমিটে আলো চোখে পড়ল। নাটমন্দির পার হয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ করতে একটা ছায়া নড়ে উঠল। থমকে দাঁড়ালাম সেখানে।

অদ্ভুত এক গলার স্বর শুনতে পেলাম। তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে যেখানে প্রদীপ জ্বলছিল, অদ্ভুত কণ্ঠস্বরটা সেখান থেকে এল। দেয়ালের আড়ালে পিতার মুখ দেখলাম। তার পুরুষ কন্ঠস্বর মন্দিরের নির্জন পরিবেশে সহসা যেন অলৌকিক হয়ে উঠল। আমার প্রতি লোমকূপে তার এক ভয়ার্ত শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল।

আমার মুখের উপর কুলুঙ্গির প্রদীপ ধরল পিতা। তার মায়া হাতের স্পর্শে আমার শরীর কণ্টকিত হল। স্নেহবিগলিত কণ্ঠে ডাকল: গন্ধকালী। (সত্যবতীর আর এক নাম) তোমার বুকে নিদারুণ যে তাপ জমেছে চোখের জলে তা ত শীতল হবার নয়। পাষাণ দেবতার কাছে হা-হুতাশ করে মেলে না কিছুই। চিত্তেও জোটে না সামান্য সুখ। তুঁষের আগুনে অহরহ শুধু বুক পোড়ে। দেবতার সাধ্য কি, সে আগুন নেভায়? কিন্তু তোমার হৃদয় জুড়ে যে হাহাকারের বাজনা বাজছে, তার ভেতর আছে অনেক অতৃপ্ত বাসনা কামনা, বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার ইতিহাস। অন্তরের মধ্যে তাকে সংহত করে যদি তেজ সৃষ্টি করতে পার তবে এ আগুন নিভবে, মন শান্ত হবে।

সম্মোহিতের মত আমি তার দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে প্রশ্ন করলাম: আমার কি করতে হবে পিতা?

পিতা নিবিড় আলিঙ্গন পাশে আমাকে বেঁধে বলল: আমি কিছু বলব না। বললে, তুমি বিশ্বাসও করবে না। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে দেবতাকে তোমার মনের কথা বল। তা হলেই, তোমার মনের ইচ্ছাটা টের পাবে।

পিতার কথা শুনে বুকের ভেতরটা ধুক্‌পুক্‌ করছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বাধ্য ও অনুগত কন্যার মত লিঙ্গরাজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম। করজোড় করে প্রার্থনা করতে গিয়েও পারলাম না কিছু বলতে। পুত্র, তোমার এবং ঋষিবরের মুখ মনে পড়ল, আমার জননী অদ্রিকা এবং ব্যভিচারী পিতা উপচির বসুর এক কাল্পনিক ছবি চোখের উপর ভাসতে লাগল। আর সদ্যজাত একটা অনাথ শিশুর অশ্রুত কান্নার শব্দ কানে এল। ভিতরে ভিতরে একটা বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। যে আবেগটা পরাশরের প্রিয়া ও পত্নীর নামের সীমায় আবদ্ধ ছিল এতকাল, তা আর রইল না। মনে হল, আমি ও আমার জননী অদ্রিকা অনার্য আর ওরা আর্য। এই অনুভূতিতে আমি চমকে উঠলাম। মুহূর্তে আমার মনোরাজ্যে কোথায় যেন বড় একটা কি ঘটে গেল। তাতেই মনটা তেতো আর বিরূপ হয়ে উঠল। প্রার্থনায় আর মনোসংযোগ করতে পারলাম না। আর্যের অনিষ্ট চিন্তার এক কাল্পনিক দৃশ্য চোখের উপর জ্বল জ্বল করে উঠল। পিতার উদ্দেশ্য বুঝতে আর কোন অসুবিধা হল না। দুঃখকষ্ট বঞ্চনা মানুষকে সুস্থ রাখে না। বিরূপ অন্তর শুধু মানুষের মন্দই চায়। তখন বিরূপ অন্তরের ভেতর যে তেজ সৃষ্টি হয় সেই তেজ থেকে জন্ম নেয় এক নতুন সত্তা। সেই বিদ্রোহী সত্তা অশুভ অত্যাচারী শক্তির ধ্বংস চায়।

অকস্মাৎ মাথায় পিতার হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। আমার সর্বশরীর ঝিন্‌-ঝিন্‌ করে উঠল। চমকে পিতার দিকে তাকালাম। তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে পিতা আমার মুখের মধ্যে কি যেন খুঁজল অনেকক্ষণ। তারপর কিছুটা গম্ভীর গলায় বলল: প্রার্থনা মানে মনসংযোগ। দেবতাকে সামনে রেখে মনের গোপন ইচ্ছাটা তাঁকে একান্তে সংগোপনে নিবেদন করি আমরা। প্রতিকার প্রার্থনা করি, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তাঁর করুণা চাই। তুমি কোন্‌ করুণা প্রার্থনা করলে গন্ধকালী ?

পিতার প্রশ্নে একটা শিহরণ আর ভয় খেলে গেল আমার সারা শরীরে। বিমূঢ়ের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। পিতা এত বিপজ্জনকভাবে আমার মনের ভেতর হানা দিল যে আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমার অনুভূতি উপলব্ধির পরিবর্তনটা আমাব মুখে চোখে গভীরভাবে পড়েছে। আমার বুদ্ধিবৃত্তি সজাগ ছিল। আমি চিন্তা করতে পারছিলাম, বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার জীবনে একটা কিছু ঘটবে বা ঘটতে চলেছে। আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা শুধু তার ভূমিকা।

আমাকে নীরব দেখে পিতা মৃদু হেসে কুণ্ঠিত গলায় বলল: মনের সব কথা বলা যায় না। বলতেও নেই। তবে, তোমার মনের কথাটা আমি টের পেয়েছি। একটা কথা শুনে রাখ মা, ভবিষ্যতকে আমি তুমি কেউ রূপদান করি না। কিন্তু আমার তোমার উপর যা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া হল ভবিষ্যৎ। কারণ, এ হল নিয়ম আর একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অদৃষ্ট তোমাকে তার কর্মের পথে টেনে এনেছে আজ। তুমি আজ নিজের ইচ্ছেয় চলতে চেষ্টা করলেও পারবে না। তোমার

কাজের ফলশ্রুতিতেই তোমার ব্যর্থতা বা জয় আসবে। এটি নির্ভর করছে তোমার হৃদয়ের পবিত্রতা ও নিষ্ঠার উপর। দ্বৈপায়নকে মহাকাল হরণ করেছে পরাশরের ভেতর দিয়ে। তোমার ভাগ্যে একবার যা লিখিত হয়ে গেছে তা আর পরিবর্তন হবার নয়।

তারপরের কথাগুলো সত্যবতী বলল না। কিন্তু মনের ভেতর তা ঝংকারে বাজতে লাগল। গন্ধকালী, তুমি মহাকালের যজ্ঞের এক সমিধ, আমি ইন্ধন, আর দ্বৈপায়ন দেবের কর্মকান্ডের ঋত্বিক। এই তিনজনকে দিয়ে মহাকাল এক প্রতিশোধ নেবে আর্যদের অনার্য-বিদ্বেষ আর ঘৃণার। আমার গণনা মিথ্যে না হলে, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন হবে মহাধ্বংসের মহানায়ক।

কিছুক্ষণের জন্য সত্যবতী চুপ করে রইল। তারপর বার কয়েক ঢোক গিলে বলল: বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ। আমার দুই চোখ ক্রমে বিস্ফারিত হল। ভয়ে ভয়ে বললাম: আমার ভীষণ ভয় করছে।

প্রত্যুত্তরে পিতা বলল: এতে ভয় পাওয়ার কি আছে মা? তোমার চোখ অত জ্বলজ্বল করছে কেন? চোখে ও কোন্ বহ্নি?

ভিতরকার ভয় উত্তেজনায় আমার সর্বশরীর তখন থরথর করে কাঁপছিল। ভয়ে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। মানসিক শক্তিতে আমার টান ধরল। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলাম: তোমার কোন কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমার সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

পিতা একবার কপালে হাত দিয়ে হতাশভঙ্গি করে বলল: তা বটে। বোঝার বয়স হয়নি তোমার। সময় হলে আপনিই সব টের পাবে। আজ প্রার্থনার সময় নিজের মনটাকে টের পেয়েছে। শুভ ও মঙ্গল কামনার পরিবর্তে অশুভ আর অনিষ্ট চিন্তা উদয় হয়েছে মনে। কেন? এ প্রশ্ন কখনো করেছ নিজেকে? ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমানের যন্ত্রণা, বঞ্চনা থেকে মনের কোণে জেগেছে প্রতিকারের ইচ্ছা। প্রতিরোধের স্বপ্ন। এই ইচ্ছে আর স্বপ্ন সকলের ভেতর আজ প্রবল হয়ে উঠেছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে মুক্তি আমাদের আসন্ন। আমার রক্তের মধ্যে তার কলধ্বনি শুনতে পাই।

একটা দুরন্ত অস্থিরতায় আমি ছটফট করি। ঠোঁট কামড়ে ধরি। বললাম: পিতা, পুত্র দ্বৈপায়নের দুঃসহ শূন্যতা তুমি সইতে পারছ না। তোমার বুকের আগুনে তুমি জ্বলছ। এ দৃশ্য আমি সইতে পারছি না। তোমার মন অশান্ত। উত্তেজনায় প্রমত্ত, অস্থির, উদভ্রান্ত। পিতা, তুমি প্রকৃতিস্থ নও আজ। প্রগলভতা তোমাকে পেয়ে বসেছে।

পিতা তারস্বরে প্রতিবাদ করে বলল: ওরে না, না। প্রাচীন দেবগণের আদেশে এই রাজ্যের অধিপতি হয়েও আমি সন্তানহীন ছিলাম। তারপর একদিন দেবতার তৈরী বিচিত্র ছলনায় অকস্মাৎ বাঁধা পড়ে গেলাম আমি। ঘুমের মধ্যে প্রায় স্বপ্ন দেখি,

পালিতা কন্যা—আমার মুক্তির তরবারি, ধ্বংস করছে আর্যদের। আর, আর্যরা ওর তেজের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

কথাটা বলে ফেলে সত্যবতী জিভ কাটল। দ্বৈপায়ন বারান্দার দিকে সরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার যমুনার দিকে তাকিয়ে আছে। অবিরাম জল ভাঙার শব্দ কানে আসছিল। দ্বৈপায়নের উদাস অন্যমনস্কতাকে কোনরকম নাড়া না দিয়ে পূর্ব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সত্যবতী বলল : পিতা ! চমকানো বিস্ময়ের এক আর্তরব বেরোল আমার গলা দিয়ে।

দাসরাজ আমার মাথায় তার হাতখানা রাখল। খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু দুই চোখে মায়া, করুণা, কত গভীর আর ছলছলে। আস্তে আস্তে বলল : দুঃখ কি সামান্য বস্তু ? দুঃখ মানুষকে শক্তি দেয়, তেজ দেয়, বীর্য দেয়। সেই মানুষই ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য যার ভেতরে তেজ রয়েছে।

বলতে বলতে সত্যবতী বুকের বাঁ দিকটায় একটা অবোধ যন্ত্রণা অনুভব করল। কেমন একটা ক্লান্তিতে সে অবসন্ন ও শ্রান্ত বোধ করল। এর পরের কথা বলতে সে লজ্জায় ও সংকোচে দিশাহারা হল।

মুগ্ধ বিভোর দ্বৈপায়ন বোবা বিস্ময়ে বাইরের বিশাল পৃথিবীর দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিল। জায়গাটির চারদিক থেকে জননীর বিবৃত ঘটনার বিস্ময় রেশটুকু খুঁজতে লাগল।

নিস্তব্ধতা যেন গভীরতর করে তুলল স্থানটিকে। জননীর গভীর অভ্যন্তরের কথা যেন বাতাসের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চোখ তুলে প্রশ্ন করল দ্বৈপায়ন : সেইজন্যে কি স্মরণ করেছ আমায় ?

হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকল সত্যবতী। নিঃশব্দ এক আর্তনাদ উঠে এল তার। অকস্মাৎ মুখ দিয়ে বেরোল : না, না কৃষ্ণ ! হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদও আমার জীবনে এক অভিশাপ। কিসের আশায় কিসের মায়ায় আমি এই প্রাসাদ আগলে আছি বলতে পার ? সে তোমার জন্যে। তোমার প্রতি এক অদ্ভুত ভালবাসা, স্নেহ আর মোহ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি কতকাল ?

কেন মা ?

ঈশ্বর জানে। কত সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটল আমার জীবনে। বিধাতা আমাকে দিয়ে তাঁর কোন্ কাজ করতে চায়, কে জানে ? এত দুঃখ গ্লানি আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে কেন ? তোকে নিয়ে ত আমি বেশ সুখে ছিলাম। আমার সেই সুখটুকু দস্যুর মত হানা দিয়ে কেড়ে নিল। ওলোট-পালোট করে দিল আমার জীবন। আমি রাজমহিষী হলাম। সে যে কত বড় শাস্তি আমার, তা যদি জানতিস ?

খুবই চিন্তিতভাবে সত্যবতী দু'হাত জড়ো করে তাতে থুতনির ভর রেখে শূন্য চোখে চেয়ে রইল সামনের দিকে। চোখ স্মৃতিভারাক্রান্ত। বহুদিন আগের একটা দৃশ্য দেখছে। মনের ভেতর তাকে গুছিয়ে নিতে কিছুক্ষণ সময় নিল।

গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সত্যবতী একা ফিরছিল বনপথ ধরে। বাতাসে উড়ছিল তার শাড়ির আঁচল ও চুল। হাতে একরাশ চামেলী আর যুঁই ফুল। তার সুগন্ধে বাতাস ভরপুর হল।

মৃগয়া করে ঐ পথে ফিরছিল হস্তিনাপুরের অধিপতি শান্তনু। নীরব বনভূমিতে গানের সুর, ফুলের মিষ্টি গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। এই পরিবেশে এটা আশা করেনি। তাই কৌতূহল তীব্র হল। ক্রমেই সুর ও গন্ধ নিকটতর হল। একটু আড়াল রচনা করে শান্তনু সন্ধানী দুচোখ মেলে চেয়ে রইল বনপথের দিকে।

বুনো খুশির উদ্দাম আনন্দে আত্মহারা হয়ে সত্যবতী ঝর্ণার মত নাচতে নাচতে এল। তার মুখর মুখে সহজ সরল হাসির আভা ফুটে আছে।

শান্তনু অশ্ব নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে তার সামনে পথ আগলে দাঁড়াল। হঠাৎ সামনে অশ্ব দেখে সত্যবতী থমকে দাঁড়াল। শান্তনু বিস্মিত মুগ্ধ চাহনি মেলে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সত্যবতীকে দেখতে লাগল।

পড়ন্ত সূর্যের সোনা রং-এর প্রতিবিম্ব পড়েছে সত্যবতীর মুখের উপর। তাতেই ওর ভরা যৌবনটা ভারী বিশিষ্ট হয়ে উঠল। স্বর্ণ গোধূলির আভায় শ্যামবর্ণ মেয়েটির মুখশ্রীতে একটু সবুজ সুন্দর, শান্ত স্নিগ্ধ কমনীয়তায় ভরে উঠল। শান্তনু অশ্বের পিঠে বসে নীরব চোখ মেলে নির্বাক রহস্যময়ী বনবালার দিকে তাকিয়ে রইল। এত বয়সেও তার মন রূপময়ী কোন অসীম বিশ্বের সৌন্দর্যের আকাশে প্রজাপতির মত ডানা মেলে অসীমে উধাও হয়ে যেতে চাইল।

সত্যবতী তার নিজের অজানতেই শিউরে উঠল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তির নীরব দু'চোখে ও কিসের ব্যাকুলতা? ওই বনসীমায় আঁধার নামান পাহাড় আর অতল নদীর জলের মত একটা রহস্য জড়িয়ে আছে তার চাহনিতে। ওর নীরব ভাষার অর্থ সত্যবতী জানে। আনন্দের গভীর স্বাদে মনটা ভরে উঠল। ইচ্ছে হল হাসি দিয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু সাড়া দিতে তার ভয় করল। অবচেতন মনে কেমন একটা নীরব আতঙ্ক জাগল, তার মোহ ভঙ্গ হল। ভীরুর মত অশ্বারোহী ব্যক্তির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কর্কশ কঠিন গলায় বলল ঃ মহাত্মন্! আপনি বয়স্ক। এভাবে আমার পথ আগলে দাঁড়ান আপনার শোভা পায় না! কৃষ্ণবর্ণা অনার্য রমণীরা কি আপনাদের লালসার সঙ্গী শুধু? আমরা কি এতই সহজলভ্যা? আমাদের কি সম্ভ্রম থাকতে নেই? আমরাও আপনাদের কুলের রমণীর মত রক্তমাংসের মানুষ। আমাদের হৃদয়, মন, প্রেম, সমাজ আছে। কিন্তু আপনারা আমাদের সম্ভ্রমহানি করে কুলের গৌরব এবং পরিবারের মর্যাদা কলঙ্কিত করেন। আপনাদের কাছে মানবিক দাবিটুকু প্রত্যাশা করা আমাদের কি খুব বেশী চাওয়া?

শান্তনু নির্বাক। তার মনের অতলে ঝড় উঠল। নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা শান্তনুর নেই। কিন্তু চোখের তারায় ফুটে উঠল এক নীরব আকূতি। সত্যবতী তার

জীবনে একটি পরম স্পর্শের স্বাদ এনে দিল। গঙ্গার কথা মনে পড়ল। কিন্তু আজ তা দূর জ্যোতিষ্কের মত আরো দূরে সরে গিয়েছে। সে আর তার জীবনে আলো ফেলতে আসবে না। তার স্বপ্নের পৃথিবী হারিয়ে গেছে। কিন্তু যে মেয়ে চোখের জল নিয়ে সমস্ত মানুষের হয়ে হৃদয়ের দাবি জানাতে পারে তার কথা মনের মধ্যে নতুন আবেগে নতুন অনুভূতিতে পুঞ্জিত হয়ে উঠল।

একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা পার হবার জন্য শান্তনু অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করল। হাসিতে মুখখানি সলজ্জ করে তুলে জিজ্ঞেস করল: বালা, তোমার ঘর কোথায়? এই পল্লীর কোন্ প্রান্তে থাক? কে তোমার পিতা? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে? আমি হস্তিনাপুরাধিপতি শান্তনু।

কথাটা শুনে সত্যবতী চমকে উঠেছিল। কৌতূহলী চোখেমুখে তবু একটা হাসির আভা ফুটে বেরোল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুদ্ধির সন্ধানী আলো ফেলে সত্যবতী শান্তনুর পিতৃসকাশে যাত্রার উদ্দেশ্য কতকটা অনুমান করতে পারল।

অস্বস্তি আর আনন্দের অনুভূতিতে মেশামেশি হয়ে সত্যবতী পথ চলছিল, যেতে যেতে শান্তনুর ঢলঢলে সুন্দর মুখ, দুটি চোখ যে তার দিকে তাকিয়ে প্রতিমুহূর্তে আরতি করছিল এটা সত্যবতী তার সত্তার ভেতর টের পাচ্ছিল। আর বিজয়িনীর সুখানুভূতিতে তার হৃদয় টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল।

শান্তনু কিছুটা অপ্রতিভ ভঙ্গিতে দাসরাজের কক্ষে প্রবেশ করল। মুখে হাসি।

বিস্ময়টাকে চট করে লুকিয়ে দাসরাজা হাসিমুখে শান্তনুকে বলল: বহু সৌভাগ্য করে আজ হস্তিনাপুরাধিপতি শান্তনুকে আমার এই গৃহে পেলাম। তাঁর পদস্পর্শে ধন্য হল আমার গৃহ। রাজন! আপনার এই অযাচিত অনুগ্রহের কারণ অবগত হলে অধীন সাধ্যানুসারে তা পূরণ করতে যত্নবান হবে।

দাসরাজের আপ্যায়নে শান্তনু খুশী হল। মুগ্ধ বিনয়ভাব ফুটল তার মুখে। এক মনোরম আসনে উপবেশ করল। এবং বিনয়ের সঙ্গে মৃদুমৃদু হাসতে লাগল। একটু সংকুচিত হয়ে বলল: এইরকম সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমরা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নরপতি। সম্মানে, গৌরবে, মর্যাদায় কেউ কারো ছোট নই।

দাসরাজ মৃদুমৃদু হেসে বলল: বিনয়, দীনতা অতিথি সেবার অন্যতম অঙ্গ। এগুলি ছাড়া অতিথি সেবার ষোল কলা পূর্ণ হয় না। অতিথিও সন্তুষ্ট হয় না।

আর্য রাজাদের উপর দাসরাজ মোটেই সন্তুষ্ট নয়। তাদের প্রতি একটু শ্রদ্ধা, অনুরাগ কিংবা ভালবাসা নেই। তাদের সং কাজ সন্দেহের চোখে দেখে। শান্তনুর আগমনের পিছনে সেরকম একটা মতলব দাসরাজ আঁচ করতে পারল। তবে লোকটি বেশ সুপুরুষ, লম্বা চওড়া, ফর্সা। চোখের দৃষ্টি নিরীহ এবং মুখের ভাব অতিশয় বিনয়ী।

দাসরাজের কথা শুনে শান্তনু গলাটা খাটো করে বলল: মহাশয়ের কাছে একটা বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। অনুমতি করলে নিবেদন করতে পারি।

দাসরাজ নির্বিকার ভাবে বলল: বলুন।

শান্তনুর বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল: আপনার কন্যার রূপ, গুণ ও ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার হৃদয় ঐ কন্যার সঙ্গসুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল। আপনি অনুগ্রহ করে ঐ কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্মতি দিয়ে কৃতার্থ করুন।

দাসরাজ ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল শান্তনুর দিকে। নিজের অভিজ্ঞতার গভীর ক্ষতগুলোর কথা তার মনে ভিড় করল। অতীতকে বিস্মৃত না হওয়া মানুষের স্বভাব। অতীতের শিক্ষা অভিজ্ঞতা নিয়ে তার বর্তমান চিন্তা। উপরিচর বসু, পরাশর কেউ অদ্রিকা, সত্যবতীকে পত্নীর মর্যাদা দেয়নি। মানবিক কর্তব্যটুকু পর্যন্ত করেনি। তাদের কৌমার্য হরণ করেছে কিন্তু দায়িত্ব বহন করেনি। এক অসহায় অবস্থার ভেতর ফেলে রেখে তাদের নারীত্বকে অপমান করেছে। কিন্তু শান্তনু তাদের মতন নয়। সে একটু আলাদা মানুষ। ধর্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেছে সত্যবতীকে। মা মরা দুঃখী মেয়েটার একটা ভাল হিল্লে হচ্ছে ভেবে, দাসরাজ একটু স্বস্তি ও শান্তি পেল। কিন্তু এই ইচ্ছে আর সুখটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। আর্য বিদ্বেষের ধাক্কা লাগল তার গায়। কোন অঙ্গ হঠাৎ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষ যেরকম হতভম্ব হয় ঠিক তেমনই একটা বিস্ময়বোধ ও সংকটে তার চিত্ত ভারাক্রান্ত হল।

মোহ কেটে গেলে এই বিবাহবন্ধন শিথিল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তখন দেবীর আসন থেকে টেনে ধুলোমাটির মধ্যে নামিয়ে আনবে। যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞার নেশায় আর্যরা অনার্যদের চিরকাল অবহেলা করে, তাদের সুখদুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকায় না, সেই ঘটনা যে পুনরাবৃত্তি হবে না—কে বলবে? সুতরাং শান্তনুর আর্য রক্তেও সেই সংস্কার ও বিদ্বেষ রয়েছে। তাই এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া এক দারুণ সমস্যা হল দাসরাজের। রমণীভাগ্য জুয়া খেলার মত। অবশ্য এই ঝুঁকি সব পিতাকে কন্যার বিয়েতে নিতে হয়। খানিকটা পিতামাতার নির্ভুল নির্বাচন, আর খানিকটা কন্যার ভাগ্য, এই দুইয়ে মিলে কন্যার বিবাহিত জীবনের ভবিতব্য। তবু সত্যবতীর মঙ্গলের জন্যে, তার সুখের জন্য, কিছু করণীয় তার আছে। শান্তনুর প্রস্তাবে রাজি হতে গেলে তার সমস্যা ও সংকটের মূলটুকু গোড়াতেই কেটে ফেলা দরকার। কিন্তু মুশকিল তার বীর্যবান পুত্র দেবব্রতকে নিয়ে। বিশুদ্ধ আর্যরক্ত তার ধমনীতে। তাছাড়া সে মস্ত বীর, দৃঢ়চেতা একগুঁয়ে এবং জিতেন্দ্রিয়।

সতীনের এই ছেলেটিই সত্যবতীর জীবনে একমাত্র কাঁটা। এই কাঁটা যদি দাসরাজ উৎপাটন করতে নাও পারে, তাহলে তাকে অন্ততঃ অকেজো করে দেবারই কথা ভাবল।

কিন্তু সেই কঠিন কাজটা কি করলে হয়, সে কথা ভেবে দিশাহারা হল। দেবব্রত শান্তনুর প্রিয় পুত্র। হস্তিনাপুরের যুবরাজ। শান্তনুর মৃত্যুর পর সে হবে রাজ্যের শাসক। সত্যবতী এবং তার সন্তানদের কোন অধিকার থাকবে না সে রাজ্য এবং সিংহাসনের উপর। ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ছাড়া কারো কোন গৌরব থাকে না। রাজ অন্তপুরে অনার্যা সত্যবতীর গৌরব, মর্যাদা কর্তৃত্ব ও অধিকারের পথ ধবেই করতে হবে। অন্যথায় রাজার আর পাঁচটা সাধারণ স্ত্রীর মতই তার দিনগুলো অনাদরে অনুগ্রহে কাটবে।

দাসরাজের মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করতে লাগল। কিন্তু একটু ভাবলও। একটি বিখ্যাত আর্যরাজবংশের রাজমহিষী হবে সত্যবতী! এটা কম কথা! শান্তনু তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে তার ছেলের সমবয়সী হবে। তবু সে ত রাজা। আর বৃদ্ধ রাজার তরুণী ভার্যা মানে, সে এক ভীষণ ব্যাপার! দাসরাজ নিজের অজ্ঞাতে মুচকি হাসল। নিজের মনে ভাবলঃ স্বপ্ন! স্বপ্ন ছাড়া মানুষের আর কি বা আছে!

দাসরাজ মনস্থির করে ফেলল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল জোরে, সশব্দে। শান্তনু একটু চমকে উঠে বললঃ দাসরাজ, সন্তানের মত প্রিয় আর আপন কিছু হয় না। যার শরীরের গন্ধ, স্পর্শ, মোহ পিতার মনে ঐশ্বর্য হয়ে থাকে, তার থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা শুনলে মানুষ যেরকম হতভম্ব হয়ে যায়, ঠিক তেমনি একটা বিস্ময়বোধ আপনাকে আচ্ছন্ন করেছে।

দাসরাজ বিষাদ মলিন একটু হাসল। বললঃ আপনার কথা শুনে আমার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ভয় দূর হয়েছে। আপনার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে কোন অমত নেই। আপনার জীবদ্দশায় আমার কন্যা পরম যত্নে এবং আদরে থাকবে। কিন্তু আপনার ত বয়স হয়েছে। সেই সময় সত্যবতীর কি হবে, তার কথা ভেবে বিচলিত হচ্ছি।

পিতার উৎকণ্ঠা দূর করতে পারলে এই বিবাহে কোন অমত হবে না।

দাসরাজ কথাটা শেষ করে, একবার শান্তনুর দিকে একটু তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। ঘৃণায়? শ্রদ্ধায়? প্রতিহিংসায়? কে জানে?—কিন্তু ওই তাকানোটা তীরের ফলার মত বিঁধল শান্তনুর শরীরে। তখন পুলকিত আবেগে শান্তনুর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। এক অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল তার দুই চোখে। চোখ দুটিতে কি গভীর আবেশ জড়ানো। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল। বললঃ আপনার অভিলাষ পূরণে কোন বাধাই আমি রাখব না। শান্তনুর সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে। সে ভেসে যাচ্ছে অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তির নির্দেশে।

দাসরাজের অধরে চতুর হাসি। বিনা ভূমিকায় বললঃ মহারাজ, এই কন্যার

গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মাবে, আপনার অবর্তমানে সেই হবে হস্তিনাপুরের রাজা। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ সত্যবতীর পুত্র যদি সিংহাসন পায় তাহলে এই বিয়ে হতে পারে।

দাসরাজের আচমকা কথায় শান্তনুর ভিতরটা ভীষণভাবে নাড়া খেল। এই সময় তার বুকের ধকধকানিটা বেড়ে গেল। একটা তীব্র অপমান আর হতাশায় চিন্‌চিন্ করছিল তার বুক। দাসরাজ তার অধিকারের বাইরে এরকম একটা কঠিন শর্ত যে করতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু ভাবল। ভাবতে গিয়ে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

যুবরাজপদে দেবব্রতের অভিষেক অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। প্রিয় একমাত্র পুত্রকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে পিতা হয়ে বঞ্চিত করবে কোন্ কারণে? লোকেই বা কি বলবে তাকে? নিজের বিবেককে বা কি বোঝাবে? সহসা রাজা দশরথের কথা মনে পড়ল। রূপমুগ্ধ দশরথ কিন্তু কেকয় রাজের অনুরূপ শর্তে ভয় পায়নি। তার লুব্ধ অন্তর কৈকেয়ীকে গ্রহণের সময় শর্তের ভালমন্দের বিচার করিনি। দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। সাহসী উদ্যোগী পুরুষের মত দশরথ শর্তকে তুচ্ছ করে দেখেছিল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে থেমেও যায়নি। সেই মুহূর্তে নিজের মন রাখার চেয়ে আর কোন সৎকর্ম আছে বলে মনে হয়নি তার। দশরথের সঙ্গে তফাৎটা শান্তনু সহসা দেখতে পেল। তার ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিবেচক পিতাটি তাকে সাবধান করে দিল। এই মেয়ে বিয়ে করলে কুল ভাঙবে, মর্যাদা নষ্ট হবে। কোথাও ঠাঁই হবে না দেবব্রতর। ও নিষিদ্ধ ফল। নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়িও না। নিষিদ্ধ ফল সত্যবতী? কথাটা মনের ভেতর ঝঙ্কারে বাজল শান্তনুর। কিন্তু সত্যবতী নিষিদ্ধ ফল হতে যাবে কেন? মেয়েটি কি সুন্দর, কি নিষ্পাপ তার চাহনি। কত সহজ, সরল আর স্পষ্ট। তেজে ভরা একটা তাজা জীবন আর যৌবন। সত্যবতীকে দেখেই বুঝেছে সে লালসার খাদ্য নয়, আকাঙ্ক্ষার অমৃত। সে কখনও ব্যর্থতার অঙ্গার নয়, পূর্ণতার শিখা। প্রতিহিংসার প্রতীক নয়, আনন্দস্বরূপিণী। এই সত্যবতীকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরে যেতে হবে? কথাটা মনে হতে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ কথা না বলে শান্তনু দুটি চোখ পেতে রাখল দাসরাজার মুখের উপর। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল: আপনার প্রস্তাব বড় কঠিন। পুত্র দেবব্রত জ্যেষ্ঠ। হস্তিনাপুরের যুবরাজ সে। পিতা হয়ে আপন পুত্রকে সিংহাসনের অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করলে অধর্ম হবে।

মহারাজ আমার এই সর্তের কোন বিকল্প নেই।

দাসরাজ আপনিও পিতা। পিতার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করুন।

পালক পিতার দায়িত্ব অনেক বেশী। মহারাজ অপরাধ নেবেন না। আর্য নরপতিরা সাধারণভাবে কামান্ধ হয়ে অনার্য রমণীদের বিবাহ করে, পরে রক্ষিতার

মত প্রমোদকক্ষে তারা জীবন কাটায়। তাদের সন্তানদের নাম পরিচয় কিছু থাকে না। গোত্রহীন এক মানবকুল। তারা রাজার দাস-দাসী হয়, সৈনিকের কাজ করে। সত্যবতীর অনুরূপ অনাদর অপমান আমি সইতে পারব না। রানীর গৌরব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, যদি তার গর্ভজ পুত্র রাজা হয়। অনেক বিবেচনা করে আমি এই সর্ত আরোপ করেছি। মহারাজ আমাকে ভুল বুঝবেন না।

অস্ফুট শব্দ করে শান্তনু বলল ঃ অগ্রজকে বঞ্চিত করে অনুজের অগ্রাধিকার দেয়া পারিবারিক প্রথা নয়। আত্মসুখের জন্য প্রথাভঙ্গ করতে পারি না।

দপ্ করে দাসরাজ জ্বলে উঠল ক্রোধে। বজ্রগম্ভীর স্বরে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল ঃ আমিও শুধুমাত্র আপনার মোহের স্বাদ মেটাতে আমার আদরের কন্যাকে অর্পণ করতে পারি না। নেশা কেটে গেলে আপনিও যে অন্য আর্যনরপতির মত তাকেও আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন না, তার প্রতিশ্রুতি কোথায়? আপনাকে বিশ্বাস করব কি করে?

দাসরাজ, আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি বলে কি এই কটূক্তি?

না মহারাজ। আমি পিতা। পিতার কাজ হল কন্যার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পথ তৈরি করা। আমি সেই কর্তব্য করছি মাত্র। হস্তিনাপুরাধিপতিকে স্মরণ করার জন্য নিবেদন করছি, আমার প্রার্থনা খুবই সামান্য। এতে কোন অধর্ম নেই। এটুকু অধর্ম মহারাজ নিজের জীবনেও করেছেন। আপনিও পিতার প্রথম সন্তান ছিলেন না। অন্যায়ভাবে জ্যেষ্ঠকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে রাজা হয়েছিলেন। আর আপনার সেই পাপে দেশে বারো বছর কোন বৃষ্টি হয়নি। এ সব কথাত মহারাজার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আপনার ক্ষেত্রে যা সম্ভব সত্যবতীর গর্ভজ পুত্রের বেলাতে তা অসম্ভব হবে কেন?

শান্তনু কথা খুঁজে পেল না। একটা বিষণ্ণতায় সমস্ত মনটি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ নির্ভুল অঙ্কের উপর দাঁড় করানো জিনিস। আমার মন স্থির করার আগে পুত্র দেবব্রতের সঙ্গে একবার পরামর্শ করব।

শান্তনুর কথা শুনে দাসরাজ একটু মুচকি হাসল, বলল ঃ তা তো বটেই।

তারপরেই বিষণ্ণ মন নিয়ে শান্তনু হস্তিনাপুরে ফিরে গেল।

দুদিন পর এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। ব্যাপারটা ছিল বিস্ময়কর। শান্তনুপুত্র দেবব্রত নিজে হাজির হল ধীবর পল্লীতে। আতিথেয়তার কোন ত্রুটি করল না ধীবররাজ। খবরের ভাল মন্দ আঁচ করতে পারল না দাসরাজ। তবে গুরুতর একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে এটুকু দেবব্রতের আগমনে টের পেল। প্রাথমিক আলাপের পর্ব শেষ হলে দেবব্রত অকুণ্ঠচিত্তে বলল ঃ ধীবররাজ, জননী সত্যবতীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে যাব বলে এসেছি। পিতা কিছু না বললেও আপনার শর্ত আমি মেনে নিলাম।

আমার জীবদ্দশায় কখনও সিংহাসনে বসব না। আপনার সম্মুখেই এই যুবরাজের উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করলাম। এবার আমায় জননীকে নিয়ে যেতে অনুমতি করুন।

দেবব্রতের কথা শুনে দাসরাজ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। একটা তীক্ষ্ম সন্দেহ তৎক্ষণাৎ পাকিয়ে উঠল বুকের ভেতর। একটা আশঙ্কা গতিময় তীরের মত তার মর্মে এসে আমূল গেঁথে গেল। দেবব্রত সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করলে যে সত্যবতীর পুত্রেরা তার অধিকারী হবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে হলে দেবব্রতকে আরো এক শর্ত পালন করতে হবে। মনে মনে শর্তের একটা বয়ান সে করল।

সত্যবতী অন্য একটি কক্ষে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেকটা কথাই শোনা যাচ্ছিল, তার মনের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। চরম গ্লানির আঁধার-কালো ঝড়। কান্নাভেজা চাহনিতে চেয়ে থাকে আলোভরা বনানীর দিকে।

দাসরাজের মুখে হাসি চোখে কপটতা। তার শরীরের মধ্যে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট এক প্রতিশোধস্পৃহা বার বার শিহরিত হয়ে গেল। মনে হল, বিধাতাই যেন ঠিক সময়ে ঠিক বুদ্ধিটাকে মাথায় এনে দিলেন। এরকম কোন সিদ্ধান্ত কিংবা কল্পনা তার মাথায় ছিল না। থাকার কথাও নয়। ঘটনার আকস্মিকতায় সব যেন আশ্চর্যভাবে ঘটে গেল। এই পরিণয় বন্ধন বিধাতার ইচ্ছাতেই হল। আর্য অনার্য সংঘাতের এক ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত করতেই যেন বিধাতা সত্যবতীর রূপ ধরে একের পর এক শর্তের সম্মোহন সৃষ্টি করল। এই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির কোন মানে হয় না। তবু বুকটা কেমন করছিল। বার বার মনে হচ্ছিল, একটা বড় কিছু হবে।

দাসরাজ অবিশ্বাসের চোখে দেবব্রতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: নতুন মাকে নিতে এসেছ, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। কিছু মনে কর না। কথাটা খুলেই বলি। তোমার উপর আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে। কথা দিয়ে কথা খেলাপ করার ছেলে নও তুমি। কিন্তু চিরদিন ত তুমি আর আইবুড়ো থাকবে না? তোমারও ছেলেপুলে সংসার হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ছেলেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয় এটাই পারিবারিক প্রথা। এখন তোমার ছেলের বেলাতে তোমার প্রতিশ্রুতি খাটবে না। সিংহাসনে সত্যবতীর ছেলের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হলে কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর?

দাসরাজের কথা শুনে দেবব্রত একটু অবাক হল। খুব ভদ্র গলায় বলল: দাসরাজ, আপনার কন্যার রূপে গুণে ও তেজে মুগ্ধ পিতা তাঁর আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। তাঁর অভিলাষ ও বাসনা পূরণের পথে বাধা আমি। পুত্র হয়ে পিতার সেই দুর্বিষহ দুঃখ ও বেদনার অবসান করতে আমার স্বার্থ বলি দিতে এসেছি। পিতার সুখ, আনন্দ ও চরিতার্থতার জন্যে যে যৌবরাজ্য এবং সিংহাসন জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করলাম,

তার কাছে আপনার ঐ দ্বিতীয় শর্ত অতি তুচ্ছ ও সামান্য। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এ জীবনে ভার্যা গ্রহণ করব না।

খুশিতে আটখানা হয়ে দাসরাজ বলল: সত্যিই তুমি মহৎ। তোমার মহানুভবতার কোন তুলনা হয় না।

দেবব্রতের গনগনে অভিমান আরও ফুঁসে উঠল দাসরাজের ইন্ধন পেয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু ভদ্র গলায় বলল: দাসরাজ, শেষ শর্তটি আরোপ করে আমার মনের সন্দেহ সংশয়কে ফের বাড়িয়ে তুললেন। শর্তে আপনার নিগূঢ় মতলব স্পষ্ট। বিয়ের ব্যাপারটায় আর্য-অনার্যের রাজনৈতিক বিরোধ প্রতিফলিত হয়েছে। আর্য আধিপত্য মুছে অনার্য ভাবধারা পত্তনের এই কৌশল অতীতে কেকয়রাজ অশ্বপতিও করেছিল দশরথের সঙ্গে।*

দাসরাজ হেঁ-হেঁ করে হাসল কিছুক্ষণ, তারপর বলল: যুবরাজ, অধিকার কেউ দেয় না। যে কেড়ে নেবার কৌশল জানে, অধিকার তার। একদিন এদেশে আর্যরা এমনি করে আমাদের সরলতা ও আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে বোকা বানিয়ে সর্বস্ব হরণ করেছিল। আর্যদের বিশ্বাস করে অনার্যরা ঠকেছিল। তাদের কৌশলকেই আমি যদি হাতিয়ার করে তুলি, তাহলে দোষ দেবে কেন ভাই? কিন্তু এ সব তর্কের কথা। কথার পিঠে কথা বলা। কথা নিয়ে আমরা খেলা করব না। আসলে এ হল উদ্বিগ্ন পিতার উৎকণ্ঠা আর সাবধানতা। কিন্তু তুমি যে চোখে ব্যাপারটা দেখলে আর বিচার করলে তাতে আত্মীয় সম্বন্ধটা তেতো হয়ে গেল।

দেবব্রতের মুখখানা নিমেষে আঁধার হল। লজ্জা আর অনুতাপে সে দাসরাজের দিকে ভাল করে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। শরীরের অভ্যন্তরে একটা গভীর অবসাদ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

স্বচ্ছ পর্দার আড়াল থেকে সত্যবতী দেবব্রতকে দেখছিল। দেবদূতের মত স্নিগ্ধ সুকুমার মুখশ্রীর পবিত্রতা দেখলেই বুকখানা ভরে ওঠে। পিতৃভক্তি যে দেবব্রতের জীবনে কতখানি জুড়ে আছে, তা এই ঘটনার ভেতর স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারল সত্যবতী। আশ্চর্য এক উল্লাস আর সুখানুভূতিতে তার অভ্যন্তর টৈটম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। আর কোন ভাবনা তার ভেতর ছিল না। যদিও অনেক কান্নার চিহ্ন লেগেছিল তার চোখের কোণে, তবু একটা দুরন্ত মুগ্ধতা নিয়ে সে পর্দা সরিয়ে দেবব্রতের সামনে এসে দাঁড়াল।

দেবব্রত চুপ করে থমথমে মুখে চেয়ে থাকে। চোখে বিস্ময়, মুখে মুগ্ধতা।

সত্যবতী স্বপ্নাতুর চোখে দেবব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ দেবব্রতের ভেতর সে শান্তনুকে দেখল। পিতার স্বভাব, গুণ, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব সন্তানের ভেতর প্রতিফলিত হয়। সুতরাং, দেবব্রতের ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য ও ঔদার্যের ভেতর শান্তনু

* মৎ-লিখিত 'জননী কৈকেয়ী'তে এই তথ্য ও ঘটনা পাঠকেরা পাবেন।

আছে। শান্তনুর বাহ্যরূপ মুগ্ধতা, কামান্ধতা নিয়ে তার কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু দেবব্রতকে দেখে তা কেটে গেল। দেবব্রতর মধ্যে ব্যাখ্যার অতীত কিছু দেখতে পেল। সত্যবতীর মুখেচোখে বেশ একটু সত্যিকারের খুশি ছড়িয়ে পড়ল। দুঃসাহসী স্বপ্ন জেগে উঠল তার চোখে। অসঙ্কোচে স্মিত হেসে মৃদুস্বরে বলল: পুত্র, দ্বিধা কেন? আমি সত্যবতী। জননী তোমার। হস্তিনাপুরে যাব বলে তৈরী হয়ে আছি। কিন্তু তোমার আর কথা ফুরোয় না। তাই আমিই চলে এলাম। সন্তানের কাছে মায়ের কোন লজ্জা নেই।

এই পর্যন্ত বলে সত্যবতী চুপ করল। দ্বৈপায়ন সম্মোহিত। মুগ্ধ দুটি চোখ জননীর মুখের উপর রাখল। কিছুক্ষণ চুপ করে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল: মাগো, তোমার মনের সমস্ত তারগুলি সত্যের সুরে বাঁধা। তুমি যথার্থই সত্যবতী। তোমার কথার ভেতর দিয়ে যখন দেখি তোমার মুখখানি, তখন ধায় মোর সকল ভালবাসা তোমার পানে, তোমার পানে মা-গো। আমি আর কিছুকে, আর কাউকে তোমার চেয়ে বড় হতে দেব না মা।

সত্যবতীর দু'চোখ ভরে সহসা জল এল! এখন তার আর কোন অস্বস্তি নেই, জ্বালা নেই। বুক জুড়ে এক ভালবাসার সমুদ্র।

সেদিন রাত্রিটা দ্বৈপায়নের জীবনে বড় সুন্দর, আশ্চর্য এক রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের ম্লান চাঁদের আলোয় হস্তিনাপুরের পথ ঘাট, নগরীকে যেন এক স্বপ্নপুরী করে তুলল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেঘের অসীমলোকে যাত্রা দেখতে লাগল।

মধ্য আকাশে কালপুরুষ যেন গোটা আকাশের বুকে পা দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রণং দেহি ভঙ্গিতে। দ্বৈপায়নের বুকের ভেতরটা শির্-শির্ করে উঠল। ওই তারামণ্ডলের মধ্যে সে যেন কি খুঁজতে লাগল। যে তারাগুলি মিলে কালপুরুষের আকৃতি; ওগুলো মিথ্যে নয়, ওর পায়ের কাছে সবচেয়ে জ্বলজ্বল করছে, যে নক্ষত্রটি তার নাম লুব্ধক। ওটাও সত্য, জ্যোতির্ময় সত্য।

নিশীথ রাত্রে একা একা চুপ করে খোলা আকাশের তলায় বসে নিজের মত কল্পনা করতে, উপভোগ করতে ভীষণ ভাল লাগে দ্বৈপায়নের। এক আশ্চর্য সুখে তার দেহ মন ভরে উঠল। দ্বৈপায়নের হঠাৎ মনে হল সে যেন কালপুরুষ হয়ে গেছে! হাতে তার তারার ধনু, কোমরে তারার তরবারি, মাথার কাছে যে উজ্জ্বল তারা জ্বলছে ওটা তার রাজটীকা।

নিজের ভাবনায় তন্ময় হয়ে গিয়ে দ্বৈপায়ন কালপুরুষের দিকে জোড়হাত করে দাঁড়াল। প্রার্থনা করতে চাইল। কিন্তু কি প্রার্থনা করবে? প্রার্থনার কথা

ভাবতে গিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর তার কানে এল। বাইরে বাতাসের সাঁ-সাঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে, মানুষের এই স্বর কোন শূন্যালোক থেকে ভেসে আসছে এ কি তবে তার অভ্যন্তরের কথা? যেখানে সব পেঁছিয়, সব জমা হয়—সেই মনের মহাফেজখানা থেকে উঠে আসছে?

দ্বৈপায়ন শূন্যে চোখে আকাশের দিকে তাকাল। ধারণাটা খুব স্বচ্ছ নয়। অস্পষ্ট। কুয়াশার ভেতর একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মনের মধ্যে তার ছবি বড় হচ্ছিল। মস্তিষ্কের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে।

মনের কোন সুড়ঙ্গ পথ ধরে দ্বৈপায়নের মনে তমসার তীরে পিতার তপোবনটির ছবি ভেসে উঠল তা সে অনুভূতি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। ফুলের উপর আলো পড়লে ফুলের পাপড়ি যখন খোলে ফুল কি তার টের পায়? ফুল কি জানতে পারে ফল ফলাবার নির্দেশ আসছে তার অলক্ষ্য থেকে? সে কথা গভীর করে ভাবতে গিয়ে তপোবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা সূত্রে বিচিত্র ঘটনাগুলো ভালমন্দের দ্বন্দ্বে তার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিল।

আশ্রমের প্রথম দিনের স্মৃতি শুধু নয়, সব ঘটনা তার মনে আছে। তবে প্রথম দিনের ঘটনাই তাকে সতর্ক সাবধান করে দিয়ে ছিল। বালক হলেও সেদিন দ্বৈপায়ন বুঝেছিল, এখানে তাকে সাবধানে থাকতে হবে। আশ্রমে সে একা সঙ্গীহীন। এখানে তার চারপাশে যারা আছে তারা কেউ স্বজন নয়, বন্ধু নয়। তাদের সঙ্গে কোনদি হয়ত প্রীতি সম্বন্ধ গড়ে উঠবে না। কার্যতঃ হয়েছিলও তাই। সেদিনের অভিজ্ঞত দ্বৈপায়নের সমস্ত মনটাকে টানছিল। তার মন, চিন্তা বর্তমানের মধ্যে ছিল না অতীতকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত চিন্তা পাক খাচ্ছিল।

আশ্রমে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। গোটা তপোবন ঘিরে ফুলের গন্ধ, চন্দনের সুবাস। বাতাস গন্ধবহ। নদীর বুক থেকে ঝির-ঝিরে স্নিগ্ধ বাতাস যেন দ্বৈপায়নের দেহের ক্লান্তি, অবসাদ জুড়িয়ে দিল। বিকেলের আলোভরা বনে যেন সঙ্গীতের মূর্ছনা রাশি রাশি ফুলের সৌন্দর্য, রঙ-বেরঙের প্রজাপতি, হরেক রকম পাখির কোলাহল। মগ্ন ন্ত্যে দ্বৈপায়নের অবচেতন মনে কেমন একটা নীরব ভালবাসা অঙ্কুরিত করল। মেতে যে হল শান্ত নির্জন তপোবন প্রকৃতির রূপরাজে রস বর্ণের পশরা মেলে যেন ধ্যানে বসেছে কোন অধরা এক অমরাবতীর সাধনায়।

পিতার কুটীরের সামনে দাঁড়াতে চতুর্দিক থেকে পিল পিল করে অনেকগুলি ছোট বড় আশ্রম বালক ছুটে এল। পিতা তাদের দেখিয়ে বলল, কৃষ্ণ, এরা তোমার সতীর্থ, বন্ধু, সহপাঠী। এদের সঙ্গেই তুমি এক কুটীরে থাকবে।

দ্বৈপায়ন স্মিত হাসল। মাথা নাড়ল। কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারল না। অপরিচয়ের একটা বাধা, সংকোচ, দ্বিধা, আড়ষ্টভাবে তাদের মধ্যে দেয়াল মত দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বৈপায়নকে ঘিরে আশ্রম বালকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তারা এমন ভাব দেখাল যেন এরকম অদ্ভুত মানুষ আগে দেখিনি কখনও। আশ্রমে সে একমাত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং কদাকার।

আশ্রম শিক্ষার্থীরা সকলে শ্বেতাঙ্গ আর্য সন্তান। হঠাৎ কৃষ্ণাঙ্গ নবাগত শিক্ষার্থীটি তাদের কিশোর মনে ঝড় তুলল। এতকাল তারা জানত আর্য সন্তানরা বেদ শিক্ষার অধিকারী। কোন কৃষ্ণাঙ্গের এ অধিকার নেই, তবু এই কৃষ্ণাঙ্গ অনার্যের প্রতি আচার্যের কৃপা ও করুণা কেন তার রহস্য ভেদ করতে অক্ষম হল। মনের ভেতর কৌতূহল এবং অসংখ্য এলোমেলো জিজ্ঞাসা কেবল পুঞ্জিত হল। দু'একজন দুঃসাহসী তরুণ তাপসের কটু মন্তব্য শুনতে হল দ্বৈপায়নকে।

এই কেলে ভূতটাকে আশ্রমে আনার সার্থকতা কি?

আমাদের কোন কাজে লাগবে না।

আশ্রমের কোন নতুন সেবাদাস হবে হয়ত?

আশ্রমে আগে ত কখনো অনার্য দেখিনি। ওরা পাপী, নরাধম। ওদের ছোঁয়ায় সব অপবিত্র হয়ে যায়। এসব জেনেও—

বাব্বা. গায়ে কি দুর্গন্ধ। দাঁড়ানোই যায় না।

এই চুপ, আচার্য পরাশরের পুত্র।

একে কেউ আচার্যের ছেলে বলবে?

ঠিক বলেছিস। চেহারায় কোন মিল নেই। চাঁদে আর বাঁদরে।

আমাদের ভূত দেখা হয়েছে, চল এবার কুটীরে যাই।

দ্বৈপায়নের সারা দেহ মন অপমানে জ্বালা করতে লাগল। একটা আলোচনা করার মত বস্তু পেলে বালকেরা তাই নিয়ে লেবু কচলানোর মত তেতো করে তবে ছাড়ে তাকে। এ ক্ষেত্রেও তারা তাই করল।

শান্ত পবিত্র তপোবনে গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত মিষ্টি রোদ এসে পড়ল তাদের মধ্যে। মৃত্তিকায় হিজিবিজি আলোছায়ায় এক বনকাব্য রচিত হল যেন। দ্বৈপায়ন দুচোখের নীরব চাহনি মেলে ঐ আলোছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল। দ্বৈপায়নের মনের মাধুর্য সব উবে গেল সতীর্থ. বন্ধুদের সমবেদনাহীন সমালোচনার কঠিন উত্তাপে। মনটা তেতো হয়ে গেল। নিজের যন্ত্রণাকে, দুঃখকে প্রকাশ করার ভাষা ছিল না তার। বুকের ভেতর তার জ্বলে যাচ্ছিল। কেমন যেন একটা বুকচাপা কান্না এল।

কুটীরের অভ্যন্তর থেকে পরাশর দ্বৈপায়নের মেঘে ঢাকা আকাশের মত থমথমে মুখ চোখ দেখল! বিকেলের বাতাসে তার ভাষাহীন কান্নার ক্ষীণ সুর যেন শুনতে পেল পরাশর। নীরব প্রীতির স্পর্শটুকু দেবার জন্যে কুটীর থেকে বেরিয়ে এল। বলল: পুত্র, জীবনকে সয়ে নেবার সংযম ঋষির অন্তরের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

ঋষিরা শুধু সহ্য করে না, ভালবেসে এই শান্ত জীবনকে মাধুর্যের সন্ধান এনে দে
দেয় অন্তরভরা ভালবাসার প্রশান্তি। তুমিও আমার পুত্র। পারবে না করতে ?

দ্বৈপায়নের সারা দেহ মনে শিহরণ জাগল। দু'চোখে ছেয়ে আসে তৃপ্তির আবে
মিষ্টি রোদভরা বনভূমি, তমসার মৃদু কলধ্বনি, স্নিগ্ধ বাতাস, পাতারম মর্মরধ্ব
প্রজাপতির রঙ তাকে আনমনা করে ছিল। সব দুঃখ, তাপ জ্বালা নিমেষে ঘুচে গেল
কিন্তু বুকে অভিমানের সমুদ্র। গাঢ় স্বরে বলল ঃ পিতা, কুঁড়িতেই যদি কীট লা
ফুলের ফুটে ওঠার আসল মজাটাই তাতে বিঁধে থাকে। বিকাশের অপমৃত্যু ঘটে।

পরাশরের অধরে মৃদু হাসির আভাস ফুটল। বলল ঃ পুত্র, পাহাড়ী ঝর্ণার বিক
অগ্রগতি উপলখণ্ডের বাধা পেয়ে থেমে যায় না। তার চলার পথকেই শুধু কল্লোলি
করে। বাধা আছে জেনে পরাণ যদি তোমার নেচে না উঠে তাহলে কিসের আশ
আনলুম তোমাকে !

পরাশর কি আশায় এনেছিল কোনদিন বলেনি তাকে। দ্বৈপায়নও জানার চে
করেনি। তবে তপোবনে থাকতে থাকতে সে অনুভব করত পরাশরের পুত্র হবে
সে খাঁটি আর্য হয়নি তপোবনে। সম্ভবতঃ গাত্রবর্ণ আর আকৃতি ছিল তার আ
হওয়ার বাধা। আচার্য মুনি, ঋষিরা তাকে স্নেহের চোখে দেখেনি। বরং এ
অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছে তাঁদের। প্রতিদিন প্রাতঃপ্রণাম করতে গেলে আচার্য
কেমন সংকুচিত আর কুণ্ঠিত হয়ে যেত। মুখে কিছু না বলে অনেকেই পুনরায় স্ন
করে শুচি হত।

আচার্যদের এই শুচি বায়ুগ্রস্ততা দেখে দ্বৈপায়ন খুব মজা পেত। ওঁদের এ
ঘৃণা পোষণের জন্য রোজই কিছু দুর্ভোগ পেতে হত। এই ঘৃণা বিদ্বেষ ছি
প্রত্যেকের ভেতর ব্যাধির মত। ঘৃণার কারণ, তার বর্ণ কালো। এই ঘৃণা ত
অন্তরে একদিন ঘুম ভাঙাল। তাকে জীবনকে দেখতেও দেখাতে শিখল।

কৈ এই ঘৃণাও তার হয় না। কিন্তু আর্যদের হয় কেন ? সভ্য আর্যরা ভা
এই দেশটার প্রভু তারা। আর এই দেশের আদিবাসী অনার্যরা হল অত্যন্ত নিম্নস্তরে
জীব, বর্বর, পাপী নরাধম। পশু বললেই হয়। তাদের দাবিয়ে রাখার জ
শক্তিশালী আর্যরা সর্বাগ্রে ধ্বংস করেছে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি
ইতিহাস। অতীতকে হারিয়ে অনার্যরাও মানুষ পরিচয়কে ভুলে গেছে। তারা অশ্লী
অসভ্য, বর্বর, অরণ্যচারী। অত্যন্ত নিকৃষ্ট বন্যপ্রাণীর সমতুল। এই রকম এক
বোধের দ্বারা সংকুচিত। কালো বলেই ঘেন্নার পাত্র। অনার্যরা তাদের অধিক
ভুলে মর্যাদা হারিয়ে আর্যদের অনুগত দাস হয়ে গেছে। আর্যদের কৃপাধন্য
থাকার জন্যে নিদারুণ লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমানের বোঝা বংশ পরম্পরায় বহন ক
চলেছে। এমন কি তরুণ আর্য সন্তানেরা পর্যন্ত ওদের মানুষ ভাবে না। অথ
এক দেশে প্রতিবেশীর মত পাশাপাশি বাস করছে, তবু তাদের সম্পর্কে কোন আগ্র

নেই, কৌতূহল নেই, সহানুভূতি নেই। বরং কত কুৎসিৎ আপত্তিকর ধারণা পুষে রেখেছে। শুধু তাই নয় পরবর্তী আর্য বংশধরদের মনে ঘৃণার বিষ ঢেলে দিচ্ছে। এই তপোবনে না এলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের এই জ্ঞান হত না। ঘৃণা ও অবজ্ঞার চেহারা কি মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক তা সে নিজে মর্মে মর্মে অনুভব করল। কিন্তু নিজেকে আপ্রাণ মুক্ত রেখে অভিমান ত্যাগ করে দ্বৈপায়ন আর্য ঋষি ও পণ্ডিতদের বোঝানোর চেষ্টা করল ঃ কোন সংস্কার বিশ্বাস, প্রথা, আচার মানুষের চেয়ে বড় নয়। গোত্র বা জাতি যাই হোক মানুষের সুখ দুঃখ বেদনা, দুর্ভোগ তার উপর নির্ভর করে না। তবে এই বোধগুলি মানুষের সরল, সুন্দর জীবনের সমস্যা সৃষ্টি করে। অন্তরে ঘৃণা, বিদ্বেষের বিষ জমিয়ে তোলে। মানুষকে অমানুষ, আর হিংস্র করে। মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায়। মানুষ আর মানুষ থাকে না। বেদের বাঁধা ধরা পথ ছেড়ে, ধর্মসূত্রের নির্দ্দিষ্ট মত ত্যাগ করে মানুষের কল্যাণ ও শুভর নির্দেশ করল। দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করে নতুন পথের সন্ধান দিল। সব রীতিনীতিকে এক করে নতুন সংহিতা রচনা করল।

কিন্তু দ্বৈপায়ন বহুকালের বিশ্বাস, সংস্কারকে রাতারাতি উল্টে দিতে পারল না। ঋষিরা তার নিন্দায় মুখর হল। তাকে অনার্য বলে তিরস্কার করল এবং ধিক্কার দিল।

মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে শুকিয়ে যায়। হৃদয়টা হয়ে উঠে মমতাহীন, নিষ্ঠুর। দ্বৈপায়নের মুখে চোখে সেই রকম একটা ভাব ফুটে উঠল। চোখে দুটো যেন ক্রোধের আগুনে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা পেল। নিজে থেকে একদিন পরাশরকে বলল ঃ পিতা, আমার দেহে আর্যরক্ত থাকলেও নিজের রক্ত ও চেহারার কাছে বন্দী আমি। আর্যদের দেখলাম। আর্য হলে আমার কি লাভ হত? আর্যত্ব আমাকে কোন শক্তি দেবে না, বরং বন্দী করবে। তোমার এই আর্যত্ব আমি চাই না। আর্যদের দেখে শুনে আমি ক্ষেপে গিয়েছি। অন্তরে আমার বিসর্জনের বাজনা। আমার সংহিতায় তাই আর্য হল শিক্ষিত, ভদ্র, সভ্য, সংস্কৃতিবান, রুচিশীল, উদার এবং উন্নত মনের মানুষ,—সে যে কুল বা জাতিরই হোক। ঋষিদের অমার্জিত অসংস্কৃত আচরণ কখনও আর্যর নয়। এরা নিজেরাই ত অসভ্য অনার্য।

পরাশর একটু হাসল। বলল ঃ অনেক কালের আর্য অনার্য ধারণার উপর একটা জোর ধাক্কা দিয়েছ। এমনটা যে হবে জানতুম। মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে। সেই সীমার বাঁধ যখন ভাঙে তখন মানুষের বড় দুর্দিন। বঞ্চিত প্রেমের এই পরিণামে সৌন্দর্য তো নেই। আর্যদের বিশ্বাসে, অহং-এ শিবও নেই, সুন্দরও নেই। সৌন্দর্য ছাড়া সত্যের রূপ ভয়ংকর। প্রেমের মধ্যে যদি সৌন্দর্য ফুরিয়ে যায় তাহলে বলে কি? হাঁ করা সেই বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের দিকে তাকিয়ে মহাকালের নিষ্ঠুর হাসি আমি শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ একটা কালপেঁচার কর্কশ স্বরে রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদ্ধ হল। কোন গৃহস্থের বাড়িতে শব্দ করে যেন একটা শিশু ককিয়ে কেঁদে উঠল। দ্বৈপায়নের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। হতাশার দীর্ঘশ্বাস পড়ল রাতের ভেজা বাতাসে। চিন্তার সম্মোহনকারী আকর্ষণটা ভেঙে যেতে তার সারা দেহ মনে একটা নিদারুণ ঝড় উঠল। স্তব্ধ রাতের অন্তহীন প্রশান্তি আজ তার মনে নিদারুণ বেদনাজড়ানো অপমানের চরম দুঃসহ গ্লানির এক স্মৃতি জাগিয়ে তুলে তার জীবনের সব শ্রী ও সৌন্দর্য নিবিয়ে দিয়ে গেল।

ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগল তার। সে আর বারান্দায় দাঁড়াল না। ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে শুল।

মনে মনে হিসাব করল, রাতের আর কতটুকুই-বা আছে?

তিন

হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে এক দারুণ সংকট উপস্থিত হল। অথচ, এরকম একটা অবস্থা যে কোনদিন উদ্ভব হতে পারে সত্যবতী দুই পুত্র হওয়ার পর কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হল। তার স্থলাভিষিক্ত হল কনিষ্ঠপুত্র বিচিত্রবীর্য। কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা পাণিগ্রহণের অল্পকাল পরে সেও ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করল। বিখ্যাত কুরুবংশের একমাত্র বংশধর গঙ্গাপুত্র দেবব্রত জীবিত রইল।

বিধাতা বড় রসিক। তিনি এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন। এই কথা ভাবতে গিয়ে সত্যবতী জমা খরচের এক হিসেব করল মনে মনে। যোগ বিয়োগ করে তৃপ্ত হওয়ার মত কিছু পেল না।

মনটা দুঃসহ দুঃখে ব্যথায় হতাশায় ভার হয়ে গেল। শোকের ভেতর সত্যবতী টের পাচ্ছিল তার বুকের ভেতর যে আগুনটা এতদিন জ্বলছিল দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তা দপ্‌ করে নিভে গেল। কিছুতে আর প্রজ্বলিত করতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অবসন্ন আর ক্লান্ত বোধ করছিল। দৈব বিরূপ। অদৃষ্ট তার সঙ্গে ছলনা করল। না-হলে এমন দ'দুটো তাজা তরুণ প্রাণ নিঃশেষ হবে কেন? আশার মুকুল ফোটার আগে ঝরেই বা যাবে কেন?

ভবিষ্যতের কোন সুস্পষ্ট ছবি সত্যবতীর চোখে ফুটে উঠল না। কিন্তু মনের ভেতর দাসরাজের কথাগুলো শিহরিত উত্তেজনায় এক অদ্ভুত ঢেউ দিতে লাগল। নির্জনতায় বসে সে অনেক বড় একটা কিছু অনুভব করল। সত্যবতীর স্বদেশ, স্বজাতি, বর্ণের মানুষগুলোর চাপা দীর্ঘশ্বাস বুকের শ্বাসপ্রশ্বাসে অনুভব করল। মনে পড়ল সে অনার্যদের জন্যে নিবেদিত। আর্যবংশের মধ্যে থেকে তাকে স্বজাতির জন্যে কিছু করতে হবে। এই মহান উপলব্ধি তার গায়ে কাঁটা দিল। নিজের ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে সন্তানহীনা পুত্রবধূর গর্ভে সে এক নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কথা ভাবল। যারা আর্যত্বের খোলস ভেঙে, সংকীর্ণমনা, মতলববাজ ও কায়েমী-স্বার্থের বাস্তুঘুঘুর প্রতিষ্ঠান তপোবনকে ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে ঘৃণা বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে স্বাধীন মুক্ত মানব সমাজের জন্য এক খণ্ড জমি অন্ততঃ প্রস্তুত করতে পারবে। যা হবে তাদের নিজস্ব বাসভূমি। বড় দুঃখ ছাড়া বড় কিছু পাওয়া যায় না। তাই

বোধ হয়, প্রাচীনপন্থী এই পরিবারটির ভিত ভাঙার আয়োজন করেছে দৈব। হঠাৎ মনে হল, নির্মেঘ আকাশ থেকে দৈব যেন তার দিকে বিশাল চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে। অমনি বুক থেকে উঠে আসে পুঞ্জীভূত অপমান—কেন? কেন? আমি কি করেছি, যে আমাকেই এত বড় কঠিন দণ্ড পেতে হবে?

কল্পনা বেশী দূর এগোয় না। তবু, পিপাসিত অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করছিল এক মহান ঝড়কে। সে ঝড় পৃথিবীর পলকা বিশ্বাস ও অস্তিত্বগুলো উড়িয়ে নিয়ে যেতে যেন তার গৃহের অভ্যন্তরেই হাজির। তার সত্তা এখন দ্বিখণ্ডিত। বিবাহের পূর্বে যে জীবন ছিল তা খণ্ডমাত্র। শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর তার দ্বিতীয় জন্ম হল। এবং এক পরিপূর্ণ, নতুন জীবন। আগের জীবন থেকে যা সম্পূর্ণ পৃথক। দ্বিতীয় পর্বের এই জীবন বিকাশের পূর্বে যে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল তার শোক, দুঃখ, হতাশা, যন্ত্রণা তাকে সমূলে উৎপাটিত করবে মনে হয়েছিল। কিন্তু দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরে পা দেয়া থেকে আর তা মনে হল না। বরং অন্য কথাই মনে হল। ঘর সংসার সাজিয়ে ছেলেখেলা করতে যে জন্মায়নি—এই কথাটা তাকে বিধাতা জানান দেবার জন্যেই মৃত্যুর মত একটা শক্ত আঘাত তাকে দিল। বড় দুঃখ ছাড়া বড় কিছু পাওয়া যায় না। বিপর্যয় যে বার্তা বহন করে আনল তা জীবন বিমুখ অনিত্য চিন্তা নয়, তা এক বৃহত্তর দায়িত্ব ও কর্তব্যের আহ্বান। মৃত্যু শুধু সেই রহস্যের আবরণ খুলে দিয়ে তার উপর এক স্বর্গীয় আলো ফেলল। এক বৃহৎ জগতের ছবি মেলে ধরল। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। বুদ্‌বুদের মত মনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

সত্যবতীর চিন্তা জুড়ে একটা ভাবনাই কাজ করছিল—কি করলে স্বামীর বংশ রক্ষা হয়? সমস্যার সুরাহা করতে দেবব্রতর কথা ভাবল। কিন্তু দেবব্রত দার পরিগ্রহ করবে না বলে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবু তাকেই অনুনয় করল সত্যবতী। কিন্তু দেবব্রত অটল থাকল তার প্রতিজ্ঞায়। উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তার বিবাহ করে বংশ রক্ষার যে কোন সম্পর্ক নেই এই কথা বুঝিয়েও সত্যবতী তাকে বিবাহে রাজি করতে পারল না। ফলে সংকট থেকেই গেল।

সমাধানের পথ খুঁজতে সত্যবতী রাজপুরোহিত এবং পণ্ডিতবর্গের পরামর্শ চাইল। মন্ত্রণাগৃহে সবলে একমত হয়ে জানাল যে, লোকান্তরিত বিচিত্রবীর্যের সন্তানহীনা যৌবনবতী মহিষীদ্বয়ের গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করে এই বংশরক্ষা করা যেতে পারে। ক্ষেত্রজ পুত্র সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত, ও সমাজ অনুমোদিত। বহু শাস্ত্রকথা উল্লেখ করে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সকলে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করল। তবে প্রত্যেক পরিবারের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে ঐ বংশের মাতা পিতার ঔরসজাত কোন পুরুষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সিদ্ধান্তে সত্যবতীর মাথা থেকে দুশ্চিন্তার পাহাড় নামল। কিন্তু সংকট

উত্তরণের পথ সহজ ছিল না। বুকজোড়া উৎকণ্ঠা, দ্বিধা ; মাথায় এলোমেলো হাজার চিন্তা জট পাকাতে লাগল। সে কিছুই শান্তভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। হঠাৎ শিহরিত হয়ে উঠল তার বুকের ভেতর। গায়ে কাঁটা দিল। দ্বৈপায়নের শ্মশ্রু গুম্ফ ঢল ঢল কৃষ্ণবর্ণ মুখখানা সত্যবতীর চোখের তারায় শ্রীময় হয়ে উঠল। নিজের মনেই সে হাসল। সম্ভবতঃ ভিতরকার আনন্দ ও উৎকণ্ঠাকে সামাল দেবার জন্যে বলল ঃ অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! বুকের ভেতর থেকে কথাটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে বিপুল পৃথিবীর আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে অনুচ্চ গলা খাঁকারির একটা শব্দ পাওয়া গেল। দরজায় মৃদু একটু করাঘাত। তারপরেই সে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেবব্রত।

দরজা উন্মুক্ত করতেই চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেবব্রত প্রশ্ন করল ঃ

আমাকে ডেকেছ ?

মৃদুস্বরে সত্যবতী তাকে ঘরের ভেতর ডাকল—এস, কথা আছে।

সত্যবতী কিছুক্ষণ দেবব্রতের দিকে তাকিয়ে রইল। আপন মনে মাথা নাড়ল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ আমি একটা জিনিষ কিছুতে বুঝতে পারি না, জানো ?

কী ?

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে সত্যবতী দেবব্রতের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতেই তাকে ডেকেছিল। ভীষ্ম ভগ্নী স্থানীয়া ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে কখনো রাজি হবে না সত্যবতী জানত। তবু তার উপর চাপ সৃষ্টি করল যাতে ভীষ্ম নিজের মুখে দ্বৈপায়নের নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু তার মনের আকাঙ্খা ভীষ্মকে বুঝতে না দেবার জন্যেই ছল করে বলল ঃ বুঝবার চেষ্টা কর। তুমি আমি বেঁচে থাকতে যদি এত বড় একটা প্রাচীন বংশ বংশধরের অভাবে লোপ পায়, তার স্রোতধারা শুকিয়ে যায় তাহলে লোকে বলবে কি? পিতৃগণের কাছে আমরাই-বা কি কৈফিয়ৎ দেব? তুমি এই বংশের সন্তান। পুরুষ মানুষ। তোমার কি কোন দায়িত্ব নেই ?

দেবব্রত ভ্রূকুটি করল। প্রশ্নগুলো শুনে খুশি হল না। একটু বিরক্ত হয়ে বলল ঃ ওসব জটিল প্রশ্নের জবাব জানি না।

সত্যবতীর কণ্ঠস্বরে একটু উষ্মা প্রকাশ পেল। হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছিল আপনা থেকেই। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল ঃ তুমি উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ। জানি আমাকে নিয়েই এত গণ্ডগোল। পিতা দাসরাজ তোমার কাছে চির অপরাধী করে রেখেছে আমায়। সারা জীবনেও বোধ হয় তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

ও-সব কথা বল না। বেশ গম্ভীর হয়ে বলল দেবব্রত। তার চোখের দৃষ্টি প্রখর হল।

সত্যবতী একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : না তুলেও তো পারি না। কেবলি মনে হয়, তোমার কাছে গোটা ব্যাপারটা মান অপমানের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

তুমি চুপ করবে।

সত্যবতীর একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : দেবব্রত, একদিন তুমি আমি দু'জনে ছিলাম অদৃষ্টের দুটি খুঁটি। দু' দেশের দুই রাজা জেদাজেদি করে খেলা মাৎ করার এক চাল দিল। তাতে দাসরাজার জয় হল কিন্তু আমি তুমি দুটি খুঁটির মত যে যার ঘরে আটকা পড়ে রইলাম। দু'জন কত কাছাকাছি, পাশাপাশি আর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি ; তবু, আমরা কেউ ছকের গণ্ডী ভাঙতে পারছি না। কেউ কারো দুঃখের ব্যথার, যন্ত্রণার ঠিক সমব্যথী হতে পারছি না। আমরা এক জায়গায় নিজের অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ মজার কথা হল, খেলাতে তোমার আমার আকর্ষণ, চমৎকারিত্ব এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কারো কোন গুরুত্ব নেই ; স্বার্থ ভঙ্গে কিংবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশঙ্কাও নেই। তবু সেই ছকের চাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

দেবব্রত জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কষ্টটা চট করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে একটু মৃদু হাসল। বলল : বেশ কথা বল তুমি। এই সব আবোল তাবোল ভেবে নিজে কষ্ট পাও, আমাকেও কষ্ট দাও।

থমথমে গলায় সত্যবতী বলল : জানি না। তবে এটা বুঝতে পারি, তোমার মনটা একজায়গায় আটকে গেছে। আর নানা সংস্কার মনের মধ্যে কাজ করছে।

দেবব্রত হাসল। বলল : আসলে তুমি আমাকে খুব ভালবাস। সব সময় আমার কথা চিন্তা কর। তাই হয়ত এই সব কথা মনে পড়ে। কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার কোথায় ?

কঠিন পুরুষ মানুষদের অন্তরে ভালবাসা বলে কিছু নেই।

কে জানে ? দেবব্রতের গলায় স্পষ্টই উদাসীনতা।

সত্যবতীর মুখে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা। অসহায়ভাবে বলল : দেবব্রত, সন্তানের কর্তব্য করছ না বলে নিজেকে তোমার ভেতরে ভেতরে দোষী মনে হচ্ছে না ? মানুষ তার বংশধারার মধ্যে বেঁচে থাকে। বিয়ে না করেও সেই কাজ করতে পার। বিচিত্রবীর্যের বধূরা আছে। আমার ইচ্ছে ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে তুমি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করে বংশ রক্ষা কর।

দেবব্রতের কণ্ঠ দিয়ে একটি আর্তস্বর বেরোল : জননী ! মুখ তার লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। শ্বাস ক্রমশঃ প্রলয়ংকর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল। ভিতরে ভিতরে একটা তীব্র অপমানের জ্বালা টের পেল। সে আরো অনেক কিছু অনুভব করল। দাঁতে দাঁত দিয়ে সে নিজের ক্রোধ লজ্জা সংবরণ করল। কিছুক্ষণ তাই কোন কথাই বলতে পারল না।

তাতে কি? ঐ সন্তান তোমার ঔরসজাত হলেও বিচিত্রবীর্যের সন্তান বলে পরিচয় পাবে তারা। এতে বংশ রক্ষা পাবে, তোমারও প্রতিশ্রুতি পালন হবে।

মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে সে শুকিয়ে যায়, আগুনের মত গনগন করে তার শরীর মুখ। সত্যবতীর কথায় দেবব্রতের মুখচোখে সেইরকম একটা ভাব। চোখ দুটোয় পাগলের চোখের মত একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। কণ্ঠে ঘৃণার বিষ ঢেলে বলল ঃ ছি! জননী। ভগিনী জ্ঞানে যাদের স্নেহ করি, যারা জ্যেষ্ঠের সম্মানে বসিয়ে পুজো করে তাদের নিয়ে অমন একটা বিশ্রী সম্পর্ক চিন্তা করলে কেমন করে?

সত্যবতী হঠাৎ ভারি বিষণ্ণ হয়ে গেল। কণ্ঠস্বরে জোর করে দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলল ঃ পুত্র, এ আমার আদেশ।

পুত্র হয়ে জননীর আদেশ পালন করতে না পারার অক্ষমতা, লজ্জা গ্লানি যে কত মর্মান্তিক তা যদি তুমি জানতে তাহলে আমার উপর এই অযথা অত্যাচার করতে না।

সত্যবতী লজ্জা পেল। জননীর সংকুচিত লজ্জিত বিষণ্ণ করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেবব্রতর অন্তরটা আত্মধিক্কারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সে সংযত করে নিল। তারপরেই বালকের মত অকপট স্বরে বলল ঃ তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালবাস বলে একটা যন্ত্রণা অনুভব কর। এই বংশের মহিষী হয়ে তুমি ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে বংশের উত্তরাধিকারীর মধ্যে আপ্রাণ ধরে রাখতে চাইছ। এতে তোমার কোন অন্যায় বা অপরাধ নেই। প্রকৃতি জগতেও চলেছে এই এক নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মে গাছে ফুল ফোটে, ভ্রমর আসে, ফল জন্ম নেয়, বীজ হয়ে বংশধারা রক্ষা পায়। মানুষও প্রবৃত্তির বশ। বংশরক্ষা তারও স্বভাব। কুরুবংশ অক্ষুণ্ণ রাখার যে প্রস্তাব তুমি করেছ তাতে আমারও মত আছে। কিন্তু আমি ছাড়া তোমার আরো একটি গর্ভজাত পুত্র আছে। ভ্রাতা দ্বৈপায়নকে এই কার্যে নিয়োগ কর। তার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে?

সত্যবতী একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল ঃ প্রতিজ্ঞা পালনে তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর। আর কিছু বলার থাকল না আমার। তুমি যখন পারছ না তখন তোমার কথামত তাকেই সন্ধান করতে হবে।

দ্বৈপায়ন আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। আসার পথে দু' একজন দাসদাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে চোখাচোখিও হল। প্রত্যেকে অবাক কৌতূহলী চোখে তাকে দেখতে লাগল। কেউ তাকে বাধা দিল না, প্রশ্ন করল না—কোন অভিবাদনও করল না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল। তারা হয়ত সবাই বুঝে নিয়েছিল সে এ বাড়ির কেউ নয়, একজন অপরিচিত আগন্তুক মাত্র।

জননীর ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল দ্বৈপায়ন। ঘরে ঢুকতে কেমন একটা দ্বিধা এল। অস্বস্তি ও সংকোচ লাগল। জননী সত্যবতী তাকে অকস্মাৎ স্মরণ করল কেন, দ্বৈপায়ন জানে না। তার কোন ইংগিতও সে পায়নি। তবু বুকের অভ্যন্তরে একটা বড় কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে, টের পাচ্ছিল সে।

অব্যক্ত অনুভূতির শিহরিত উজ্জীবক স্পর্শ তার মত ব্রহ্মচারীর অন্তঃকরণও আকুল করল। এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে তার বুক কাঁপছিল। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে সে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল ঃ মা!

সত্যবতী আচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ এস।

অপলক চোখে চেয়ে থাকল দ্বৈপায়নের আসা পথের দিকে। হাত বাড়িয়ে একটা কেদারা তার দিকে টেনে দিয়ে বসতে ইংগিত করল। তারপর কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। দ্বৈপায়ন একটু ইতস্ততঃ করে বলল ঃ জননী, আমাকে স্মরণ করেছ কেন, বললে না ত? তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায় আছি। কি করতে হবে বল?

সত্যবতী মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছিল দ্বৈপায়নকে। চোখের দৃষ্টি এই বয়সে কি গভীর! কেমন ধারাল চেহারা। দাসরাজের দেখায় সত্যি কোন ভুল ছিল না। এ ছেলে ভবিষ্যতে খুব বড় কেউ একজন হবে। সত্যবতীর গায়ে কাঁটা দিল। নির্বিকারভাবে বলল ঃ কৃষ্ণ, আজ্ঞা বল না একে। বল ভিক্ষা। প্রার্থনা।

দ্বৈপায়নের অধরে টেপা হাসি। বিনীত স্বরে বলল ঃ পুত্রের কাছে জননীর কোন ভিক্ষা প্রার্থনা থাকতে পারে না। থাকে শুধু আদেশ।

দ্বৈপায়নের কথা শুনে সত্যবতীর শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল এক দামামা। কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে হতাশ গলায় বলল ঃ বৎস, বিপন্ন আমি। মহা সংকটে পড়ে আজ তোমার শরণাপন্ন। আজ পুত্রদের মধ্যে একমাত্র তুমিই আছ। তুমি আমার আশ্রয়, আমার শেষ সম্বল। তোমার সম্মতির উপর নির্ভর করছে আমার ইহকাল পরকাল। বল, করবে তুমি।

দ্বৈপায়নের মুখে চটুল হাসি। চোখে মধুর কৌতুক। বলল ঃ বেশ বল।

সত্যবতী লাজুক মুখে হেসে গম্ভীর স্বরে বলল ঃ পুত্র, তোমাকে সব কথা খুলে বলেছি। নতুন করে কিছু বলার নেই। তবু মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি ঃ আমি তুমি কে? কোন্ উদ্দেশ্যে আমাদের জন্ম? বিধাতার কোন্ কাজ করব আমরা? আমরা উভয়ে জারজ সন্তান। মানুষের সমাজের কোন পুজায় লাগব না আমরা। তবু বিধাতা আমাদের হাতের পুজা পাওয়ার জন্যেই যেন ব্যাকুল। কেন জান? অভিশপ্ত জারজ সন্তানদের দিয়ে তিনি এক তৃতীয় দুনিয়া গড়তে চান। আজন্ম ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বিধাতা তাঁর পৌরোহিত্য দিয়েছেন। তাঁর কাজ তিনি করান। আমি তুমি নিমিত্ত। বিধাতার হাতের দুটি ঘুটি। ছকে বন্দী দুটি মানুষ।

মাতঃ তোমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বল। আমাকে সংশয়ে রেখ না। আমাদের চতুর্দিকে এ কিসের জাল?

পুত্র, তুমি কুরুবংশের কেউ নও। তবু ইতিহাসের অনিবার্য কারণে আজ তোমাকেই তার সব চেয়ে বেশী দরকার। তোমার দুই সহোদর চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্র-বীর্যের অকাল মৃত্যুতে কুরুবংশ লুপ্ত হতে বসেছে। ভীষ্ম পরিণয়বদ্ধ না হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ অবস্থায় একমাত্র তুমি আমার সন্তান হয়ে এই বংশের কীর্তি রক্ষা করতে পার। বিচিত্রবীর্যের দুই বধূর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে কুরুবংশ রক্ষা কর। এই আমার আদেশ। বিনা বাক্যব্যয়ে তুমি আদেশ পালন করে আমাকে তৃপ্ত কর। তোমার সম্মতি পেলে বধূদের প্রস্তুত থাকতে বলব।

দ্বৈপায়নের ললাটে চিন্তার বলি রেখাগুলি আরো গভীর ও কুঞ্চিত হল। কি করবেন স্থির করতে দ্বৈপায়নের ক্রমাগতই দেরি হচ্ছিল। বাতায়ন পথে দেখল আকাশে মেঘের দল ভেসে যাচ্ছে। একটি মেঘ আর একটি মেঘকে আকর্ষণ করছে। চলতে চলতে আলিঙ্গনে বাঁধছে। আবার পরক্ষণেই অগ্রবর্তী মেঘ পশ্চাদবর্তী মেঘের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে পালানোর খেলায় মেতে উঠেছে। পশ্চাদবর্তী মেঘ সর্বক্ষণ বাহু মেলে তাকে যেন নিবিড় বাঁধনে বাঁধতে চাইছে। ধরাধরি লুকোচুরি খেলার মাঝে মাঝে তারা পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধছে। কিছুক্ষণ জড়াজড়ির পর আবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। তাদের সেই রোমহর্ষ শিহরণের উজ্জীবক স্পর্শ আকাশের বুকে বিদ্যুৎ হয়ে যেন ঝলসে উঠল। কি অসাধারণ অদ্ভুত সে রতিরঙ্গ। দ্বৈপায়নের আবিষ্ট হয়ে গেল চেতনা। কেমন একটা তন্ময়তার ভাব সঞ্চার হল তার দুই চোখের চাহনিতে। সারা অঙ্গ এক রহস্যময় আকর্ষণে টাটাতে লাগল।

মনস্থির করে ফেলল দ্বৈপায়ন। সত্যবতী বিস্মিত হয়ে দেখল দ্বৈপায়নের সর্বাঙ্গে ভোগের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বৈপায়ন জননীর দিকে আর ভাল করে তাকাতে পারল না। মাথা নিচু করে কম্পিত স্বরে বলল: তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ করব।

কথাটা কোন রকমে শেষ করে দ্বৈপায়ন খুব দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল।

নিজের ঘরে দ্বৈপায়ন মনের অভ্যন্তরে কথাগুলো একা বসে বসে ভাবতে লাগল। রক্তের কলধ্বনি বড় উত্তরোল। কোষে কোষে তার আগুনের প্রদাহ। বুকে তার এ কোন্ আগুনের জ্বালা ঘনিয়ে উঠল? এ কি দেহ মনের যৌবনোচিত চাহিদা ও বঞ্চনার কোন অব্যক্ত ক্ষুধার জ্বালা অথবা তার ভিতরকার নিভৃত আক্রোশের অপমানের আগুন যা রাজমহিষী সত্যবতীর বংশরক্ষার দায়িত্বের বাতাস লেগে জ্বলে উঠেছে তার বুকে?

আবছা ঘরে বহুক্ষণ বিবশ হয়ে বসে রইল দ্বৈপায়ন। আর্যদের কত অপমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ, লাঞ্ছনা, অবিচার, অবহেলা তারা মা-ছেলে ভোগ করেছে। খণ্ড মেঘের

মত তার সব ছবি চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়। থামে না, মনে রেখাপাতও করে না। এলোমেলো হাজার চিন্তার একসময় তার দ্রুত দ্রুত হয়ে গেল। শরীর মিলনের আকর্ষণে নেচে উঠল। বুক জোড়া কিছু ভয়, কিছু চোরা আনন্দ, কিছু শিহরণ সে টের পাচ্ছিল যা তার কাছে নতুন, অনাস্বাদিত এবং অস্বাভাবিক।

অধীর আগ্রহে মিলনের প্রতীক্ষা করতে লাগল দ্বৈপায়ন। যখনই সেকথা চিন্তা করে তখনই বুকটা আবেগে আনন্দে টলটল করে উঠে। অম্বিকা, অম্বালিকা নামটা মনে মনে উচ্চারণ করল অনেকবার। রক্ত যেন বুকের মধ্যে চিন চিন করে উঠে। আশ্চর্য হল ঋষি দ্বৈপায়ন। সংযমের শান্ত রক্তস্রোত প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে যেন কোলাহল করে উঠল দেহের মধ্যে। তার সঙ্গে একজন সাধারণ গৃহীর কোন প্রভেদ নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মন তার অস্থির হল আরো। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে দুর্বিষহ বোধ হল। অপেক্ষা করার মত ধৈর্য ছিল না। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির খুশির স্রোতে সে অবগাহন করল।

আদিম আবেশ বুকে নিয়ে দ্বৈপায়ন অম্বিকার কক্ষে প্রবেশ করল। পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত কক্ষ, চন্দন, অগুরু গন্ধে সুরভিত। স্তিমিত দীপশিখা আলো আঁধারের এক স্বপ্ন সৃষ্টি করল।

প্রতীক্ষা ব্যাকুল রাজবধূ নানারকম রত্ন অলংকারে ভূষিতা হয়ে বসেছিল স্বর্ণ পালঙ্কে। দীপের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ল অম্বিকার চন্দন চর্চিত অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডলে। কজ্জলিত আঁখিকোণে মদনের শর নিক্ষেপের আয়োজন। অধরে কন্দর্পের বিশ্বজয়ী মোহন হাসি। নয়ন আননে তার দুর্বার মিলন বাসনা।

ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করল দ্বৈপায়ন। তার উজ্জ্বল চোখের সতৃষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ হল অম্বিকার নয়নে। রত্ন আভরণে ভূষিতা অম্বিকা বসে আছে শয্যায়। তার ব্রীড়াবনত ভাবটি ভাল লাগল দ্বৈপায়নের। শ্বেতাঙ্গা আর্যা রমণীর অপরূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করাল ব্রহ্মচারী ঋষিকে। মনে মনে বলল: এত সুন্দর অম্বিকা! কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম, সম্মোহন ঘটল।

বিনানন্দিত কণ্ঠে ডাকল: অম্বিকা! তুমি এত সুন্দর! তোমার ভুবনমোহিনী রূপ, সুঠাম তনুশ্রী দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। তুমি আমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছ।

আকস্মিক রূপের প্রশংসায় অম্বিকার সারা শরীর কেঁপে উঠল। ভিতরে ভিতরে মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত বয়ে যাচ্ছিল একটা খুশির তরঙ্গ। একটা অকারণ লজ্জায় সে বিব্রত বোধ করল। কিছুক্ষণ বাকাহারা হয়ে আনত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটি প্রার্থনা নীরবে মাথা কুটছিল। প্রতিটি মুহূর্ত অম্বিকা যেন দ্বৈপায়নের জড়িয়ে ধরা প্রতীক্ষা করছিল। এত জোরে যেন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, সে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

...তায় কাটল কয়েক মুহূর্ত।

অম্বিকার বুকের ভিতরটা দ্বৈপায়নকে দেখার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল। ভীত হরিণের মত ভয়চকিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে ধরল দ্বৈপায়নের মুখের উপর।

প্রদীপের আলো পড়েছিল দ্বৈপায়নের মুখে। মস্তকোপরি পিঙ্গল জটা, শ্মশ্রুসমন্বিত মুখ, রক্তজবার মত দুটি চোখ, মেদবহুল বিরাট বপু, পাথরের মত গাত্রবর্ণ ; —অম্বিকা শিউরে উঠল। একি দেখল! বুকের ভেতরটা তার থর থর করে কেঁপে উঠল। অম্বিকার সব স্বপ্ন, কল্পনা, আবেগ এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেল। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে বলল ঃ উঃ, কি ভয়ংকর! কি ভীষণ—আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

অম্বিকা দু'হাতে চোখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার উপর। চেঁচানোর উপায় নেই, করাঘাত করা বিপজ্জনক। সেখান থেকে সে শয্যার উপর আছড়ে পড়ল। শিশুর মত ফুকরে ফুকরে কাঁদতে লাগল। আর ঘন ঘন মাথা নাড়িয়ে বলতে লাগল ঃ না, না, এ ভীষণ অন্যায়। হা ঈশ্বর! এ তুমি কি শাস্তি দিলে? এত বিশ্রী, কুৎসিৎ ভয়ংকর অনার্য দস্যুটাকে আমি বরণ করব কি করে? এ কি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে ঈশ্বর?

দ্বৈপায়ন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতভম্ব দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বোধ হয় সে মানুষ ছিল না। পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে সম্ভবতঃ পরিস্থিতিটা একটুক্ষণ ভেবে নিল। তারপর হঠাৎ হাসল। অমলিন, সরল হাসি। দাঁতের ঝিকিমিকির ভিতর দিয়ে তার হৃদয় দেখা গেল। মাথাটা একটু নেড়ে বলল ঃ এরকম করলে কি হয়? আমি তো একটা সাধু লোক। ন্যালাক্ষ্যাপা গোছের মানুষ। মেয়েরা আমাকে পছন্দ করবে কেন? আমারও মেয়ে মানুষের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। আকর্ষণও না। আমাকে মেয়েরা এড়িয়ে চলে, আমিও চলি। কিন্তু একটা মেয়ে যে আমার ওপর নজর দিয়েছে, তার আচরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

ফোঁস করে উঠল অম্বিকা। কাঁপতে কাঁপতে ভাঙা বিকৃত গলায় বলল ঃ চুপ কর অনার্য বর্বর। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চেও না।

দ্বৈপায়ন কথা খুঁজে পেল না। কি করবে বিচার করতে পারল না। স্তব্ধ হয়ে কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। অপমানে, লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিল না। বুকের মধ্যে একটা ঝোড়ো বাতাসের দোলা।

অম্বিকা অনেকক্ষণ কাঁদল। গলা দিয়ে যখন আর আওয়াজ বেরোল না তখন দ্বৈপায়ন তার উপর ঝুঁকে পড়ে বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ শোন সুন্দরী, মহৎ কর্তব্য-পালনে আমি নিযুক্ত। ফিরে গেলে মাতৃ—আদেশ লঙ্ঘন করা হবে। তুমিও কর্তব্য-ভ্রষ্ট হবে।

এ কথায় চমকে উঠল অম্বিকা। চোখে আগুন, কণ্ঠে উষ্মা। বলল ঃ কর্তব্য

কি এতই নিষ্ঠুর? দেহ মনের নির্বাচন মানবে না সে? মন না চাইলেও ইচ্ছের বিরুদ্ধে করতে হবে অপ্রিয় অনুষ্ঠান? কর্তব্যপালনের সঙ্গে অন্তরের কি কোন সম্বন্ধ নেই? আমি চাই সেই পুরুষ যে আমার তনুতে তনুতে আবেশ ঢেলে দেবে, বিহ্বলতা আনবে, সমস্ত মনকে অবশ করে দেবে। দেহ-মন নিবেদনের জন্য আমার সমস্ত সত্তা কাঙাল হয়ে উঠবে। তোমার ঐ ভয়ংকর কদর্য বর্বর চেহারার মধ্যে সেই স্বপ্ন কোথায়? তোমার ঐ কদাকার শরীরের দিকে আমি বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছি না। আমার চোখের সামনে থেকে তুমি দূর হও! তোমাকে বরণ করার চেয়ে মরণ অনেক ভাল।

দ্বৈপায়ন স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারল না। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে কানের দুপাশ তার ঝি—ঝি করে জ্বলছিল। অজান্তে অস্ফুট একটা শব্দ বার হল দ্বৈপায়নের মুখ দিয়ে। তবে সে শব্দ বোবা। ভাষা ছিল না তাতে। কেবল বুকের জ্বালা ছিল।

অম্বিকার কক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে দ্বৈপায়নের লজ্জা হল, ঘেন্না এল নিজের উপর। মনটা তেতো হয়ে উঠল। আর কোন আকর্ষণ বোধ করল না। ভাল লাগার আবেগ অনুভূতিগুলো সব শুকিয়ে গেল। ব্যথিত ও বিমর্ষ দ্বৈপায়ন উঠে দাঁড়াল। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতরে সে শুনতে পেল জননীর কণ্ঠস্বর—পুত্র, কুরুবংশের নিভন্ত দীপ প্রজ্বলিত করতে তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যত বড় কারণ ঘটুক প্রতিশ্রুতি ভ্রষ্ট হয়ো না। মনে রেখ, বিধাতা তোমাকে দিয়ে এক নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করতে চায় কুরুবংশের অভ্যন্তরে। এই জারজ সন্তানেরা হবে একদিন মহাভারতের নায়ক। এরাই সৃষ্টি করবে অমর ইতিহাস। তার বীজ রোপণ করতে হবে।

এতক্ষণ যে কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব ছিল তার, সেটা কেটে গেল অম্বিকা যথার্থ সুন্দরী। পূর্ণ যুবতী। যৌবনোচিত আকর্ষণ তার দুরন্ত। তার দুকূল ছাপানো সেই যৌবন তরঙ্গ দ্বৈপায়নের মনের মধ্যে নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। রক্তের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সমস্ত শরীরটা টান টান হয়ে উঠল। কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত আক্রোশে বুক কাঁপতে লাগল। বারবার শিহরিত হল সর্বাঙ্গ। এরকম আগে কখনো হয়নি তার। ভিতরকার উত্তেজনায় এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন সারা শরীর জুড়ে দামামার মত বেজে যাচ্ছিল।

দ্বৈপায়ন আচমকা, ভীষণ আচমকা হাত বাড়িয়ে অম্বিকার শায়িত শরীরটাকে খামচে ধরে টেনে আনল নিজের বুকের ভেতর। তাকে নিষ্পেষিত করল। কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম, সম্মোহন, প্রলয়।

অম্বিকার কণ্ঠ থেকে আর্তরব বেরোল: উঃ, মাগো!

দ্বৈপায়নকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত মনে হল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার।

বুক দ্রুত উঠানামা করছিল। অম্বিকা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে দেহের উপর থেকে ঠেলে নামিয়ে দিল লাথি মেরে। বস্ত্র সংবরণ করতে করতে বলল : জানোয়ার !

আর্য—অনার্য ঘৃণার কূট সন্দেহ যখন সত্যি হয়ে উঠল অবশেষে, তখন দ্বৈপায়নের অন্তরে সত্যিকারের বিজাতীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রবল প্রতিহিংসা পুঞ্জিত হল। সেই পিশাচ রাগে তারা শরীর জ্বালা করতে লাগল। মুখখানা আগুনের মত গনগন করতে লাগল। এত বড় অপমান, আত্মগ্লানি জীবনে কখনো ভোগ করতে হয়নি তাকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত আগের একটা নিদারুণ ঘটনা তার মনকে তেতো করে দিল।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত দ্বৈপায়নের ঘুম হল না। মাথায় ধিকি ধিকি অঙ্গার জ্বলছিল। আত্মধিক্কার ও চারদিককার কলুষিত পরিবেশের উপর ক্রোধ, বিদ্বেষ তাকে পাগলের মত করল। তবে কি প্রতিশোধ নিতে চায় সে? উপচিরবসু মাতামহী অদ্রিকাকে অপমান করেছে, পিতা পরাশর করেছে মাতা সত্যবতীকে আর অম্বিকা করেছে তাকে। এর মধ্যে কি কোন অদৃশ্য যোগসূত্র আছে? কি সেই সূত্র? তিন পুরুষ ধরে একটি বংশধারা শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা অবহেলা, অনাদর, লাঞ্ছনা অপমানের শিকার হচ্ছে কেন? মানুষের অমঙ্গল কামনা অভিশাপের রূপ ধরে তাকে দিয়ে সেই শোধটাই কি তুলতে চায়? নইলে যে চিন্তা তার মনে জাগেনি কখনো, অকস্মাৎ মনের অভ্যন্তরে তা দাবানল হয়ে উঠল কেন? অম্বিকার সঙ্গে মিলনের প্রস্তাবে সে এক অন্য স্বপ্ন দেখেছিল, বাস্তবে সে স্বপ্ন চুরমার করে দিল অম্বিকা।

কালের প্রতিশোধ স্পৃহা থাকতেই পারে। দ্বৈপায়নকে নিজের কব্জায় এনে সেই প্রতিশোধটাই কি তুলতে চায় কাল? বুক থেকে উঠে এল পুঞ্জীভূত অভিমান। সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আর্যরা কোনদিন তাকে ভাল চোখে দেখেনি। অসাধারণ মেধা আর পাণ্ডিত্য দিয়ে সে সম্মান, মর্যাদাগৌরব আদায় করে নিয়েছে। নিজের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জোরে সে ব্রাহ্মণ এবং ঋষি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সব নিয়ে সে ভুলেছিল। আসলে সে ভালা নয়। অধ্যয়নের ছায়া দিয়ে বুকের তাপ ঠাণ্ডা করে রেখেছিল। অম্বিকার প্রত্যাখ্যানের অপমানের তাপ লেগে এখন তা খড়কুটোর মত জ্বলে উঠল।

কোন্ রন্ধ্র দিয়ে নিয়তি আসে তা মানুষের অনুমান করা অসাধ্য। তার ক্ষেত্রে এই নিয়তি এল অম্বিকার রূপ ধরে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান পদাঘাত আর অপমানের মর্মজ্বালার রন্ধ্র দিয়ে। দ্বৈপায়ন অম্বিকার দুর্ব্যবহার ক্ষমা করতে পারল না। বারংবার মনে মনে বলল, কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে তাকে।

কয়েকমুহূর্ত এই সব কথা ভাবতে গিয়ে দ্বৈপায়ন টের পেল, মাথা আর বুক জুড়ে আছে রাগ, ধিক্কার আর প্রতিহিংসার ঝড়। সে কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। কী করলে অম্বিকা জব্দ হয়। তার অপমানের জ্বালা জুড়োয়। ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের চরম দণ্ড দেয়া যায়। তার রূপের গর্ব আর তেজের ধ্বংস হয়— তার কথা ভেবে দিশাহারা হ'ল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দ্বৈপায়ন ঋষি থেকে একজন সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এল।

অন্তরের প্রতিক্রিয়া দ্বৈপায়ন কাউকে জানতে দিল না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় সত্যবতীর কৌতূহলী জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বলল: এই সন্তান সিংহাসনের অভিপ্রেত নয়। ও হবে ধ্বংসের ঝড়।

সত্যবতী উদ্বিগ্নস্বরে বলল: আমি জানতে চাই এরকম ধারণা তোমার কেন হল?

ধারণা আমার নয়, এ বিধিলিপি। অম্বিকার কৃতকর্মের অপরাধেই এক অভিশপ্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করবে! রাজকার্য তাকে দিয়ে চালান কঠিন হবে।

সত্যবতী হকচকিয়ে গেল। তার মুখে-চোখে যুগপৎ বিস্ময় ও একটা আতংকের ভাব ফুটে উঠল। উৎকর্ণ উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় তার কণ্ঠ থেকে অস্ফুট-স্বর বেরোল: হঠাৎ এরকম ধারণা তোমার হল কেন?

দ্বৈপায়ন নিজের অভিসন্ধিটাকে বুঝতে না দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হেসে হেসে বলল এ বাড়ির বাতাস শুঁকলে তুমি মানুষের মনোভাব টের পাবে। অবশ্য খুব গভ অনুভূতি উপলব্ধি আর বিচক্ষণতা দরকার।

সত্যবতী রহস্য ভেদ করার জন্যে বিচলিত স্বরে বলল: আমি ও সব অদ্ভুত ও লাগানো কথা শুনতে চাই না। তুমি আসল কথাটা বল।

দ্বৈপায়নের দুই চোখে জীবনকে দেখার কৌতুক ও বিস্ময়। বলল: সেটাই বলার চেষ্টা করছি। ধারণাটা মনের ভেতর মহাকাল ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু যে কথ সঠিকভাবে চিন্তা করা যায় না, শুধুমাত্র অনুমান করা যায়, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলব কোন্ উপায়ে? শুধু এটুকু জেনে রাখ, এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করলে পুরুবংশের কল্যাণ হবে। অন্যথায় এই বিষফল থেকে যে বিষবৃক্ষ জন্মাবে তারাও পৃথিবীতে ডেকে আনবে ধ্বংস। বহু রক্তক্ষয় হবে পৃথিবীর।

সত্যবতীর অন্তর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু ভয় পেয়ে কাঁদতে ভুলে গেল। দিশাহারার মত চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। জননীর অন্তরে অম্বি সন্তানের উপর উৎকট বিদ্বেষ সঞ্চার করার এক অনুকূল অবস্থা যে তৈরি করতে পেরেছে সে তা সত্যবতীর উৎকর্ণ অশান্ত মুখ-চোখ দেখেই বুঝতে পারল অম্বিকাকে জব্দ করার প্রথম অধ্যায়ের কাজটা চমৎকার উপায়ে সুসম্পন্ন করতে পারায় তৃপ্তিতে তার হৃদয়-মন ভরে উঠল।

সত্যবতী নিজের শরীরের ভেতর একটা শীতলতা টের পাচ্ছিল। একটা কাঁপুনি রেছিল তাকে। অনেকক্ষণ পর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : অনেককাল আগে পিতা বলত মহাকালকে গর্ভে ধরব আমি। তারপর এতদিন এসে সে তার াওনা সুদ সমেত আদায় করে নেবে। ক্রমেই অবস্থা ঘোরাল হচ্ছে। চতুর্দিকে না অশুভ এবং অমঙ্গল দেখছি। আমার ভীষণ ভয় করছে।

দ্বৈপায়ন একটু হাসল। কি অদ্ভুত মাদক হাসি! সত্যবতীর পায়ের তলায় াটি কেঁপে গেল! মনে হল ভূমিকম্প হল। প্রলয় ঘটল। বুক উথাল-পাথাল করল।

দৈব ছিল দ্বৈপায়নের সহায়। অম্বিকার পুত্র অন্ধ হয়ে ভূমিষ্ঠ হল। অপ্রত্যাশীয়ভাবে দ্বৈপায়নের সংশয় এবং আশংকা বর্ণে বর্ণে সত্য হল। অন্ধ ুত্র সত্যিই সিংহাসনে অনভিপ্রেত: দৃষ্টিহীন শিশু পরিবারের বোঝা। অন্যের নুগ্রহ, করুণা, দয়া, সমবেদনা নিয়ে অসহায় ভাবে বেঁচে থাকতে হবে। এর চয়ে বড় অভিশাপ তার জীবনে আর কি আছে? রাজকার্য করা, কিংবা শাসন রিচালনা করা কোন দিনই তার দ্বারা হবে না। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ম্বিকা উদ্বিগ্ন হল। ঋষির ভবিষ্যৎবাণী ও আশংকার কথা স্মরণ করে মনে নে দারুণ ভীত হয়ে পড়ল।

কুরুবংশ তার বংশধর পেল, কিন্তু সিংহাসন এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার অর্পণ রার যোগ্য হল না সে—এটাই ছিল সত্যবতী, অম্বিকা এবং ভীষ্মের দুশ্চিন্তা। সুস্থ এবং বীর্যবান সন্তানের জন্য পুনরায় সত্যবতী দ্বৈপায়নের শরণাপন্ন হল।

দ্বৈপায়নের অবাক লাগল। কুরুবংশের সে কেউ নয়। তথাপি, অদৃষ্ট তাকে ম্বকের মত কেবল আকর্ষণ করতে লাগল। অনুকূল ঘটনাপ্রবাহ যেন দ্রুতবেগে াকে পরিবারের অভ্যন্তরে টেনে আনল। এ আকর্ষণ কার? মহাকালের! বাইকে কাল কেবল আকর্ষণ করে। তাকেও করল। দ্বৈপায়ন নিজেও জানে না ধাতাপুরুষ তাকে দিয়ে কি করাতে চায়?

তবে এটুকু টের পাচ্ছিল : সে কাল-প্রেরিত। অম্বিকার অপমান তার ভেতর প্ত প্রতিহিংসা ও লুপ্ত তেজকে জাগিয়ে তোলায় উপলক্ষ মাত্র। নিদ্রিত পুরুষ-িংহের ঘুম ভাঙানোর জন্যে অম্বিকা উপকরণ শুধু। তার উপর ক্রোধ প্রতিহিংসা রতার্থ করার জন্যে তাকে আর ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতে হবে না। কখন কি করা রকার আর কি করলে ভাল হয় তার সব আয়োজন কাল যেন আগে হতেই ছকে খেছে, সে শুধু নিমিত্ত। মহাকালের রূপকার। দ্বৈপায়ন বিস্ময়ে নিজেকে প্রশ্ন লে : এ কার বিধিলিপি? তার, না অম্বিকার? না দুজনের?

দেহ ও মনে মিলনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ নিয়ে অম্বালিকার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল দ্বৈপায়ন। বহির্দ্বারে জননী সত্যবতী তার প্রতীক্ষায় ছিল। মনে তার ভয়, বুকে সংশয়। ভীরু লজ্জায় জিহ্বা তার আড়ষ্ট। স্বেদবিন্দু দেখা দিল ললাটে। মৃদু উত্তেজনায় কাঁপছিল তার কণ্ঠ। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় তার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দ্বিধা কাটিয়ে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ পুত্র।

দ্বৈপায়নের ওষ্ঠে ছিল নীরব অর্থপূর্ণ হাসি। চোখেমুখে পরিতৃপ্তির সুখ।

অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করল। কিন্তু পুত্রটি জন্মকাল থেকে অত্যন্ত কৃশকায়। দুর্বল ও রুগ্ন। ভীষণ শান্ত ও নিরীহ। কোন কিছুতে তার উৎসাহ, আগ্রহ কিংবা কৌতূহল ছিল না। কিছুই উদ্দীপিত করে না তাকে। তার এই নিস্তেজ ভাবটা সত্যবতীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। এই সন্তানের উপর নির্ভর করবে কোন্ ভরসায়?

দ্বিধা ও শঙ্কা থেকে পুনর্বার মুক্ত হওয়ার জন্য দ্বৈপায়নকে আরো একবার আহ্বানের কথা চিন্তা করল। এই নিয়ে পর পর তিনবার দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরে এল।

দ্বৈপায়নও অবাক হয়। নিজের কাছে তার প্রশ্ন ইতিহাসের কোন্ প্রয়োজন মেটাতে তাকে বার বার হস্তিনাপুরে আসতে হচ্ছে? পুরুবংশের সঙ্গে তার অদৃষ্ট কোন্ রহস্য সূত্রে বাঁধা?—উত্তর মেলে না। এলোমেলো হাজার প্রশ্নে ভারাক্রান্ত হয় মস্তিষ্ক। অকস্মাৎ বুকের অতল থেকে প্রশ্নটা উঠে এল ঃ কোন রাজনৈতিক ফয়দা করতে হয়ত জননী সত্যবতী তাকে বারংবার স্মরণ করছে। এর ফলে হস্তিনাপুরে তার যাওয়া আসা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে তার ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি সত্যবতী বিশিষ্ট করে তুলেছে। কারণ রাজঅন্তঃপুরে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করতে জননী খুব কাছে একজন নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভব করছে। তাই তাকে সামনে রেখে নিজের দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠার জন্যে পরিবারের অভ্যন্তরে তার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলছে। এবং খুব গোপনে সুচতুরভাবে রাজনীতির পুরোভাগে একটু একটু করে টেনে আনছে।

দ্বৈপায়ন জেনেছে হস্তিনাপুরের রাজ অন্তঃপুরে তার আগমন নিয়ে তর্কের ঝড় উঠেছে। অম্বিকা তার আগমনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং কোন চক্রান্তের পূর্বাভাস বলে সন্দেহ করে। ভীষ্মকে সত্যবতী সম্পর্কে সতর্ক এবং সাবধান করে দেবার জন্য বলেছে ঃ সত্যবতীর উদ্দেশ্য ভাল নয়। সে পুরুবংশের ভাল চায় না, চাইতে পারে না। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন নিয়ে তার এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং হৈ-চৈ সন্দেহজনক। আসলে সহজাতি ভীষ্মকে তার অবিশ্বাস। সে নামে মাত্র রাজ্ঞী। রাজ্য পরিচালনায় সব ক্ষমতা ভীষ্মের হাতে। ভীষ্মের

সঙ্গে দ্বৈপায়নেরও এই রাজ্যের উপর কিছু অধিকার যাতে জন্মে সেজন্যেই ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ছলনা তার। আসলে সত্যবতী পুরুবংশকে অনার্যবংশের রক্ষক রূপে গড়ে তুলছে। ভারতীয় আর্য রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা অনার্যদের আদৌ সম্ভব নয়। দাসরাজ সেই কথা বুঝে শর্ত সাপেক্ষে সত্যবতীকে প্রয়াত মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছে। কিন্তু হস্তিনাপুরের অদৃষ্ট মন্দ। দৈব সত্যবতীর সহায়। তাই স্বামী বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুতে শোকে দুঃখে উন্মাদ না হয়ে বংশরক্ষার নাম করে কানীন পুত্রকে এই পরিবারের একজন করে তুলেছে। রাজনীতিতে শান্তনুনন্দনের প্রভাব প্রতিপত্তি সিংহাসনকে মুক্ত রাখার জন্যে সত্যবতী পরিবারের অভ্যন্তরে তার নিজের শক্তিবৃদ্ধি করছে, দ্বৈপায়ন তার সেই প্রয়োজনের চাবিকাঠি।

অম্বিকার ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধি দ্বৈপায়নকে চমৎকৃত করল। হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসল। আসলে অম্বিকা তার সঙ্গে ভীষ্মের একটা সংঘাত বাধাতে চায়। সত্যবতীকে ভীষ্মের চোখে ছোট করে তোলা তার আর এক উদ্দেশ্য। আসলে লড়াইটা অম্বিকার সঙ্গে তার একান্ত নিজের। কিন্তু অম্বিকার মনের অভ্যন্তরে যে ঝড় উঠেছে সেই সর্বনাশা ঝড়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড পাকিয়ে তুলতে চায়। তার অঙ্কশায়িনী হওয়ার প্রতিশোধ নিতে এক ঘৃণ্য রাজনীতিতে সে নেমেছে। তাকে জব্দ এবং অপমান করার জন্যে পারিবারিক মধুর সম্পর্ককেও সে তেতো করে তুলতে চায়। তথাপি ঘটনার মধ্যে কিছু সত্য দেখতে পেল দ্বৈপায়ন।

জননীর ভেতর একটা অসহায় অস্থিরভাব সে লক্ষ্য করেছে। মনের অতলে এরকম একটা ভাবনার স্বাক্ষর বহুবার তার কথাবার্তায় ব্যক্ত হয়েছে। জননী তাকে দু'ভাবে চায়। এক পুরুবংশের আগামী বংশধরদের সে হবে জনক। দুই রাজপুরীতে সত্যবতী যে আর একা নয়—কথাটা অন্যদের জানান দেয়া। দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা অসাধারণ মানুষ আছে, যাকে ভারতবর্ষের মানুষ চেনে। কুরুদের শত্রুরাজ্য পাঞ্চাল এবং যাদব রাজ্যগুলির সঙ্গে তার গভীর সংযোগ, সদ্ভাব এবং হৃদ্যতা! তার মত মানুষকে যে কোন অবস্থায় একবার স্মরণ করলেই পাওয়া যায়—এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে।

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ব্যাপারটা যে জননীর একটা রাজনৈতিক চাতুরী অম্বিকার কূট সন্দেহ থেকে তা আঁচ করতে পারছে। বংশরক্ষার নাম করে ভীষ্ম এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের চোখে ধুলো দিয়ে বুক ফুলিয়ে সত্যবতী কিভাবে স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে অম্বিকার চোখ দিয়ে দ্বৈপায়ন দেখল। এখন তার এই ঘন ঘন তলবের রহস্য কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করল। একটি রাজবংশকে মুছে ফেলে তার স্থলে আর এক গোষ্ঠীকে নিঃশব্দে স্থানান্তরিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত বদলের এই অপূর্ব কৌশলটি জননীর বিভ্রান্তি সৃষ্টির এক সুচতুর কৃতিত্বেই সম্ভব হল। চতুর ভীষ্মও

জননীর নিঃশব্দ কার্যকলাপের ভেতর সন্দেহর কিছু পেল না। বরং অম্বিকার কথা শুনে ভীষ্মের উল্টে মনে হল, অম্বিকা তার দ্বৈপায়ন-অপছন্দকে সত্যবতীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কাজে লাগাচ্ছে। অকস্মাৎ একটা অদ্ভুত হাসিতে তার অধর বিস্ফারিত হল। মনে হল, এ হাসি তার নয়, দৈবের। ভীষ্মের অদৃষ্ট যেন তার অধরে হেসে উঠল।

দ্বৈপায়ন তৃতীয় নয়ন দিয়ে সুদূরে ভবিষ্যৎকে দেখল। ভীষ্মের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় অবিশ্বাসের রন্ধ্র দিয়ে মহাকাল পালাবদলের ইতিহাস সৃষ্টি করতে নিঃশব্দে এবং গোপনে এল। লড়াইর ক্ষেত্রটা তার ও অম্বিকার তটভূমি থেকে ক্রমেই প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে আর এক বৃহৎ জটিল রাজনীতির ঘোলা আবর্তের মধ্যে।

শেষ শীতের কবোষ্ণ রোদ এক ঝিমঝিমে নেশাড়ু মাদকতা ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে। দ্বৈপায়নকেও তা চুম্বকের মত আটকে রাখে। পাইন, দেবদারুর ঝুরো ছায়া আর চার দিককার গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ফর্সা চাদরের মত টান টান রোদে তাকে এক অদ্ভুত পুরুষের স্বপ্ন দেখায়। সে পুরুষ সাধারণ নয়! অপাপবিদ্ধ, দুর্মর সাহসী, বিশ্বজয়ী। সেই মানুষ বোধ হয় প্রত্যেক মানুষের স্বপ্নের ভেতর বাস করে। তবু তার জন্যে প্রত্যেকে অপেক্ষা করে থাকে। দ্বৈপায়নের ভেতর সেই মানুষটার উদ্বোধনের জন্য জননী সত্যবতীরও অপেক্ষা ছাড়া উপায় কি?

অনেকক্ষণ জানলার পাশে আনমনে বসে ছিল দ্বৈপায়ন। হঠাৎ একটা খুট্ আওয়াজে সে চমকে উঠল। নিজের মনে হাসতে গিয়ে থমকে গেল! সত্যবতী তড়িৎপদে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিল। জননীকে এতখানি সাবধান হতে দেখে দ্বৈপায়ন বিস্ময়বোধ করল।

সত্যবতী অস্থিরভাবে একবার দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ ভাবিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সংকোচ কাটিয়ে বলল: কৃষ্ণ, আমার অশান্ত মনের পক্ষে সব কথা গুছিয়ে বলা সম্ভব হচ্ছে না। বলতে পারলে সবচেয়ে খুশী হতাম। কিন্তু—বলে একটু থামল। তারপর কয়েকবার ঢোক গিলে বলল: দু'দুটি পুত্র হল, তারা কেউই যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, হয়নি। ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। এখন যা হলে সব নিরুপদ্রব হয় তেমন কিছু কর। তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়।

কিন্তু বারবার তুমি আমাকে চাইছ কেন? আমি সন্ন্যাসী।

আমি তোমাকে তোমার আত্মজার মধ্যে খুঁজছি। যে তুমি তোমার শরীরে নেই, আছে আর এক দ্বিতীয় সত্তার ভেতর। যে তুমি নও, অথচ তোমার প্রতিরূপ, আমি তার সন্ধান করছি। সে থাকবে সকলের ভেতর আর তুমি থাকবে বাইরে এবং প্রচ্ছন্ন।

সত্যবতী দ্বৈপায়নের চোখের উপর তার দীর্ঘ নিবিড় দুই আঁখি মেলে ধরল। দ্বৈপায়ন মাথা নেড়ে বলল: আমি বুঝতে পারছি না আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

কৃষ্ণ, রাজকার্য দেখাশোনা, পরিচালনা এবং রক্ষণের জন্য আরো সুস্থ স্বাস্থ্যবান, বীর্যবান যোগ্যতাসম্পন্ন পুত্র চাই। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুর উপর ভরসা করতে

পারছি না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ আর পাণ্ডু কৃশ, কখন আছে কখন নেই। সেই জন্যেই বলছিলাম, তুমি দ্বিতীয়বার অম্বিকাকে গ্রহণ কর।

ভূত দেখার মত আঁতকে উঠেছিল দ্বৈপায়ন। বলল ঃ অসম্ভব। তার কাছে পুনরায় অপমানকর কিংবা অপ্রীতিকর কিছু ঘটুক তা আমি চাই না।

দ্বৈপায়নের এরকম তেজ, ব্যক্তিত্ব এবং চেহারার রূপান্তর সত্যবতী কখনো দেখেনি। কিছুক্ষণের জন্যে সে একটু হতভম্ব হয়ে গেল। শান্ত, নিরীহ পুত্রের ভেতর থেকে একটা তেজী সাপ বেরিয়ে এসে যেন ফণা তুলে ধরল। সত্যবতী অবাক হয়ে তাই চেয়ে রইল।

সত্যবতীর একখানা হাত এগিয়ে এসে দ্বৈপায়নের মাথা স্পর্শ করল। ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় স্পর্শ। সারা শরীর কেঁপে উঠল দ্বৈপায়নের। সত্যবতী হাতের মধ্যে তার কাঁপুনি অনুভব করল। একটুখানি নীরবতার পর আস্তে আস্তে বলল ঃ কৃষ্ণ, তোমার জন্যে আমার ভাবনা হয়। বিশাল পৃথিবী তোমাকে টেনে নেবে। কত দিকে কত কাজে তুমি জড়িয়ে পড়বে। তখন আমি থাকব না। তাই তোমার নিজের জন্যে একটা নীড় রচনা করে দিতে চাই। সেই হবে তোমার নিজস্ব অধিকারের ক্ষেত্র। অম্বিকা তোমাকে নীড় রচনায় সাহায্য করবে না। তবু তোমাকে তার ঘরে পাঠাচ্ছি। এও জানি, কোন প্রতিকূল অবস্থায় তোমাকে পড়তে হবে না। কেন জান ? অম্বিকা শূদ্রাণী দাসীকে তার পরিবর্তে নিয়োগ করবে। অবিমিশ্র অনার্য রক্তের সেই আত্মজটি হবে তোমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন আশ্রয় অবলম্বন।

দ্বৈপায়ন কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল। ভিতরে যে শক্ত জমি তৈরি হয়েছিল তা আবার বেনেজলে হয়ে গেল কাদামাটি। পিছল। ভীষণ পিছল। দ্বৈপায়ন দাঁড়াতে পারল না তার উপর।

পাদ্য-অর্ঘের থালি নিয়ে যে দাঁড়াল তার সম্মুখে সে অম্বিকা নয়। তার এক রূপসী শূদ্রাণী দাসী। বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না দ্বৈপায়নের। অম্বিকার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান ক্ষণিকের জন্যে হলেও তার অন্তঃকরণ বিদ্ধ করল। আর্যের তেজ, অহংকার, ঘৃণা, বর্ণবিদ্বেষ দ্বৈপায়নের বুকের ভেতর জ্বালা ধরিয়ে দিল। তপ্ত লাভা যেন দেহে শিরা, উপশিরা দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল।

শূদ্রাণী দাসীর ভক্তি-বিনম্র সেবায় দ্বৈপায়নের শরীরের সব তাপ শীতল হয়ে গেল। সারা অঙ্গ জুড়ে বর্ষার ঢল নামল। রহস্যময় আনন্দের এমন এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি সে যা আগে কখনও অনুভব করেনি ! কি আশ্চর্য সেই শারীরিক অনুভূতি। বুকের মধ্যে ঝর্ণার কল্লোল। রক্তে বাতাসের দাপাদাপি। কোথা থেকে গলিত লাভা গড়িয়ে এল বুকের ভেতর, নিঃশ্বাসে গরম বাতাসের তাপ লাগল ! এ তো ব্রহ্মচর্যের কঠোরতা দিয়ে ফিরিয়ে দেবার নয়, এর ভেতর যে আনন্দ আছে। এর যে মূল্য আছে দ্বৈপায়ন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে তা অনুভব করল। নিজের চেহারা নিয়ে আক্ষেপ নেই, গাত্রবর্ণের জন্য দ্বিধা নেই,—এক অনাবিল আনন্দের মধ্যে অবগাহন করল।

মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দ্বৈপায়ন শূদ্রাণীর পদ্মকলির মত স্নিগ্ধ মনোরম দুই আঁখিতারার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল! কি অপরূপ, মিষ্টি সে চাহনি!

সমস্ত প্রাণমন নিবেদন করে শূদ্রাণী যেন তাকে প্রার্থনা করছিল। দ্বৈপায়নের ভিতরটা মৃদু কাঁপছিল আশায় ও আনন্দে। শরীরের ভেতর এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন তাকে স্থির থাকতে দিল না। হাওয়ার মুখে একটা ছোট্ট বিপন্ন পাতার মত কাঁপছিল সে উত্তেজনায়। দ্বৈপায়ন দুখানা হাত তার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বুকে টেনে নিল। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে অনুভব করল। মনের মধ্যে তার অস্তিত্বের স্পর্শ লাগল। দ্বৈপায়ন তার অধরে অধর রাখল। অনাবৃত বুকের উপর মুখ রাখল। শরীর শিথিল হয়ে এল। শূদ্রাণীর চুলের সুগন্ধে দ্বৈপায়নের নিঃশ্বাস ভরে থাকল। মধুর স্পর্শে মুখটা খুলে গেল। শূদ্রাণীর ভিতর দ্বৈপায়ন তার মুখের স্পর্শ পেল। তার সারা শরীর যেন গান গেয়ে উঠল। অনন্ত সময় বয়ে গেল।

দ্বৈপায়ন শরীরের মধ্যে ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পেল। তার দুধারে যেন প্রজাপতি পাখা মেলে দিল উড়বার জন্য। শূদ্রাণীর শরীর যেন অনন্ত আকাশ। তার মনটা জ্যোৎস্নার মত হয়ে গেছে। আর দ্বৈপায়ন জ্যোৎস্না পান করে আকাশ গঙ্গায় ভাসতে লাগল। দ্বৈপায়নের শরীর যেন 'নীল অম্বর চুম্বন নত' হয়ে স্থির হয়ে রইল শূদ্রাণীর শরীরের উপর। কতক্ষণ কে জানে?

সে রাত্রি দ্বৈপায়নের ঘুম এল না। সারা রাত সে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলল। দ্বৈপায়নের গভীরে খুব গভীরে জন্মান্তরের মত বিচ্ছিন্ন অথচ যুক্ত সেই আশ্চর্য অনুভূতিটা নূপুরের মত বাজছিল। আকাশজোড়া বিদ্যুতের মত চমকিত হতে লাগল তার শরীরের গন্ধ, সুখ, হর্ষ। কে এই রমণী? নিজেকে প্রশ্ন করল দ্বৈপায়ন। বুকের গভীর থেকে তার জবাব এলঃ অম্বিকার নিয়তি। কুপিত অদৃষ্ট যেন ছল করে দ্বৈপায়নের কাছে পাঠাল তাকে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? সত্যবতীও বা তাকে কিসের ইঙ্গিত দিল?

অকস্মাৎ দ্বৈপায়নের মনে উদয় হল, সেও শূদ্রাণী মায়ের সন্তান। শূদ্রের সেবায় ও আত্মত্যাগে মানুষের কীর্তি ও সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে। শূদ্র পৃথিবীতে সেবার প্রতীক। সেবার শক্তিতে শূদ্র জাতি ধারণ করে রেখেছে এ মহা-বিশ্বকে। শূদ্রের নিরহংকার আচরণ, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, কর্তব্য এবং নিষ্ঠা দ্বারা তারা পৃথিবীতে অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করে। অদৃশ্য দেবতা সেই কারণে হয়ত তাদের উভয়ের মিলনে এক নতুন কর্মযজ্ঞের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলবে।

শূদ্রাণীর গর্ভজাত এই সন্তান কোনদিনই সিংহাসনের অধিকার পাবে না। কিন্তু মাতা সত্যবতীর আনুকূল্যে এবং তার ঔরসজাত সন্তান বলে হস্তিনাপুরের রাজসভায় এবং পরিবারে তার গুরুত্ব অবশ্যই থাকবে। এই পুত্র ভবিষ্যতে যাতে তার দক্ষিণ হস্ত এবং মস্ত সহায় হয় জননী তাকে সেরকম আশ্বাসই দিয়েছে। এই সন্তান তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন আশ্রয় ও অবলম্বন। দ্বৈপায়ন সেরকম ভাববার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতে তার ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠল না।

চার

রাজঅন্তঃপুরে দ্বৈপায়নের ঔরসজাত পুত্ররা বড় হতে লাগল। বিদুর দাসীপুত্র হলেও দ্বৈপায়নের পুত্র। এই জন্যে সত্যবতী তাকে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সমান মর্যাদা দিল। কুরুবংশের একজন হল সে।

দ্বৈপায়নের তিন পুত্রের মধ্যে বিদুরের স্বভাব খুব মিষ্টি। বিদুরের নম্র আচরণ, মধুর বচন, শান্ত ও শিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। প্রত্যেকেই তাকে ভালবাসে। দেখতেও সুন্দর। সুপুরুষ। লম্বা। চমৎকার চেহারা। চোখের দৃষ্টি নিরীহ এবং মুখের ভাব অতি বিনয়ের। মানুষের স্নেহ ভালবাসা, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার একটা অদ্ভুত শক্তি তার আছে। মানুষ হিসেবে সে খুব সহজ, সরল, সৎ, অকপট এবং ধার্মিক! অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তার দরদ সহানুভূতি, সমবেদনা এত গভীর যে ধৃতরাষ্ট্র বিদুর বলতে অজ্ঞান। বিদুর ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের একটি মুহূর্ত চলে না। সে হল তার অন্ধের যষ্ঠি। তার কাছেই কেবল ধৃতরাষ্ট্র নিজেকে উন্মোচন করে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বড় বন্ধু ও সহায়।

ধৃতরাষ্ট্রের অত্যধিক বিদুর-নির্ভরতা ভীষ্মকে ভাবিয়ে তুলল। নিষ্পাপ বিদুরকে নিয়ে মাঝে মাঝে সংশয় সন্দেহ জাগে মনে। এসবের কোন হেতু নেই, তবু মনের গভীরে তার এ ঢেউ কোথা হতে, কেন আসে তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল ভীষ্ম। একা একা বসে নিজের অভ্যন্তরে দ্বৈপায়ন ও বিদুরকে সে দেখতে লাগল।

দ্বৈপায়নের অপত্য স্নেহ বিদুরের উপর সর্বাধিক। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর চেয়ে বিদুরকে তার বেশী আপনজন মনে হয়। কেন? এই বাৎসল্য মমতা কি দ্বৈপায়নের কোন স্বার্থবোধ থেকে উদ্ভূত? না, এটা তার রক্তগত টান! বিদুরের সঙ্গে তার রক্তের বিশুদ্ধতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তাই হয়ত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু অপেক্ষা বিদুরের সঙ্গে বেশী ঐকান্তিকতা অনুভব করে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। একে অকারণ সন্দেহের চোখে দেখলে নির্দোষ বিদুরকেই অপরাধী করা হয়। সুতরাং এই ভুল তার করা উচিত নয় বলে ভীষ্ম ভাবল।

কিন্তু ভীষ্মের মন সন্দেহটা একেবারে নির্মূল হল না। বুকের অতলে একটা অশুভ সংকেত সে টের পেল। অতি স্পর্শকাতর মনটি তার কথা ভেবে কষ্ট পায়। বুকের মধ্যে নানারকম চিন্তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া গতিময় তীরের মত এদিক ওদিক

ছুটে গেল। সহসা তার একটা তীর আমূলে বিঁধে গেল অন্তরে। দ্বীপবাসীর ধীবর বংশের সত্যবতীর মাতৃ পরিচয় নিয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অনার্য। আর সে পুরোপুরি আর্যরক্তের সন্তান। তবু অদৃষ্টের খেয়ালে তারা পরস্পরে ভাই। তাদের গোষ্ঠী, বংশ, রক্ত আলাদা। পিতা মাতাও এক নয়। তবু এক অদ্ভুত স্বার্থের বেদীপার্শ্বে মঙ্গল-বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মনে হতে ভিতরে ভিতরে একটা মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। মনের ভেতর অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট একটা প্রতিদ্বন্দ্বীরভাব সঞ্চার হল। শত্রুর বিদ্বেষ, আক্রোশ প্রতিশোধ স্পৃহায় শিহরিত হল রক্তের সমুদ্রে।

একা একা বসে ভীষ্ম নিজের মনের অভ্যন্তরে দ্বৈপায়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপটাকে দেখতে লাগল। দৈব সহায় হয়ে ঋষি দ্বৈপায়নকে দিয়ে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যেন রচনা করল। ঋষির ক্ষুরধার কূট রাজনীতিজ্ঞান তার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে হার মানিয়ে দিল। পরিকল্পনার রাজনৈতিক রূপ কখনও দৃষ্টি গ্রাহ্য নয়। তবে দ্বৈপায়নের কর্মধারা এবং দৈবর আনুকূল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভীষ্ম সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার রূপরেখাকে যেন অনুমান করতে পারে। দ্বৈপায়ন একটা নতুন বংশধারা সৃষ্টি করে সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর্যদের হাত থেকে তাদের হাতে তুলে দেবার এক মতলব এঁটেছে। এ কাজ সম্পন্ন করতে তার দীর্ঘকাল লাগবে। তবু সময়ের হিসাবটা এক্ষেত্রে নগণ্য করে দেখেছে দ্বৈপায়ন। যে নতুন প্রজাতির জনক সে তার পূর্ণ বিকাশের দিকে তাকিয়েই যেন একটু একটু করে পরিকল্পনাকে লক্ষ্যের পথে নিয়ে চলেছে। এ কার্যে তার বড় সহায় দৈব। তাই দ্বৈপায়নের নির্ভুল কার্যের কোন আগাম আঁচ করার উপায় নেই। এক এক পর্যায়ের কাজ শেষ হলে তার ফলাফল বিচার করেও কোন বিষয়ে আগাগোড়া কিছুই চিন্তা করতে পারা যায় না। কখনো একটা দিক নিয়ে একটুকরো ভাবা, কখনো অন্য এক প্রসঙ্গ নিয়ে আর একটুকরো ভাবা। এর অতিরিক্ত কিছু হয় না। পরিচ্ছন্ন কোন ছবি মনে রেখাপাত করে না। মাথার ভিতর দিয়ে শরতের খণ্ড খণ্ড মেঘের মত শুধু অসংখ্য কল্পনা ভেসে যায়।

এলোমেলো হাজার চিন্তা ভীষ্মের মস্তিষ্কে জট পাকাল। দ্বৈপায়নের ঔরসজাত সন্তানদের কথা ভাবল কিছুক্ষণ। দ্বৈপায়নের ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর। ভাবতে শরীর কন্টকিত হল। কিন্তু দ্বৈপায়নের নিজেরও কোন সন্তান নেই। সে অম্বিকা অম্বালিকা কিংবা শূদ্রাণীর মধ্যে তার সন্তান উৎপাদন করেনি। বিচিত্রবীর্যের সন্তান তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। কার্যতঃ দ্বৈপায়নের ঔরসে যারা জন্মাল তারা কোন বৃহত্তের জটিল সৃষ্টিলীলার ফসল। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর এর পিতৃপরিচয়ে দ্বৈপায়নের কোন নাম নেই। দ্বৈপায়ন শুধু এদের স্রষ্টা! আর সে অভিভাবক, নিরাপত্তারক্ষী এবং যোগানদার। দুজনে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে একটা নতুন বংশধারাকে পরগাছার মত পালন করছে।

একা নির্জনে বসে ভীষ্ম বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজপুত্রদের মধ্যে কে সিংহাসনে বসবে এই কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হল, মানুষ কতকগুলো আকাঙ্খার সমষ্টি নয়. বিধাতা তাদের মধ্যে দিয়ে অন্য এক সম্ভাবনার বীজ অংকুরিত করে। দ্বৈপায়নের এই বংশধারা হয়ত বিধাতার সেই অদ্ভুত খেয়াল। এই অনুভূতিতে তার হৃদয় কিছুটা দ্রব হল। মনটাও কিছু প্রসন্ন হল।

চোখের উপর ভীষ্ম যমুনা দেখতে পাচ্ছিল। যমুনার ওপাড়টা কাশফুলে সাদা। শরতের আকাশ নীল। সাদা মেঘ আকাশের বুক ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছিল একের পর এক। মেঘের গতিতে লেগেছে এক খুশির চঞ্চলতা। ভীষ্ম উদাস দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। প্রকৃতির স্নিগ্ধতার ভিতরের উত্তাপ ধীরে ধীরে শীতল হয়ে এল। মনগড়া ক্ষত ও জ্বালা ভুলে গেল। কিন্তু কি একটা থম ধরা অস্বস্তিতে মাঝে মাঝে মাথাটা চেপে ধরেছিল দুহাতে।

দ্বৈপায়নের মনের আগুন নিভল না। যতদিন যাচ্ছিল ততই অম্বিকার অপমান প্রত্যাখ্যানের গভীর বেদনা তার বুকের ভেতর একটা অক্ষম রাগের আগুন জ্বালল। কি করলে এর শোধ নেয়া যায়, তার অহরহ চিন্তা তাকে একটা মারাত্মক কিছু করে ফেলতে উত্তেজিত করছিল। কিন্তু কিছুতে উপায় নির্ণয় করতে পারল না। পারবে কোথা থেকে? অম্বিকা যে নারী! কুলবধূ। অন্তঃপুরচারিনী। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত বাধার কোন রাস্তা নেই।

নারী ও পুরুষের মাঝখানে ঐ দেয়ালটা একটা সংস্কার মাত্র। তবু প্রতিশোধের নেশায় ঐ সংস্কারটুকু ভাঙতে পারল না। বিশ্বাসের সঙ্গে বুদ্ধির সঙ্গে অম্বিকার নারীর অস্তিত্বটাই জড়িয়ে আছে। অবহেলা করে তাকে ধুলোমাটির মধ্যে টেনে আনলে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে কিন্তু গৌরব বাড়বে না। তথাপি অম্বিকার ভাবনা তার বুকে পাষাণভার হয়ে রইল—

দ্বৈপায়ন ঋষি। ধ্যানে অভ্যস্ত। ধ্যানে একটা মানসিক স্থিরতা আসে। বুকের মধ্যে প্রশান্তির ভাব সৃষ্টি হয়। ধ্যানের ভেতর অনেক কিছু গভীর করে উপলব্ধি করা যায়। অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে যায়। মনে বল বাড়ে। প্রত্যয় জন্মায়। কিন্তু আজকাল ধ্যানে আর মনঃসংযোগ হয় না। নানা ঘটনার ওলোটপালোট স্রোতে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে তাকে নিয়ে গেল। ধ্যানের ভেতর স্থির প্রত্যয়ের যে ভূমি বরাবরই ছিল, আর তা ফিরে পেল না। জীবনের দুঃখগুলিকে সব সময় সহ্য হয় না বলে বিশ্বাসের প্রত্যয়ভূমি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়। বুকের ভেতর অম্বিকার কঠিন উপেক্ষা ও ঘৃণা টের পেল। এটা এক

ধরনের নীরব বিদ্রোহ। অম্বিকাকেই তার সবচেয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নিল। অম্বিকার পদাঘাতে তার ভেতর ধর্মহীন, অবিমৃষ্যকারী এক কালাপাহাড়কে সৃষ্টি করল ঃ দুনিয়াতে সৎবস্তু বলে যে কিছু রাখবে না। সব নীতিবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। এই বোধ তার আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত। এর বীজ লাঞ্ছিত নিপীড়িত ক্ষুব্ধ অনার্যের শরীরের রক্তের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে তার রক্তেও। অনার্যত্বের অভিমানকে আঘাত করেছে অম্বিকা। এই অপমানটাকে সে কিছুতে সইতে পারছিল না। আবার প্রতিকারের কোন পথও পাচ্ছিল না খুঁজে। একটা অক্ষম রাগ আক্রোশ আর এক গভীর বেদনায় তার অন্তঃকরণ পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছিল।

এরকম একটা পরিপূর্ণ বিদ্বেষ দ্বৈপায়নকে স্বাভাবিক থাকতে দিল না। দ্বৈপায়ন বেশ বুঝতে পারছিল সে একটু একটু করে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসছে। ঋষির মধ্যে ইদানীং একটা শয়তানের মুখচ্ছবি দেখতে পায়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন এক বিপুল ভাঙচুরের কাল্পনিক ছবি দেখতে পেল। অম্বিকাকে নিয়ে কল্পনা পাক খেতে লাগল। শুধু অম্বিকাই দ্বৈপায়নের ঘৃণা বিদ্বেষের পাত্র হল না, তার সত্তায় ধৃতরাষ্ট্রের উপর সে ক্রোধ ইদানীং প্রসারিত হল। ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকার আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত প্রাণ। তাই অম্বিকার উপরের আক্রোশ, বিদ্বেষ তার পুত্রের উপর গিয়ে পড়ল। অন্ধ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র দ্বৈপায়নের চোখে অম্বিকা হয়ে গেল। অম্বিকা ও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রভেদ চোখে পড়ল না। ধৃতরাষ্ট্রকে তার অপমান, প্রত্যাখ্যান এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মিলনের সাক্ষী বলে মনে মনে হল। দ্বৈপায়নের অন্তরে সব বিরূপতা ধৃতরাষ্ট্রকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠল। একটা অকারণ নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হল তার বুকের ভেতর।

দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দ্বৈপায়ন তার বিষফল ধৃতরাষ্ট্রকে অম্বিকার স্থলাভিষিক্ত করে তার উপর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নিল। মাতার অপরাধ ও দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত তার গর্ভজাত পুত্রকে করতেই হয়। এটাই জগতের নিয়ম। সবসময় বীজ ভাল হলেও ফসল ভাল হয় না। মাটির গুনে ফসল হয় উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট। অম্বিকার ক্ষেত্রে তার সন্তান ধৃতরাষ্ট্র কখনও ভাল হতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতিও তার জননীর মতই হয়েছে। সে দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক এবং ঈর্ষাপরায়ণ প্রভুত্বপ্রিয়। শুধু তাই নয়, আর্যত্বের অহংকার আছে তার মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে অম্বিকা যেন নতুনরূপে সৃষ্টি হয়েছে।

অদ্ভুত। অদ্ভুত। মনে মনে বারবার বলল দ্বৈপায়ন। বিশ্লেষণটা তার ভীষণ মনঃপুত হল। এক পরিপূর্ণ আনন্দে ও প্রত্যয়ে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল। এবার তাকে ঋষি থেকে এক কূট রাজনীতির ভূমিকায় অবতরণ করতে হবে। অলক্ষ্যে হস্তিনাপুরের প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজসভাতে এবং বাইরেও এক

গোপন কুটিল ষড়যন্ত্রের এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ কার্যে সহায়রূপে তার বিদুরকে পেতে হবে। বিদুর ধর্মপ্রাণ ; সৎ আদর্শবান। ধৃতরাষ্ট্রের বড় বন্ধু ও সহায়। সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তার মধুর সম্বন্ধ। সকলে তাকে প্রীতির চোখে দেখে, ভালবাসে। একমাত্র তার পক্ষেই প্রচ্ছন্নভাবে গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপ করা সহজ ও সম্ভব। এই লোকরঞ্জন ক্ষমতা তাকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখবে।

এরকম একটা ভাবনা চিন্তায় দ্বৈপায়নের যখন আশা ভরসা জাগল, মনের ভেতরেও একটু জোর পাচ্ছিল, মনে মনে নানারকম কূট রাজনীতির ছক আঁকছিল, তখন অকস্মাৎ একদিন তাকে হস্তিনাপুর নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিশেষ দূতের সঙ্গে সত্যবতী ও ভীষ্মের প্রতিনিধি হয়ে বিদুর এল। বিদুরের আকস্মিক আগমন তাকে বিস্মিত ও অভিভূত করল। ঈশ্বরকে সমস্ত ঘটনার নিয়ন্তা মনে হল। যখন যে কাজের দরকার তখন সে কাজের অনুকূল অবস্থা তিনি নিজে থেকেই যে তৈরি করে দিচ্ছেন। ঈশ্বর সত্যিই তাকে দিয়ে যে কি করতে চান কিছুই জানে না সে। অস্থিরতা কেবল তীব্র থেকে তীব্রতর হল। নিজের অজান্তে সে বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্যে একবার প্রণাম করল। অমনি ধমনীতে রক্তস্রোত কিছু উদ্দাম হল। বুকের ভেতর গুরগুর করে ডেকে উঠল। ফিস ফিস করে কে যেন বলল ঃ দ্বৈপায়ন, দেবতা তোমার ডাক শুনেছেন। তোমার ধ্যানে তিনি তুষ্ট হয়েছেন, তোমার অন্তরে যে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে তাকে প্রজ্বলিত কর। প্রলয় শিখায় গ্রাস কর. ধ্বংস কর।

হস্তিনাপুর তোমাকে ডাকছে। অম্বিকার নিয়তিই তোমাকে আকর্ষণ করছে সবেগে। তুমি যাও। হস্তিনাপুর এখন থেকে তোমার কর্মভূমি। এখন আর তুমি ঋষি নও, একজন কূট রাজনীতি। বিদুরকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড় মহাপৃথিবীর দিকে। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ তার সবচেয়ে বড় বাধা অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র।

বিদুরের আচমকা ডাকে চমকে উঠল দ্বৈপায়ন। এ ত কোন বিধাতার আকাশবাণী নয়। এ হয়তো তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের কথা। বিদুরের আগমনে তার বুকের ভেতর সেই কথাই ছড়িয়ে গেল। হঠাৎ তাই একটু দিশাহারা বোধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ধীর স্বরে বলল ঃ অকস্মাৎ তোমাকে দেখে বড় প্রীত হলাম পুত্র। ঈশ্বর অন্তর্যামী। কয়েকদিন ধরে তোমাকে বড় পেতে ইচ্ছে করছিল ! ঈশ্বর আমার ডাক শুনেছেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ হস্তিনাপুরের খবর কি ? জননী সত্যবতী কুশলে আছেন ত ? ভ্রাতা ভীষ্ম রাজকার্য নিয়ে খুবই ব্যস্ত কি ?

দ্বৈপায়নের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা বিদুরের মনের ভেতর রোমহর্ষ রহস্যময় আনন্দের

এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করল, যার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে তার অনেকক্ষণ সময় লাগল।

দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরে পৌঁছলে তার রাজকীয় অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি রাখল না ভীষ্ম। কিন্তু দ্বৈপায়নের এই উপস্থিতি ভীষ্ম চায়নি। সত্যবতীর আদেশ মানতে গিয়ে তাকেও মানিয়ে নিতে হল ব্যাপারটা। রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসনে বসবে কে? এই ধরনের একটা জটিল তর্ক উঠল কেন ভীষ্ম ভেবে পেল না? সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ণয় নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না, তবু এই নিয়ে একটা সংকট তৈরি করা হল রাজপুরীর অভ্যন্তরে। কে বা কারা এই সংকট সূচনা করল ভীষ্ম জানে না। কিন্তু তাদের সংখ্যা অবহেলা করার মত ছিল না। ভীষ্মের আদর্শের সঙ্গে সংঘাত বাধল। বিরোধের মধ্যে না গিয়ে সে নীরবে সরে দাঁড়াল। কিন্তু সমস্ত ঘটনার উপর তীক্ষ্ন নজর রাখল।

রাজসভায় ভীষ্ম দ্বৈপায়নের খুব কাছেই বসল। মনে মনে স্থির করেছিল কোন কথাই বলবে না সে। কিন্তু দ্বৈপায়নের দৃষ্টি তার মুখের উপর আঠার মত আটকে রইল। চোখ দুটো কৌতুকে হাসি হাসি দেখাচ্ছিল। দ্বৈপায়ন চোখ বুলিয়ে যেন বুঝে নিচ্ছিল ভীষ্মকে। আর ভীষ্ম তার দিকে ভাল করে তাকাতে সংকোচ বোধ করছিল। কিন্তু তার রহস্যময় দৃষ্টির চুম্বক আকর্ষণ থেকে কিছুতেই ভীষ্ম দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। তাকে বুঝবার জন্যই যেন দ্বৈপায়নের দৃষ্টি একটু অন্যরকম। ভীষ্মের অস্বস্তির শেষ হল। সেও দ্বৈপায়নের চোখের উপর চোখ রেখে মিট মিট করে হাসছিল। আসলে ভীষ্ম বোঝাতে চাইল, তাকে দ্বৈপায়নের অত দেখার কিছু নেই, বোঝারও নয়।

কিন্তু দ্বৈপায়নের ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাসটুকু লেগে থাকল। ঐ হাসিতে অভিব্যক্ত হল সে কত উদার, কত মহৎ, কর্তব্যবোধ, চরিত্র ও অভ্যাসের সঙ্গে কত সুন্দর মিশেছে তার ঋষির ব্যক্তিত্ব। ভীষ্মের মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কানের দু পাশ রি-রি করে জ্বালা করছিল। তবু একটা নিটোল স্তব্ধতার মধ্যে ভীষ্ম কষ্ট করে হাসল। তার হাসিতে বিষণ্ণতা। জোর করে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল: মহর্ষির সাক্ষাৎ আজকাল একেবারেই পাই না। এখানে আমন্ত্রণ না পেলে বোধ হয় এই পদধূলিও পড়ত না।

দ্বৈপায়নের অধর স্নিগ্ধ হাসির মাধুর্যে লাবণ্যময় হল। কিন্তু তার দৃষ্টি ভীষ্মের মুখের উপর থেকে নড়ল না। ভীষ্মের বিব্রত চোখ মুখের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করার জন্যে যেন চেয়েছিল দ্বৈপায়ন। সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লঘু স্বরে বলল: আমি বনবাসী। সংসার রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটুকু? রাজনীতি ভাল বুঝিও না। তবু তোমাদের ডাকে সাড়া না দিয়েও পারি না।

ভীষ্ম বিস্ময় ও অবিশ্বাসভরে নিজের দু'খানা হাতের দিকে তাকিয়ে রইল

অনেকক্ষণ। দ্বৈপায়ন মনের ভাবকে যাতে টের না পায় সেজন্যেই এই ছলনাটুকু করল। হাতের রেখা তন্ন তন্ন করে দেখা শেষ হলে স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। ত্রস্ত ও ব্যস্ত লজ্জার ভাব দেখিয়ে বলল: তা বটে! তা বটে। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অসাধারণ। কোন জটিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তোমার মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে বলে সকলের বিশ্বাস। সমাধানও নাকি চমৎকার।

দ্বৈপায়নের শান্ত ভাবলেশহীন মন আজ কিছু চঞ্চল। ভীষ্মের কথার কোন উত্তর করল না। দ্বৈপায়নের নীরবতায় ভীষ্ম একটু অস্বস্তিবোধ করল। তাই কিছুটা কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে বলল: আমিও রাজনীতিতে আর উৎসাহ পাই না। বর্তমান ভারতের রাজনীতি ঠিকপথে চলছে না। সকলেই বড় ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্য এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তার নিয়ে এমন এক জঘন্য লড়াইতে প্রবৃত্ত হয়েছে যে দেখে ঘৃণা হয়। সব দেশের রাজাই চাইছে অর্থ, ঐশ্বর্য, সুখ, বিলাসিতা, মান, প্রতিপত্তি! তাই দুর্বল রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ করে তারা গৌরব অর্জন করতে চায়। এই সব রাজ্য-লোভকোন্দল আমার মোটেই পছন্দ নয়। শক্তিজোটের রাজনীতিতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াব।

ভীষ্মের কথা শুনে দ্বৈপায়ন হাসল। কিছু বলল না। আরো কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

দ্বৈপায়নকে মৌন থাকতে দেখে ভীষ্ম বলল: মহর্ষি তোমার এরূপ নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের কারণ আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছ?

দ্বৈপায়ন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। নম্র হেসে মৃদু স্বরে বলল: ভাই দেবব্রত, তোমার এই হস্তিনাপুরে আমাকে একেবারেই মানায় না। তাই নীরবে সব শ্রবণ করছি। সভায় একজন ভাল দর্শক ত চাই। আমি তোমাদের সেই দর্শক। তোমরা বিব্রত হও এমন কথা না বলাই ভাল। হাজার হোক, আমি বাইরের লোক। এ পরিবারের কেউ নই।

ভীষ্মের মতিগতি ভাল করে বুঝবার জন্যে কণ্ঠস্বরে তার কিছুটা অভিমান ঝংকরে বাজল। ভীষ্মের ফাঁদে পড়া পাখির মত অবস্থা। দ্বৈপায়ন এইভাবে কথাটা কেন বলল, তা ভীষ্মের কাছে রহস্যময়। তার অনুভূতিশীল মনের মধ্যে একটা সন্দেহের বীজ অংকুরিত হ'ল। তথাপি ব্যাপারটা লঘু করে দিতে সে একটু সাজানো শব্দ করে হেসে ফেলল। বিব্রত ও হতচকিত চোখে মুখে একটু বিস্ময় বোধও ফুটে উঠল। ত্রস্ত গলায় ব্যাকুল হয়ে বলল: তবু তুমি আমাদের একজন। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমরা কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারি না। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রেরা তোমার সন্তান। তুমি তাদের পিতা, অভিভাবক। তাদের সম্পর্কে

কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে তোমার অনুমতি আবশ্যক। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। সর্বদিক বিবেচনা করে স্থির কর,—বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্রের মধ্যে কাকে সিংহাসনে অভিষেক করবে? প্রথানুযায়ী এবং ন্যায়তঃ ধর্মতঃ পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসন পাওয়ার কথা। কিন্তু জন্মান্ধ বলে কেউ কেউ তাকে সেই অধিকার হতে বঞ্চিত করতে চাইছে। তুমি এদের পিতা! নিরপেক্ষ, পক্ষপাত শূন্য বিচার একমাত্র তুমিই পার করতে। তোমার উপরে জননী এই সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করেছে। এখন তুমি যা বলবে, তাই হবে।

হঠাৎ একটা বিস্ময়বোধ দ্বৈপায়নকে আচ্ছন্ন করল। এই আচমকা কথায় : স্মৃতি তোলপাড় হ'ল। মনের ভিতরকার পুরনো ক্ষতটা যেন আচমকা এক আঘা: লেগে টাটিয়ে উঠল। কিছু রক্তক্ষরণও হ'ল। কবে থেকে একটা তীব্র আত্মগ্লানিে দগ্ধ হচ্ছে দিনরাত। প্রথম প্রথম কয়েকটা দিনত অম্বিকার পদাঘাতের অপমানে লজ্জায় সে প্রায় পাগলের মত বিড় বিড় করত। নিজের গলা টিপে ধরত। বুকে ভেতর জ্বলন্ত আবেগে অন্ধ হয়ে ডান হাতের কব্জির উপর একটা পোড়া কাষ্ঠ খণ্ড চেপে ধরে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল অপমানটাকে মনে রাখার জন্যে। কব্জির সেই ক্ষতে উপর তার দৃষ্টি জ্বল জ্বল করছিল। বুকটা ব্যথিয়ে উঠল। শ্বাস দ্রুত হ'ল।

অম্বিকার বুকের গভীরে গোপন গোলাপ রাঙা স্বপ্ন ও বাসনাকে দ্বৈপায়ন দেখল মাথার ভেতর বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল অন্তরাজো বুকের ভেতরটা শূন্য লাগল। দয়া মায়া, মমতা, করুণা, ক্ষমার পুকুর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মনে মনে বিড় বিড় করে বলল—না, কোন ক্ষমা নয়, অম্বিকার কোন ক্ষমা নেই। তার স্বপ্নের সমাধি ঘটিয়ে সে তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করবে। তিক্ত হতাশায় সে যখন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, ঈর্ষায় ক্রোধে নিজের মাথার চুল খামচে ধরবে তখনই আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে তার অভ্যন্তরের গ্লানি একটু একটু করে অবসান হবে।

দ্বৈপায়নের সম্মুখে বসেছিল তারই ঔরসজাত জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র। যেমন দীর্ঘ গড়ন তেমনি সুঠাম, মজবুত চেহারা। দেবদূতের মত মুখশ্রী। শান্ত ভাবলেশহীন মুখে তার কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। স্তব্ধ চোখের দৃষ্টি শূন্য। দেখলেই মায়া হয়। দ্বৈপায়ন মনকে শক্ত করল। মনে হল এই পুত্র অম্বিকার ভিতর দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র। মানুষ একটা সূত্র ধরে জন্মায়। সে এই শিশুর জন্মের কারণ। তার ভিতর দিয়ে অম্বিকা ধৃতরাষ্ট্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ধৃতরাষ্ট্রের মুখশ্রী অম্বিকার আদলে গড়া। এই নিষ্পাপ পুত্রটির মধ্যে অম্বিকা পুরুষ হয়ে জন্মেছে। অম্বিকা এর স্রষ্টা। সে এর রক্ষণাকারী। ধৃতরাষ্ট্র তার কেউ নয়। তার সঙ্গে সম্বন্ধটা একটা সংস্কার মাত্র।

দ্বৈপায়ন খুব শান্তভাবে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে স্বপ্নাতুর চোখে চেয়ে রইল। কিন্তু ভীষ্মের কথাটা সে ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিল। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর

প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে ধীর স্বরে বললঃ রাজনীতিতে নৃপতি নির্বাচনের পথ সব সময় এক-রকম হয় না। নৃপতির অভিষেকের সময় অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে। রাজনীতির রহস্যময় খেলায় রাজার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা একটা মস্ত সম্বল। সুতরাং, নৃপতি নির্বাচনের সময় মানুষের চিত্ত প্লাবিত করার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও পরিমাপ করে দেখতে হয়। মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র সক্ষম ও বীর হওয়া সত্ত্বেও কনিষ্ঠ পুত্রকেই সিংহাসনের অভিষেক করেন। নৃপতির উপর একটি দেশ ও জাতির ভাগ্য নির্ভর করছে। তার উন্নতি অবনতিও। সুতরাং শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র বলে সিংহাসনের অধিকার পাবে, এরকম কোন শাস্ত্রীয় বিধি শাস্ত্রকারেরা রচনা করেনি। দৈনন্দিন রাজ্য পরিচালনার কাজে নৃপতি যদি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে তার ফল একটা মারাত্মক কিছু হবেই।

দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরের সিংহাসনের জন্যে কারো নাম প্রস্তাব করল না। শুধু নৃপতি নির্বাচনেব সাধারণ নিয়ম বলল। এ ধরনের প্রস্তাবে ভীষ্ম কিছুই স্থির করতে পারল না। দ্বৈপায়নের সুচতুর কূট ভাষণে ভীষ্মের উজ্জ্বল মুখ কান্তি কিছুটা মলিন হল। মুখ অসম্ভব গম্ভীব দেখাল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভীষ্ম ক্লান্ত গলায় বলল ঃ ভাই, দ্বৈপায়ন, তোমার অভিমত অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু মামুলী নীতি-নির্ভর। মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কথা বললে আমার জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পাব না ভাই।

দ্বৈপায়ন মাথা নাড়াল। বলল ঃ আমি নির্বিরোধী মানুষ। রাজনীতি অনভিজ্ঞ। রাজনীতির ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না। এ সবের ভেতর তাই নিজেকে জড়ানো সমীচীন মনে করি না। আমার প্রস্তাব শুনলে রাজ্য ও রাজনীতির স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে হস্তিনাপুরের ক্ষতি হবে বেশি। সব দিক বিবেচনা করে কাকে নৃপতি করলে ভাল হয় একথা কি বলার অপেক্ষা রাখে।

ভীষ্ম চুপচাপ দ্বৈপায়নের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল। খুব বিস্বাদ অনুভব করল মনটায়।

দ্বৈপায়ন স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তার ইংগিত ভীষ্ম অনুধাবন করল। আশা-ভঙ্গের যন্ত্রণায় মনটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু খুব সাময়িক। ভীষ্ম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলল ঃ সেইটাই ভাবনার কথা। অথচ নৃপতির সব যোগ্যতা ধৃতরাষ্ট্রের আছে। সে ধীর, স্থির, শান্ত, মিতবাক, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। কূট রাজনীতিজ্ঞানও প্রখর। তবু ঈশ্বর বাম তার প্রতি। জন্মান্ধতা তার একমাত্র অযোগ্যতা। ঈশ্বরই ব্যর্থ করে দিয়েছে তার জীবনকে। বলতে বলতে চুপ করল ভীষ্ম। তার কণ্ঠস্বর স্খলিত, ভেজা। ধৃতরাষ্ট্রের জন্যে কেমন একটা দরদ, মমতা অনুভব করল ভীষ্ম। তার দুর্ভাগ্যের জন্য বঞ্চনার জন্য বুকচাপা কান্না জাগল ভীষ্মের বুকে।

দ্বৈপায়ন নির্বাক উৎকর্ণ বোবা দৃষ্টি মেলে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্য

একরকম অনুভূতি জাগল। না, কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা নয়, প্রতিহিংসা চরিতার্থতার সুখ কিংবা আনন্দ নয়। যেন একটা বিরাট পাষাণ ভার হৃদয়ের সঙ্গে ঝুলে আছে। নিজের মনে নিঃশব্দে বলল, কিছু মানুষ ভুগতে আসে। কিছু মানুষ আসে ভোগ করতে। কেউ আসে দিতে। কেউ আসে নিতে। জীবন এক শত্রু। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবে।

আশ্রমে ফিরে দ্বৈপায়ন দর্পণের সামনে দাঁড়াল। পিতা পরাশর আশ্রমে শিক্ষা দেবার সময় বলেছিল, যখন আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন হবে, দর্পণের সামনে দাঁড়াও। অপলক নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে থাক। তা-হলেই নিজেকে দেখতে পাবে। তোমাকে তুমি ফিরে পাবে দর্পণের বিশুদ্ধ প্রতিফলনের ভেতর। যত পাপ কায়ার। ছায়ার কোন অপবিত্রতা নেই।

দর্পণে দ্বৈপায়নের চেহারা ফুটে উঠল। মস্তকে বিশাল জটা, মুখ দাঁড়ি গোঁফে ভর্তি। পরনে গেরুয়া বাস। কপালে পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাচ্ছে শ্বেত চন্দনের টিপ। বক্ষে রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডুল। দ্বৈপায়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল অনেকক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দ্বৈপায়ন তাতেই চমকে উঠল। বিড় বিড় করে নিজেকে প্রশ্ন করল ঃ এ কে ? এত মহর্ষি ব্যাসদেব, দ্বৈপায়ন নয়। দ্বৈপায়ন কে ? পিতা পরাশর, মাতা সত্যবতী।

দ্বৈপায়ন দর্পণের সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। মনে হ'ল, গণ্ডীর বাইরে আছে মহাদম্ভী প্রতিহিংসাপরায়ন প্রচণ্ড রাম বিদ্বেষী মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ। সন্ন্যাসীর সাজটা তার ছদ্মবেশ, ঘৃণার মুখোশ। ঋষির এই ধরাচূড়া তারও ছদ্মবেশ। এই বেশ খসে পড়লে নবজাতকের মত সে ও নগ্ন, উলঙ্গ।

মুখ ঘোরাতে দর্পণে তার চোখ পড়ল। তার মুখের সঙ্গে কার মুখের বেশি মিল, খুঁজল। কিন্তু দাঁড়ি গোঁফের ছদ্মবেশ থেকে তাকে চিনে বার করা কঠিন হ'ল। দর্পনের প্রতিবম্বের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করার নাছোড় নেশা তাকে পেয়ে বসল। চোয়ালের নির্লোম উঁচু হাড়ে, নাকের ডগায়, চোখের চাহনিতে, ভুরুতে, কপালে সত্যবতীর যৌবনের মুখের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখল। পিতার আকৃতির কোন ছাপ পড়েনি তার শরীরে। এইভাবেই একটা বংশধারা অন্য এক বংশধারার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তাই তার রক্তের ভেতর এক শৃংখলিত শয়তান গর্জন করছে, মানব সভ্যতার এক ভয়ংকর অতীত তাকে অনুসরণ করছে। তার আর পেছবার পথ নেই। উত্তরাধিকারীই তাকে গণ্ডির বাইরে টানছে।

পাঁচ

পাণ্ডুর অভিষেকের বেশ কিছুকাল পরের ঘটনা।

দিন দিন ধৃতরাষ্ট্র স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়ল। তার নিঃস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে তাকালে ভীষ্মের বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠে। এমন পাথর মূর্ত্তি তার আগে কখনো দেখিনি। দেহে যেন প্রাণের স্পন্দন নেই। সমস্ত মুখে একফোঁটা রক্ত নেই বুঝি।

একটা একটা করে দিন গেল। মাস ঘুরল।

দিন যে এমন দুঃসহ মর্মান্তিকভাবে কারো কাটতে পারে ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখলে ভীষ্ম কখনও অনুমান করতে পারত না। দিন দিন এক নিষ্ক্রিয় বিষাদের গহ্বরে ডুবে যাচ্ছিল। জীবনটা তার কাছে একরকম লক্ষ্য হীন ও অর্থ শূন্য হয়ে গেল।

প্রতিদিন রথে কতপথ ঘোরে ঠিক নেই। অনির্দিষ্টের মতই ঘোরাঘুরি করে। কোথা থেকে কোথা চলে যায় সারথী পর্যন্ত জানতে পারে না। যখন যেদিকে মন চায়, সেদিকেই রথের মুখ ঘোরাতে হয় সারথীকে। ধৃতরাষ্ট্রের মনের এই অশান্ত ও অস্থির প্রতিক্রিয়া কিসের? অন্ধ হয়ে জন্মেছে এ বঞ্চনা তো তার কপালের লেখন। নিজেকে নিজে রক্ষা করার সাধ্য তার নেই। বহির্বিশ্বের নানাবিধ আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য ভীষ্ম বিশেষ সাবধানী হয়ে থাকে। এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির প্রতি ভীষ্মের দরদ, মমতা সহানুভূতি একটু বেশি। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূট বুদ্ধি, দৈহিক বল থাকা সত্বেও অদৃষ্টের শিকার সে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলেই ভীষ্মের সতর্ক-সাবধানী দৃষ্টি, সহানুভূতি, মমতা ছায়াবৃত্ত বৃক্ষের মত তাকে ঘিরে রেখেছে। তবু ধৃতরাষ্ট্রের মনের সব পরিচয় তার জানা নেই। হৃদয়ের আচরণ চিরকাল বিচিত্র।

জন্মান্ধ হওয়ার জন্যে জীবনের অনেক বাহুল্য ধৃতরাষ্ট্রকে বর্জন করতে হয়েছিল। তার ফলে মনটা লক্ষ্যে একমুখীন হয়েছিল। সিংহাসন একমাত্র লক্ষ্যস্থল। মনের কামনা বাসনা স্বপ্নমধুর হয়ে ঐ লক্ষ্যাভিমুখের দিকে প্রবল বেগে ছুটেছিল। সহসা সেই লক্ষ্য বস্তুটি তার সামনে সরিয়ে নেওয়া হলে জীবনের উদ্দেশ্যটা অর্থহীন হয়ে গেল। কিন্তু মনের দৌড়টা থেকে গেল। এই উন্মাদনা তার অবচেতন মনে এক দুরন্ত-ব্যর্থ সাম্রাজ্য ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছিল। আসলে তার মনেতে যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ছিল তা যখন বাস্তবায়িত হল না তখন তার কাল্পনিক সাধ পূরণ করতেই যেন এই অবিরাম ছোটাছুটি করছিল সে।

ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কে ভীষ্মের মনে অনেক অনুভূতি জাগল যা আগে কখনও মনের কোণে আসেনি। তার সন্ধানী চোখ নিজের অগোচরে অনেক কিছু দেখে আজকাল, যা আগে কখনো দেখেনি। আর এইসব দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে বহুকাল মর্মবিদারী অমঙ্গল চিন্তা তার মনে উঁকি দিতে লাগল। আর তার সব দায় সে নিজের কাঁধে চাপাল। নিজের ভ্রমে সে খাল কেটে বেনো জল ঢুকিয়েছে। এখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বচক্ষে তাকে দেখতে হবে। ভীষ্ম চেষ্টা করল হৃদয় দুমড়ে দেয়া চিন্তাগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু পারল কি ?

বেশ কয়েকটা মাস কাটল।

ভীষ্মকে আর দৈনন্দিন রাজকার্য দেখতে হয় না। পান্ডুই সব করতে লাগল। তাকে সাহায্য করার জন্য প্রধান মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সেনাপতি আছে। সকলেই যোগ্য লোক। তার অনুপস্থিতিতে রাজনীতি ও শাসনকার্যের কিছুই অচল হয়ে যায়নি। এই প্রথম উপলব্ধি করল শাসনযন্ত্রের মধ্যে নিজেকে সে বেশি বড় করে তুলেছিল যে নিজেই নিজের বিশাল ছায়ার মধ্যে ঢাকা পড়েছিল যেন। আজ সে মুক্ত। দর্শকের আসনে বসে সে এখন অনেক কিছুই দেখে এবং ভাবে।

ভীষ্মের মনে হ'ল, ধৃতরাষ্ট্র যেন অহরহ নিঃশব্দে অভিযোগ জানাচ্ছে তার কাছে। ভীষ্ম নিজেও চিন্তা করে জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়েও ধৃতরাষ্ট্র কেন সিংহাসন পেল না ? তাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার জন্যে কে দায়ী ? কে ? ভীষ্ম নিজের কাছে প্রশ্নগুলো করল। হ্যাঁ, সব অপরাধ তার। যে ভুল সে করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত এখন তাকে করতে হবে। একটা নয়, অনেক ভুল করেছে সে। এই ভুলগুলি কার্যতঃ তার একান্তই ব্যক্তিগত। রাজনীতিতে শাসকের ব্যক্তিগত মত, পথ, আদর্শ, প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই। রাজনৈতিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ কখনো এক নয়। ভিন্ন। কতখানি ভিন্ন-সেই পরিমাপ জ্ঞানটুকুর অভাবে এই জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ! ভীষ্মের বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। তথাপি, এরকম একটা আত্মবিশ্লেষণের মধ্যেও যেন ভারী একটা শান্তি ছিল তার।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শান্তিটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠল। নিঃশ্বাস নিয়ে ফেলতে সময় লাগল। ধৃতরাষ্ট্র তার দুশ্চিন্তা হয়ে উঠল। তার নির্বাক স্তব্ধতা বেশিক্ষণ সইতে পারে না ভীষ্ম। মনে মনে ভাবল ধৃতরাষ্ট্রের এই আত্মাভিমান হয়ত কোন রমণীর সান্নিধ্যে কিছুটা প্রশমিত হতে পারে। অন্ধ, খঞ্জ হলেও পুরুষমানুষ মাত্রেই নারীর প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক এবং প্রকৃতি অনুমোদিত। প্রবৃত্তির ক্ষুধা একটি ক্ষেত্রে নিবৃত্ত না হলে অন্যদিকে তা ফুটে বার হয়। বাইরের ঘটনাগুলো ঘটনাই নয় তখন। আসলে যা ঘটে মনের গভীরে। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের বয়স অনেক দিন আগেই হয়েছে। শুধু অন্ধ বলেই ধৃতরাষ্ট্রের জন্য পাত্রী মিলছিল না। অথচ ভেতরে প্রবৃত্তি তার নখদন্ড মেলে বসেছিল। কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষাই কোনভাবে

চরিতার্থ হচ্ছিল না। ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বোধ হয় প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে মাত্র। তার এই উদভ্রান্ত উন্মাদনার মূলে আছে প্রবল সিংহাসন লোভ, দুরন্ত প্রেমতৃষ্ণা, ইন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষা যা এখনও চরিতার্থ হয়নি। গ্রাসটি সম্মুখে রেখে ক্ষুধার্ত বাঘের মত সে বসে আছে। জন্মান্ধ বলে, সংকোচবশতঃ ইচ্ছের কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারল না। কিন্তু ক্ষুধা ছাড়বে কেন ? সে অন্য পন্হা নিল।

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা মুছে ফেলতে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দেয়া মনস্থ করল। কিন্তু অন্ধ ছেলের বিয়ে কি করে দেবে কিছুই জানে না। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে তাকে। বিচিত্রবীর্যের বেলায় স্বয়ম্বর সভা থেকে কন্যা তুলে এনে ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক মর্যাদা ও গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলার কৌশলরূপে ভীষ্ম কন্যা অপহরণ করেছিল। কাশীরাজের কন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় ভারতবর্ষের গণ্যমান্য রাজন্যবর্গের সমাবেশ হয়েছিল। ভীষ্ম তাই উপেক্ষিত হস্তিনা-পুরের সাহস, বিক্রম, প্রতাপ, নির্ভরতা, দাপট, স্পর্ধা এবং অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তেজ এবং উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্তরে তার নিজের সম্পর্কে যুগপৎ ভয়, বিস্ময় এবং চমক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রাজ কন্যাদের হরণ করে রাজবধূর গৌরব মুকুট পরিয়ে দিল তাদের অবনত শিরে। ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু করার চিন্তা মনে উদয় হলেও তার বিবেক বুদ্ধি এবং মনুষ্যত্ব এই কার্যে তাকে নিরুৎসাহ করে রাখল। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি নিরীহ মেয়ের ভাগ্যকে জোর করে জড়াতে তার অন্তর সায় দিল না। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবে না। অভিশাপের ভাগী হবে সে। শত্রু তার নামে কলঙ্ক লেপন করবে।

ভীষ্ম সাধারণ মানুষের মতই কয়েকজন নামজাদা জ্যোতিষীর কাছে গেল। তাদের পরামর্শমত গোপনে অনেক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করল। এসব করার সময় এক দুনিরীক্ষ নিয়ামকের কথা মনে হল। এই নিয়ামকের ইচ্ছেটাই সব। মানুষ নিমিত্ত। নিয়ামক মানুষকে দিয়ে তার কাজ করে নেয়। ঠিক সময়ে ঠিক ফল ফলবেই।

ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ-যোগ উপস্থিত। খুব অল্পকাল মধ্যেই এক আশ্চর্য শর্তে পাহাড়ী জাতির কোন কন্যার সঙ্গে বিবাহ হতে পারে এমন আভাস দিল জ্যোতিষী। জ্যোতিষীর কথাগুলো ভীষ্মকে ছেয়ে ফেলল। ভাবতে ভাল লাগল তার। কিন্তু ভাবনার কি শেষ আছে আর ? ভীষ্ম কিছুই বুঝতে পারল না—জ্যোতিষীর ভবিষ্য-দ্বাণী কতদূর সত্য আর কতটাই বা ভ্রান্তি। ভাবতে ভাবতে সে উদাস অন্যমনস্কতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় সোনার মুকুট পরণে রক্তবরণ রেশম বস্ত্র চুমকির কাজ করা আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন মনোমোহিনী এক অপরূপা কন্যা। দুচোখে তার বিস্ময়। ধৃতরাষ্ট্রের নিষ্প্রাণ অপলক দুটি চোখ কনের চোখের উপর। ধৃতরাষ্ট্র তার কন্ঠদেশ থেকে মালাগাছটি খুলে ধীরে ধীরে কনেকে পরিয়ে দিল তারপর সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে দিল।

ভীষ্ম বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

কয়েকদিনের ভেতর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। গান্ধার দেশ থেকে গান্ধার যুবরাজ শকুনি হস্তিনাপুরের বন্ধুত্ব ও রাজনৈতিক সাহায্যের প্রার্থী হয়ে এল। শকুনি গান্ধারের রাজনৈতিক সংকট বিশ্লেষণ করে বলল: যাদবরাজ্যগুলির কাছ থেকে নিয়মিত মদত পেয়ে অমরাবতীর ইন্দ্র প্রতিবেশী দুর্গম পার্বত্যরাজ্যগুলির অধিপতি পবন, বরুণ, ও যম এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ গান্ধার রাজ্য আক্রমণের এক চক্রান্ত করছে। ইন্দ্রের ভয় ভীষ্মকে। একমাত্র ভীষ্ম তার ইন্দ্রত্ব হরণ করতে পারে। এই আশংকায় ইন্দ্রের ঘুম নেই। তার ধারণা পিতৃসিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়ে ভীষ্ম বেশি জঙ্গী হয়ে উঠেছে। ভারতীয় রাজন্যবর্গও ইদানীং ভয় পায় তাকে। সম্রাট জরাসন্ধও সমীহ করে তাকে। এই অবস্থায় ইন্দ্র একটু চিন্তিত ও বিমর্ষ। রাজনীতি থেকে ভীষ্মের অবসর গ্রহণ ইন্দ্রের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তার বিশ্বাস ভীষ্ম পৃথক রাজ্য পত্তনের জন্য অমরাবতী দখল করবে। কারণ ভারতীয় রাজ্যগুলি হয় গিরিব্রজের সম্রাট জরাসন্ধ অথবা যাদবরাজ্য সমবায়ের নেতা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি জোটের অন্তর্গত। সুতরাং কোন একটি জোট আক্রান্ত হলে মহাসমর বেঁধে যাবে। ইন্দ্রের জোট বহির্ভূত অমরাবতী আক্রান্ত হলে অনুরূপ কোন বৃহত্তর সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। ইন্দ্র তাই অমরাবতীর একমাত্র প্রবেশ পথ গান্ধার আক্রমণ করে ভীষ্মের সাম্রাজ্য লিপ্সা থমকে দিতে চায়। বহু প্রত্যাশা নিয়ে গান্ধার হস্তিনাপুরের বন্ধুত্ব পেতে এসেছে।

শকুনির কূট রাজনীতি ভীষ্মকে চমৎকৃত করল। হাসিমুখে ভীষ্ম তার দিকে চেয়ে রইল। আর মনে মনে তার কথাগুলিকে যাচাই করে দেখতে লাগল। শকুনি যাই বলুক ভীষ্ম তার কথা বিশ্বাস করল না। আসলে জোটের বাইরে ক্ষুদ্র রাজ্য গান্ধারের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব রক্ষা করার এক দারুণ সমস্যা হয়ে উঠেছে। আসলে বৃহৎ দুই শক্তি জোটই অমরাবতীকে কব্জা করার জন্য গান্ধারকে গ্রাস করতে উদ্যত। নিরুপায় অসহায় গান্ধার তাই জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হস্তিনাপুরের কাণ্ডারী ভীষ্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে রক্ষা করতে উৎসুক। ধূর্ত শকুনি তাদের রাজ্য সংকট ও উদ্বেগকে ইন্দ্রের জবানীতে বলেছে শুধু। নিজের স্বার্থকে নিরাপদ করার জন্যে তার ও ইন্দ্রের মধ্যে চাপা সংঘাতকে উস্কে দিয়েছে। কি করলে তাদের পরস্পরের রেষারেষি ঘৃণা, বিদ্বেষের অন্তঃস্রোতে আরো জটিল হয় তার এক অসাধারণ কূটবুদ্ধির খেল দেখাল শকুনি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি নিয়েছে শকুনি। ভীষ্ম মনে মনে শকুনিকে প্রশংসা করল। শকুনিকে তার মনেও ধরে গেল। জটিল রাজনীতির এক নির্ভুল হিসাব করে নিয়ে ভীষ্ম হাসি মুখে শকুনির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল: হস্তিনাপুর গান্ধার দেশের শুধু বন্ধুত্ব চায় না, তার সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্কও চায়।

শুনে শকুনির দুই চোখ বিস্ফারিত হ'ল হঠাৎ। এরকম অনুরোধ অপ্রত্যাশিত। চোখের সামনে তার ভগিনী গান্ধারীর অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত মুখখানি ভাসতে লাগল। শকুনি কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে একটু বিব্রত বোধ করল। আভিজাত্যের সংযমে বাধা অভ্যস্ত সংযমের ভেতর থেকে সৌজন্য দেখাতে একটু হাসল। আমতা আমতা করে বলল ঃ এ আর তেমন কথা কি? তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করল ঃ পাত্রটি কোন রাজকুমার?

ভীষ্মের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'ল। চাপা স্বরে বলল ঃ বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠপুত্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে এই পরিণয় বন্ধন সুসম্পন্ন হলে হস্তিনাপুর এবং ভীষ্ম গান্ধারের অকৃত্রিম সহায় ও বন্ধু হতে পারে।

শকুনি একটু থমকালো। বুকের ভেতর হঠাৎ দুম্ করে একটা শব্দ হ'ল। কানের দু'পাশ দপদপ করতে লাগল। মাথার মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রনা ছড়াল। কি করবে সে? তার কি করার আছে? বুকের ভেতরটা ত্রাসে শুকিয়ে গেল।

শকুনিকে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে দেখে ভীষ্ম হাসল। মৃদুস্বরে বলল ঃ বন্ধু শকুনি! ধৃতরাষ্ট্র সুশ্রী, রূপবান স্বাস্থ্যবান পুরুষ। অসাধারণ তার ভুজবল। তার আলিঙ্গনে লৌহস্তম্ভ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসন বঞ্চিত হওয়া একটা দুর্ঘটনা মাত্র। কিছু মানুষের ষড়যন্ত্রে, অনিচ্ছায় সে সিংহাসন পেল না। কিন্তু জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী হল ঃ পৃথিবীর অধীশ্বর হবে সে। ভারতবর্ষের বৃহৎ শক্তিজোটের পুরোভাগে একদিন তার নেতৃত্বে থাকবে। সে দিনও খুব দূরে নয়। এসবই জ্যোতিষীর বাণী। মিত্র ভেবেই সবিনয়ে কথাগুলো বললাম। ভগিনী তোমার জলে পড়বে না। একদিন হস্তিনাপুরের সে লোকমাতা রাজমাতা হবে। হস্তিনাপুরের রাজমহিষী হওয়া যে কোন রাজকুমারীর পক্ষে গর্বের।

শকুনি নিস্পন্দ মূর্তির মত বসে রইল, হুঁস ছিলনা যেন। ভীষ্মের অনুচ্চ গলা খাঁকারির শব্দে শকুনি মুখ তুলল। তার গম্ভীর থমথমে চোখের দিকে অপলক চেয়ে রইল ভীষ্ম। বলল ঃ আত্মীয়তার এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হলে হস্তিনাপুরের সঙ্গে গান্ধারের কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পাবে না। ভীষ্ম তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছাড়বেনা।

শকুনির অস্বস্তি আরো বাড়ল। অস্বস্তির সঙ্গে চাপা উদ্বেগও। এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে ভীষ্ম তাকে এক অদ্ভুত রাজনীতির প্যাঁচে ফেলল। এখন গান্ধার রাজ্যের গৌরব, মর্যাদা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে প্রিয় ভগিনী গান্ধারীকে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠলগ্ন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ তার সামনে ছিল না।

অনেকক্ষণ পর স্তব্ধতার গহবর থেকে যেন উঠে এল শকুনি। দিশেহারা ভাবনা আর আতঙ্ক তার চোখে মুখে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। এক অদ্ভুত ফন্দী আঁটল

মনে মনে। বলল আত্মীয়তার যে হাত হস্তিনাপুর গান্ধারের দিকে প্রসারিত করে দিয়েছে তাকে গান্ধারের পক্ষ থেকে আমিও স্বাগত জানাচ্ছি। গান্ধার হস্তিনাপুরের মৈত্রী ও আত্মীয়তা দীর্ঘজীবী করতে এবং প্রিয়তম ভগিনীর একজন অন্তরঙ্গ সহচর ও সহায় হয়ে এই রাজ অন্তঃপুরে আমিও থাকতে চাই। ভগিনীকে ছেড়ে থাকা আমার কাছে খুব কষ্টের। সত্যাশ্রয়ী ভীষ্মকে শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

ভীষ্ম হাসল। সায় দিয়ে বলল ঃ খুব ভালো কথা। প্রস্তাব মঞ্জুর হ'ল। কিন্তু আমার ও একটা শর্ত আছে। হস্তিনাপুরের বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে গান্ধার রাজকুমারীকে অবশ্যই এই প্রাসাদে আনতে হবে। এখানেই তাদের বিবাহ হবে।

ধৃতরাষ্ট্রের বিয়েটা খুব গোপন রাখা হ'ল এবং অল্প সময়ে দ্রুত সম্পন্ন হ'ল। এত তাড়াতাড়ি করা হ'ল যে প্রতিবেশী রাজারাও ঠিক সময়ে এসে পেঁছিতে পারল না। বিয়েও হ'ল অদ্ভুত ভাবে। ধৃতরাষ্ট্র বর হয়ে গান্ধার গেল না, বরং গান্ধার থেকে রাজকন্যা গান্ধারী ঘোড়ার পিঠে করে ধৃতরাষ্ট্রকে পতিরূপে বরণ করতে এল হস্তিনাপুরের প্রাসাদে। গান্ধারীর দুই চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধের মতই গ্রহণ করার জন্য গান্ধারী বস্ত্রখন্ড দিয়ে তার দুচোখ আবৃত করল।

বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল খুব সংক্ষিপ্ত এবং আড়ম্বরহীন। প্রজ্জ্বালিত হোমকুণ্ড চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে বর ও কনে পরস্পরে মাল্য বিনিময় করল। তারপর, গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সুপুষ্ট নধর করপুটের ঘ্রাণ নিল। অনুরূপভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পানি পদ্ম আঘ্রান করল। অনেকক্ষণ ধরে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে যারা দেরীতে পেঁছিল তারা এমন একটা অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখতে পেল না বলে আপশোষ করল।

দ্বৈপায়ন আশ্রমে বসে সব শুনল। বিদুর তাকে বিবাহের খুঁটিনাটি খবর দিল। ঘটনাগুলো একসঙ্গে করে দ্বৈপায়ন তার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হল। বিবাহের মত এরকম একটা আনন্দ অনুষ্ঠানকে সকলের কাছে উম্মুক্ত করতে ভীষ্মের সংকোচ হ'ল কেন?

দ্বৈপায়ন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বুকের মধ্যে তার সন্দেহের দোলা। ভীষ্ম নিশ্চয়ই বিবাহে কোন প্রতিবন্ধক আশংকা করেছিল। কিন্তু এই সন্দেহ কার উপর? সমস্ত চেতনার ভেতর কথাটা যেন ঝংকারে বাজল। চুপ করে সে সমস্ত ঘটনাকে একটুক্ষণ ভেবে নিল।

সত্যবতীর কাছেও ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ের কথা গোপন রেখেছিল। তার অনুমতি ও চাইনি। অনুষ্ঠানের ঠিক আগের মুহূর্তে বলল। কেন? পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা। কনিষ্ঠ হলেও তার সম্মতি আবশ্যক তার অনুমতি ছাড়া রাজকোষের কোন অর্থব্যয় হতে পারে না। তবু ভীষ্ম এসব কিছুই করল না। কেন? ভীষ্ম কি এদের

সন্দেহের চোখে দেখে? অথবা এর পেছনে অন্য কোন গোপন রহস্য ও থাকতে পারে।

কুটীরের বারান্দায় মৃগচর্মের উপর চুপ করে বসেছিল দ্বৈপায়ন। হাঁটুর উপর কনুইর ভর দিয়ে হাতের তালুর উপর থুতনী রেখে খুবই চিন্তিতভাবে বেশ কিছুক্ষণ শূন্য চোখে সামনের দিকে চেয়ে ছিল। নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ তার মনে হল ধৃতরাষ্ট্রের বিয়েটা ভীষ্ম নানাদিক দিয়ে তাৎপর্য পূর্ণ করে তুলেছে।

এই বিয়ের ব্যাপারে ভীষ্ম পাণ্ডুকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখাল। হস্তিনাপুরের ঘরে বাইরের রাজনীতিতে ও রাজ্যে ভীষ্মের কর্তৃত্ব অবাধ ও অপ্রতিহত এইরকম একটা ধারণা শত্রু পক্ষের মনে সৃষ্টি হ'ল। এই ঘটনা থেকে বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি সহজেই টের পাবে যে, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পাণ্ডুকে ভীষ্ম মেনে নেয়নি। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডুর অভিষেকে ভীষ্মের নীতির পরাজয় হ'ল। তাই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষ নিয়েছে এই কথাটা স্পষ্ট করে জানানোর জন্যে সব নিয়ম নীতি ভেঙে সে বিদ্রোহ করেছে।

গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে দিয়ে ভীষ্ম গৃহবিবাদের এক রাজনীতি সূচনা করল। দ্বৈপায়নের মনে হ'ল একে রাজনীতি না বলে, ভীষ্মের বিদ্রোহ কিংবা চক্রান্ত বলাই ভাল।

ভীষ্মের মতলবটা, আন্দাজ করার চেষ্টা করল দ্বৈপায়ন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল। হঠাৎ বন্যার স্রোতে ঘর ভেসে গেলে যেমন অসহায় লাগে, মানুষ যেরকম হতভম্ব হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই একটা বিস্ময়বোধ দ্বৈপায়নকে আচ্ছন্ন করে রাখল। ভেতরে ভেতরে একটা গভীর অবসাদ বোধ করছিল। বুকের ভেতর কি একটা হারানোর আশংকায় টনটনকর ছিল। অশান্তচিত্তে খোলা আঙিনায় একা একা এলোমেলো ভাবে ঘোরাঘুরি করল বেশ কিছুক্ষণ। আশ্রমের পাশে ঝর্ণার জল ভাঙায় অবিরাম শব্দ কানে আসছিল। সহসা মনে হ'ল, না ঝর্ণার নয় শব্দত এ হয়ত তার অন্তরের অজস্র অব্যক্ত কথা ঝর্ণার জল ভাঙার শব্দে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। দ্বৈপায়ন মনের অভ্যন্তরের কথাগুলো শোনার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর, ধীর পায়ে বারান্দায় গিয়ে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুকটা বেশ হাল্কা বোধ হ'ল। কিন্তু মুখে গভীর বিষাদ এবং চিন্তা থমকে ছিল।

নিজের মনের অবিরাম জিজ্ঞাসার মধ্যে ডুবে গিয়ে দ্বৈপায়ন ভাবতে লাগল, প্রাসাদে এবং রাজনীতিতে ধৃতরাষ্ট্রের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলার জন্য, যা যা করা দরকার ভীষ্ম তার সব ঠিক ঠিক ব্যবস্থাগুলো ইতিমধ্যে করেছে।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিবাহে ভীষ্ম এমন একটা চমৎকারিত্বও বিস্ময় সৃষ্টি করল যে চট করে লোকের মন থেকে তা মুছে যাবে না। এই বিবাহের স্মৃতি অনেককাল

মানুষের মনে থাকবে। লোকে কেমন করে ভুলবে—সুদূর গান্ধার থেকে ভিনদেশী রাজকন্যা অন্ধরাজপুত্র ধৃতরাষ্ট্রে অনুরাগিণী হয়ে স্বেচ্ছায় তাকে বরমাল্য দিতে হস্তিনাপুর এল? ধৃতরাষ্ট্র শুধু অন্ধ। নৃপতি নয়—তবু গান্ধারী নিজের দৃষ্টি বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদন করে তাকে পতিত্বে বরণ করল। পতিপরায়ণা আদর্শ নারীর এই দৃশ্য কোনদিন কেউ ভুলতে পারে? ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ভেতর নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় দিক আছে, যেটা প্রতিদিনের দেখা শোনায় চোখে পড়ে না। গান্ধারী পক্ষে তাই হয়ত তার ভেতরের বীর্যবান পুরুষটিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। যার ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ তাকে হস্তিনাপুরে টেনে আনল। তাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা করল না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টি হীনতার কষ্ট দুঃখ ও বেদনা তার সঙ্গে ভাগ করে নেবার জন্য গান্ধারী নিজের চোখ দুটি বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আবৃত করল। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তার এই গভীর অনুরাগ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রেম কোনদিন লোকে ভুলবে না। লোকের মুখে মুখে এই কাহিনী এক অদ্ভুত গল্প হয়ে বহুদূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। আর ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কে লোকের এতকালের যে ধ্যান ধারণা তার সব হিসাব গণ্ডগোল করে দেবে। সাধারণ লোকেও ভাবতে শুরু করবে ধৃতরাষ্ট্র আর অসহায় নয়। গান্ধারীর মত মহীয়সী রমণী তার ভার্যা। গান্ধারীর খোলা দুই চোখের দৃষ্টি (ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখেই গান্ধারী কেবল চক্ষু আবরণী ব্যবহার করত) দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে আগলে রাখবে। *শকুনির মত একজন কূটনীতিক শালক পাওয়াও ধৃতরাষ্ট্রের সৌভাগ্য।*

দ্বৈপায়নের মনে সহসা প্রশ্ন উদয় হ'ল, ভীষ্ম কাকে প্রতিপক্ষের চোখে দেখছে? তার লক্ষ্য কে? ভীষ্মের সব সন্দেহ এখন তার উপর। তার সমর্থন ও আনুকূল্যে পাণ্ডু সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্ব পেয়েছে। এজন্য পাণ্ডু ভীষণ কৃতজ্ঞ। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বঞ্চনার জন্য সে দায়ী। তার প্রতিহিংসাই অন্যতম কারণ একথা আর কেউ না জানলেও সে জানে।

হস্তিনাপুরের গৃহ-রাজনীতিতে তার বিজয় ও সাফল্যকে ভীষ্ম সুনজরে দেখিনি। এই রন্ধ্রপথ ধরে অনার্যভাবধারা কুরুবংশকে যাতে গ্রাস না করে সেজন্যে খাঁটি আর্যবংশের রাজকন্যাকে ধৃতরাষ্ট্রের বধূ করল। শকুনিকে করল তার পাহারাদার। অর্থাৎ তার প্রচেষ্টাকে নির্মূল করতে স্নায়ুযুদ্ধের এই কূট পরিকল্পনা ভীষ্মের। পাণ্ডুকে সামনে রেখে ভীষ্ম তার দিকেই তীর তাক করেছে। ভীষ্ম নেপথ্যে থেকে তার কাজ করার জন্যে ধুরন্ধর শকুনিকে রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়েছে। মুখে না বললেও ভীষ্মর মূল লড়াইটা কার্যতঃ তার সঙ্গে। পাণ্ডু উপলক্ষ্য। লক্ষ্য সে।

দ্বৈপায়নের মনটা আবার ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটা অস্বস্তি, উত্তেজনায় তার বুক কেঁপে গেল। প্রবল ঘৃণা আর রাগ তাকে অশান্ত করে তুলল। সে

কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। উচিত অনুচিত বোধ লুপ্ত হয়ে গেল।

যাদব রাজা কুন্তীভোজের আমন্ত্রণে দ্বৈপায়ন ভোজরাজ্যে যাত্রা করল। যাদব সমবায় রাজ্যগুলির সঙ্গে দ্বৈপায়নের একটা মধুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাই, বিবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করতে এবং পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে তাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে যাদবরাজ্যে যেতে হয়। খোলামন নিয়ে যেখানে যাতায়াত করেছে এতকাল। এবার যাওয়ার সময় রথে দ্বৈপায়ন খুব গভীর এবং অন্যমনস্ক ছিল। গভীর এক দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিল, শূণ্য দৃষ্টি। চোখের পর্দায় কোন মুখ কিংবা ছবি ভেসে উঠল না। কেমন একটা ভাব হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে ছিল।

দ্বৈপায়নের পাশে বসে কুন্তীভোজ নিজে রথ চালাচ্ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে অনেকবার দেখল মহর্ষিকে। দ্বৈপায়নের ভুরু কিছু কুঞ্চিত, মুখে যথাযথ উদ্বেগ। কুন্তী-ভোজ নিজেও উসখুস করছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু সেদিকে কোন নজর ছিল না দ্বৈপায়নের।

রথটা সহসা বাঁক নিল। পাহাড়ের উচু রাস্তায় ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল। দ্বৈপায়নের নিজের মনে মাথা নাড়া দেখে কুন্তীভোজ প্রশ্ন করল : চুপ করে কেন মহর্ষি? বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছ কি?

দ্বৈপায়ন সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর একটু বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় হেসে বললঃ এ একরকম অদ্ভুত অনুভূতি। কোন ব্যথা নেই, বেদনা নেই, জ্বালাও নয়। নেশার মত কেমন একটা ঝিমধরা ভাব অবশ করে রেখেছে। ও-সব তুমি বুঝবে না।

কুন্তীভোজ বোধ হয় পুরনো ক্ষতে ব্যথাতুর স্পর্শ পেল। হতাশ গলায় বলল : মনটা আমারও মুষড়ে আছে আজ। এর উপর যদি তোমারটাও চাপে তাহলে মুশকিল। আমার কথা বলি কি করে?

দ্বৈপায়ন কোন কৌতূহল কিংবা আগ্রহ দেখাল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতি দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর একটা হাই তুলতে তুলতে বললঃ তোমার আবার কি হ'ল?

একটু ইতস্তত করে কুন্তীভোজ বললঃ পৃথার বিয়ে অনেক আগেই দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটা ভয় আর ভাবনায় দিতে পারছি না। এগোতে সাহস পাই না। তুমি আমাকে উপায় বলে দাও।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর উদাস এবং বিষন্ন গলায় বলল : মায়া মোহ মানুষের জীবনে কত বড় যে বোঝা আর কাঁটা তা সন্ন্যাসী হয়ে তুমি বুঝবে না। এই মোহ নেশা কিছুতে কাটে না মানুষের। নিজের না হলে পরেরটা আঁকড়ে ধরে। বেড়াল, কুকুর, ময়না পুষলে, সেও একদিন মায়াবশে আপন হয়ে যায়। আর মানুষ'ত মায়ার বাঁধন। ঈশ্বর আমাকে সন্তান দেয়নি। তবু সে মায়া মোহের নাগপাশে বাধা আছি। একদিন শূরসেনের দশ মাসের মেয়েটাকে দেখে আমার ও রাণীর বুকটার মধ্যে কেমন উথলে উঠার ভাব হ'ল। কোথা থেকে কি যেন একটা ঢেউর মত দাবড়ে বেড়াল। এ কোন পার্থিব অনুভূতি বলে মনে হ'ল না। এক স্বর্গীয় সুখে বুকের ভেতরটা টৈটুম্বুর হয়ে গেল। শূরসেনের পৃথাকে দত্তক নিলাম। পৃথার ভেতর দিয়ে বুঝলাম সন্তান স্নেহ কাকে বলে। চন্দ্রকণার মত পৃথা বড় হ'ল কবে টেরই পেলাম না। তার অপাপবিদ্ধ বালিকা মুখশ্রী আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। তার শরীরের দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখিনি। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙল তখন কিছু করার ছিল না আমার। শুরু হ'ল দুঃখের দিন। অনুশোচনায় ভরে থাকল আমাদের বাকী জীবন।

দ্বৈপায়ন মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। কুন্তীভোজ চুপ করলে সম্মোহিতের মত- প্রশ্ন করল : কেন?

কুন্তীভোজের মুখখানাতে সহসা কে যেন আবীর মাখিয়ে দিল। দ্বিধায়, লজ্জায় সে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। মুখেতে একটা বিব্রত অস্বস্তির ভাব ফুটল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : বেয়াদবি আর বিশ্বাসঘাতকতা করল তোমাদের ক্ষেপা দুর্বাসা। এসব কথা বলতে ভাল লাগে না। তবু সব কথাটা তোমার জানা উচিত। একমাত্র তুমিই পার আমার চিন্তা উৎকণ্ঠা দূর করতে। দুর্বাসা একসময় আমার প্রাসাদে অতিথি হলেন। এখানে তাঁর অনেকগুলো মাস কাটল। সে সময় কোপন স্বভাব ঋষির সকল পরিচর্যার ভার ছিল মুকুলিকা বালিকা বয়সী পৃথার উপর। দুর্বাসা পৃথার সেবায় পরিতৃষ্ট হয়ে তাকে গোপন বিদ্যা শেখানোর কথা বলল। ঋষির সংস্রবে পৃথার কোন অকল্যাণ চিন্তাই করিনি। মনে কোন পাপ সন্দেহ জাগেনি। তার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু ঋষির ভেতর যে রক্ত মাংসের একটা উপোসী পুরুষ আছে তার কথা মনে হয়নি। আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। পৃথার সংস্পর্শ দুর্বাসার ভিতরে বহুকালের নিদ্রিত পুরুষটিকে জাগিয়ে তুলল। দুর্বাসা কিশোরী পৃথাকে বোঝাল : কাম শরীরের ধর্ম। এই আনন্দ ভোগে সকল জীবের অধিকার। এই সুখ আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে নেই। ঋষিরাও না। ঋষিকে পরিতৃপ্ত করা সেবিকার ধর্ম। সেবিকার সেবা অসম্পূর্ণ থাকলে নরকবাসী হতে হয়। নারী তার শরীর উৎসর্গ করবে সেবার ভেতর। কিন্তু পৃথা দেহ মনের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই ঋষি কিশোরীর রক্তে আগুন ধরানোর জন্যে বলল,

দেহসংসর্গে বাধা নেই। বয়স কোন বাধা নয়। দুটি নরনারীর যে কেউ প্রতীক্ষার ভেতর দিয়ে পরস্পরকে প্রার্থনা করে যদি বিফল মনোরথ হয় তাহলে দেবতার রোষে তার জীবন বিষময় হয়। ঋষির কথায় অবাধ্য হতে নেই। নরনারী যখন কাঙ্গালের মত আঁকড়ে ধরে তখন তাদের মিলনে দেবলোকের স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ নেমে আসে। বালিকা পৃথা ঋষির মতলব বুঝতে পারেনি। গুপ্তবিদ্যা শিক্ষার নামে ঋষি তাকে প্রতারিত করল। তারপর নর ও নারীর মিলনের পরিণতিতে যা হয়, তাই হ'ল।

কুন্তীভোজ কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল: হতভাগিনী ঐ বয়সে সন্তানের জননী হল। সদ্যজাত শিশুপুত্রকে কন্যার কলঙ্ক গোপন করতে যমুনায় ভাসিয়ে দিলাম। বড় লজ্জা হ'ল, ঘেন্না হ'ল নিজের উপর।

কুন্তিভোজ চোখ বুজল। চোখ বুজতেই দেখতে পেল কুন্তীর মুখ। বিষণ্ণ সেই মুখ শীর্ণ, সাদা চোখের কোলে একটা হালকা কালো ছোপ পড়েছে। তবু তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার জন্য একটা প্রবল দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে।

দ্বৈপায়ন বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল কুন্তীভোজের দিকে। মনের মধ্যে অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কথা কাজ করে যাচ্ছিল। কুন্তীভোজ কখনও তার আশ্রমে আসিনি। কিন্তু আজ এল কেন? এর মানে কি? অদৃশ্য দেবতা কি তাকে কোন শুভ কিছু ইঙ্গিত করছে? কুন্তীভোজ অদৃষ্টের প্রতিনিধি হয়ে কি, কিছু বলতে এল তাকে? কিন্তু পৃথার জন্যে তার কিছু করার নেই।

খুব জোরে রথের অশ্ব দৌড়তে লাগল। শরীরটা ভীষণ নাড়া খেল। মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরির বন্ধ দরজাটা সহসা যেন ধাক্কা খেয়ে একটু ফাঁক হ'ল। হ্যাঁ দরজাটা তারপরে একেবারে খুলে গেল। এত রহস্যময়ভাবে খুলল যে দ্বৈপায়নও অবাক হ'ল।

পান্ডুর এখনও বিবাহ হয়নি। পৃথার সঙ্গে তার পরিণয় বন্ধনে কোন বাধাও নেই। পৃথার ধমনীতে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত প্রবাহিত। এ বিবাহ হলে ভীষ্মের রক্তের শুদ্ধতা সম্পর্কে যে শুচিবায়ুগ্রস্ততা আছে তা রক্ষা পাবে। সেও পৃথার গোপন কলঙ্ককে মূলধন করে অনেক কিছুই পৃথাকে দিয়ে করে নিতে পারবে। পৃথা বশে থাকলে পান্ডুও অনুগত ও বাধ্য থাকবে। ভীষ্মের সঙ্গে মর্যাদাবোধের ঠান্ডা লড়াইতে যে হারটা ধৃতরাষ্ট্রের বিয়েতে হয়েছিল তার কিছু জয় সে পান্ডু-পৃথার বিয়ে দিয়ে আদায় করে নিতে পারে।

একটা খুশির তরঙ্গ তার সারা শরীর জুড়ে দামামার মত বাজতে লাগল।

দ্বৈপায়ন নির্বাক। রথের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে সে চুপ করে বসে রইল।

কুন্তীভোজ উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা উদ্বেগ নিয়ে দ্বৈপায়নের পরামর্শ শোনার প্রতীক্ষা করছিল। অপলক চোখ দুটি তার সামনের পথের উপর স্থির। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা ভাল করে ভেজাল কুন্তী ভোজ। তারপর হতাশ গলায় বলল ঃ মহর্ষি পৃথার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভয় পাই।

প্রশ্ন করতে গিয়ে দ্বৈপায়নেরর স্বরভঙ্গ ঘটল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল ঃ কেন?

কুন্তীভোজ ক্লান্ত স্বরে বলল ঃ মহর্ষি সত্য কখনও চাপা থাকে না। কোনদিন যদি পৃথার কলঙ্ক ফাঁস হয় সেদিন স্বামী সংসার, সন্তানদের কাছে কোন মুখ নিয়ে সে দাঁড়াবে? নিজের গৌরব মর্যাদা হারিয়ে কত ছোট হয়ে যাবে, সে কথা ভাবলে আমি আর শান্ত থাকতে পারি না। তার জন্ম পত্রিকাতেও আছে হারানো পুত্রের সঙ্গে তার পুনর্মিলন হবে। তারা পরস্পরকে চিনবে। মহর্ষি তুমি ত্রিকালজ্ঞ, তুমি আমার পৃথার জন্যে একটা উপায় করে দাও।

ওঃ কুন্তীভোজ! বলে দ্বৈপায়ন তার নিরুদ্ধ আবেগকে চাপা দেবার জন্যে হঠাৎ কুন্তীভোজের হাতখানা চেপে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে বলল ঃ রাজন। তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। বিধাতার এক মহান কাজ করতে তোমার পৃথার জন্ম। ঐ কানীন পুত্র তারই হেতু। পৃথার উপযুক্ত স্বামী ঈশ্বর নির্বাচিত করে রেখেছে। তুমি তার স্বয়ম্বরের আয়োজন কর। হস্তিনাপুরের রাজাধিরাজ পান্ডুকে নিয়ে আমি সভায় উপস্থিত থাকব। পৃথা শুধু পান্ডুকে বরমাল্য দেবে।

কুন্তীভোজের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। তার শরীর থর থর করে কাঁপছিল। বাম হাতখানা দিয়ে দ্বৈপায়নকে ধরেছিল। বুকের ভেতর তার আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। অপ্রতিরোধ্য দুরন্ত আবেগে কথা বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে স্বরভঙ্গ ঘটল। অস্বাভাবিক স্বরে উচ্চারণ করল ঃ মহর্ষি, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? দ্যাখত আমি বেঁচে আছি কি-না?

পান্ডু কোন বীর্যশুল্কা নন্দনীর পাণিগ্রহণ করেনি এসংবাদ হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছলে ভীষ্ম রাগে ফুঁসতে লাগল। গা দিয়ে তার একটা তাপ বেরোতে লাগল। চোখ দুটো জ্বালা করছিল। কানের দুপাস ঝিঁঝিঁ করছিল। অনেক কথাই তার মনে হতে লাগল। কিন্তু কোন স্বার্থে দ্বৈপায়ন এই বিয়ের ইন্ধন যোগাল? এর রহস্যই-বা কোথায়? এই ভাবনাটা প্রধান হলে উঠলেও কিনারা করতে পারল না। তবে এটা পরিস্কার যে, পান্ডুর সরলতা ও বাধ্যতাকে দ্বৈপায়ন স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে কুরুবংশের গৌরব ও মর্যাদাকে অন্যের চোখে হেয় করে তুলল। দ্বৈপায়নের এই একটি অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তের জন্যে হস্তিনাপুরকে হারাতে হল অনেক। ভবিষ্যতে এর খেসারতও হয়ত দিতে হবে তাকে।

একটা নিরুপায় রাগে ভীষ্মের ব্রহ্মতালু জ্বালা করতে লাগল। দ্বৈপায়নের মত সর্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি এটা কেন বুঝল না যে, প্রত্যেক রাজবংশের একটা নিজস্ব

গরিমা এবং ঐতিহ্য আছে। সেটাই বংশের স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্য গেলে আর কি রইল বংশের? পৃথার স্বয়ম্বর সভায় যোগদান করে দ্বৈপায়ন সেই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করল। হস্তিনাপুরের রাজাকে এরকম সাধারণ স্বয়ম্বর সভায় মানায় না। দ্বৈপায়নের ভাবা উচিত ছিল, পান্ডু নিজের বীর্য-বলে কন্যা অধিকার করছে না, ববং কন্যাই উল্টে তাকে নির্বাচন করছে। এই বিয়েতে পান্ডুর ভিতরের পৌরুষটাকেই ভীষণভাবে অপমান করা হল। এই অপমান পান্ডুর বীর্যের প্রতি শুধু নয়, কুরুবংশের প্রতি। বলতে কি এই অপমানে ভীষ্মের ভেতরটা টাটাতে লাগল।

ভীষ্মের প্রতিক্রিয়া কুন্তীভোজের অজানা ছিল না। তাই কুরুবংশের আভিজাত্য ও গৌরব মর্যাদার কথা বিবেচনা করে প্রচুর ধনরত্ন, অলংকার, দেশ-বিদেশের নামী-দামী বহু বিচিত্র আশ্চর্য আশ্চর্য উপহার সামগ্রী, দুগ্ধবতী গাভী, নামী-দামী হস্তী রথ প্রভৃতির সমভিব্যাহারে পৃথা ও পান্ডুকে হস্তিনাপুরে পাঠাল।

গান্ধারী অপেক্ষাও পৃথা অসাধারণ সুন্দরী। সত্যিই চিত্রপটে আঁকা ছবির মতই অপরূপা। মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নিমেষে নিষ্ঠুর মানুষেরও হৃদয় হরণ করে। চোখ দুটিতে কি গভীর সম্মোহন আর ভাল লাগার নেশা জড়ানো। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না, আঠার মত দৃষ্টি আটকে থাকে। পুত্রবধু পৃথা সম্পর্কে এটুকু ছিল ভীষ্মের প্রাথমিক মুগ্ধতা। তার অসামান্য ভাল মুখশ্রী, স্বাস্থ্য, যৌবন দেখে ভীষ্ম শেষ অবধি আর কিছু বাধা দিল না। নিজেও বিচার করে দেখল, পান্ডুর মত শীর্ণ, শান্ত সরল, নির্বোধ নিবীর্য, অপদার্থ পুরুষমানুষকে কোন তরুণী যে স্বেচ্ছায় স্বামীরূপে নির্বাচন করতে পারে ভীষ্ম স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। পান্ডুর এই চূড়ান্ত সফলতা ভীষ্মকে খুশি করল। নব বর-বধূ বরণের রাজকীয় সমারোহ ও আড়ম্বরের তাই কোন ত্রুটি রাখল না ভীষ্ম।

কিন্তু মনের ভেতর ভীষ্মের শান্তি ছিল না। তার ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিবেচক রাজনীতিক তাকে সাবধান করে দিল। পৃথার এই রূপ-যৌবনই হবে সব অনিষ্টের মূল। কুল ভাঙবে, মর্যাদা নষ্ট করবে, কোথাও ঠাঁই হবে না তার। বিভ্রান্তিবশতঃ সে এক নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু পৃথা, কেন নিষিদ্ধ ফল হতে যাবে? কেন? নিষিদ্ধই যদি হবে, তবে অমন করে মানুষের হৃদয় হরণ করার শক্তি পেল কোথায়? ভীষ্মের ভয়, আতঙ্ক শুধু সেইজন্যে? এরকম চৌকস মেয়েকে কি পান্ডুর সঙ্গে মানায়?

ভীষ্মের বুকের ভেতর ধকধকানিটা শুরু হল এই চিন্তায়। সে বুঝতে পারছিল দ্বৈপায়নের সঙ্গে তার যে ঠান্ডা লড়াইটা সর্বদা চোখের আড়ালে হচ্ছিল, পৃথাকে দিয়ে দ্বৈপায়ন তার কোন বৃহৎ ভূমিকা তৈরী করতে চায় পরিবারের অভ্যন্তরে। বিদুরের হাবভাব ইদানীং অনেক পাল্টেছে। পৃথার সঙ্গেই তার সম্পর্ক খুব গভীর। দেবর ভাজের প্রীতি-মধুর সম্পর্কে তাদের মাখামাখি ও রহস্যালাপ চলতে পারে,—তবু সেই

সব সংবাদে কেমন বিচলিত হল ভীষ্ম। আবহাওয়াটা দিন দিন তার কাছে ভারী হয়ে উঠল। সে বেশ একটু বিব্রত বোধ করল।

যত দিন যেতে লাগল ভীষ্মের মানসিক শক্তিতে টান ধরল। তার মনের মধ্যে এখন শুধু একটিমাত্র মুখ। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি সেই মুখ একবারের জন্য তার চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয় না। সে মুখ দ্বৈপায়নের। দ্বৈপায়নের সঙ্গে তার নিজের কোন রক্তসম্পর্ক নেই। তাদের পিতা-মাতাও এক নয়। তবু অদৃষ্টের এক অদ্ভুত খেয়ালে তাদের সম্বন্ধ ভাই ভাই। পিতা শান্তনুর সঙ্গে বিমাতা সত্যবতীর বিবাহসূত্রেই দ্বৈপায়ন এই বংশে প্রবেশাধিকার পেল। অদৃষ্ট এই পরিবারের তাকে এক আপনজন করে তুলল। তার আবেগ-প্রবণতার ভুলেই তা ঘটল। তার সেই ভুলের আর কোন চারা নেই। এখন সারাজীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে মুখ বুজে।

দ্বৈপায়ন লোকচক্ষুর অগোচরে তার যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে তার খোঁজ ক'জন রাখে? তার কোন্ কাজটা না প্রতিদ্বন্দ্বীর? পাণ্ডুকে সিংহাসনে বসান এবং হস্তিনাপুরকে কোনরকম অবহিত না করে, রাজনৈতিক লাভালাভ চিন্তা না করে পৃথার স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুকে হাজির করা—তার কাছে খুবই রহস্যময় বলে মনে হল। পাণ্ডুর বিয়েতে দুঃসাহস দেখিয়ে সে অন্ততঃ জানান দিতে পেরেছে; এই রাজ্যের রাজনীতিতে এবং পরিবারে ভীষ্মের মতই তার মর্যাদা এবং অধিকার আছে। ভীষ্মকে সে তোয়াক্কা করে না। প্রতিপক্ষের মত দ্বৈপায়ন তার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের বিয়েতে সে অবশ্য দ্বৈপায়নের পরামর্শ নেয়নি, বিয়েতে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেনি, তাই পাল্টা শোধ নিতে দ্বৈপায়ন তাকে না জানিয়ে পাণ্ডুর বিয়ে দিল। এর চেয়ে প্রতিপক্ষের বড় নজির আর কি হতে পারে!

বেশ কিছুদিন কাটল।

ভীষ্ম নিজেকে তেমন বদলাতে পারল না। পৃথার একাধিপত্য পাণ্ডুর উপর থাকলে রাজনীতিতে তার প্রভাব কমে যাওয়ার আশংকা করল। এখন শ্বশুর ও পুত্রবধূর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক আছে তা যে চিরকাল একরকম যাবে, এরকম আশা করা অন্যায়। রাজনীতি কিংবা জীবন স্থাণু জিনিস নয়। বারংবার চাপে পড়ে নানা নতুন চিন্তা-ভাবনার ফলে পরিবর্তন হয়। ধ্যান-ধারণা, ও বিশ্বাস পাল্টে যায়। সুতরাং সেরকম কিছু ঘটার সম্ভাবন থাকলে, 'আগে ভাগ কর তারপর নিশ্চিন্ত আরামে থাক' নীতি প্রয়োগ করে পাণ্ডুকে পৃথার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার কথা ভাবল ভীষ্ম। পাণ্ডুর জীবনে আরো একটি নারীর আকর্ষণ অনিবার্য করে তুললে পৃথার প্রতি তার আকর্ষণ হ্রাস পাবে, এবং প্রভাবও কমে যাবে। সপত্নীগত বিদ্বেষ-বিষের জ্বালায় শুধু পৃথাই অহরহ জ্বলবে না, পাণ্ডুরও জ্বালার কারণ হবে। পৃথার দিক থেকে যত আঘাত আসবে ততই পাণ্ডু তার কাছে থেকে

: থাকবে। স্ত্রীর প্রতি তার আনুগত্যের ঘোর কাটবে। পাণ্ডু ও পৃথার
ম্নর অন্তরাল কি করলে তৈরী হয় তার উপায় উদ্ভাবন করতে ভীষ্মের অনেক-
ন রাত অনিদ্রায় কাটল।

ভাবনার শেষ নেই। ভাবতেও ভাল লাগে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল
দ্বৈপায়ন সম্পর্কে তার অনুমান কতটা সত্য, কতটুকু অনুমান, আর কতখানি
ত। তবু, রাজনীতিতে বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে অবিশ্বাস করে ঠকা
ন। কিন্তু দ্বৈপায়ন ও তার বিরোধের মধ্যবর্তী হয়ে নিরীহ পাণ্ডুকে যে
দনা ও কষ্ট ভোগ করতে হবে—এই চিন্তাটা তার বুকে কাঁটার মত ফুটছিল,
: তা অবশ্যম্ভাবী করে তুলল দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংঘর্ষ ও সংঘাত।

ভীষ্মের মস্তিষ্ক জুড়ে পৃথার কথা, সান্নিধ্য ও সেবা বিভিন্ন দৃশ্যপট তৈরী
। পৃথার মুখের অবয়ব, তার ঠোঁট, নাক, চোখ, ভুরু, চুল সবই তার চোখের
ায় ভাসতে লাগল। ভীষ্মের মুখে বিবর্ণ গম্ভীর অভিব্যক্তি ফুটল।
শ্বাস পড়ল। কুন্তীর সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। সে শত্রুপক্ষের মেয়ে
। তার প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকার কথাও নয়। অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ
র মতই সে। গান্ধারীকেও সে বশীভূত করে ফেলেছে। তার ভাষা এক
চর্য বস্তু, যা দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে পরকে আপন করে নেয়। পার্থক্যকে
ণতর করে তোলে।

ভীষ্মের অবাক লাগল, তবু মিষ্টভাষী, মধুর স্বভাবের পৃথার সুখ-শান্তি
সহ্য করতে পারছে না কেন? দ্বৈপায়নের উপর প্রতিশোধ নিতে তার জীবনকে
ময় তোলার কোন অধিকার তো তার নেই। সুখ-শান্তি এক দুর্লভ বস্তু।
দের ভাগ্যে তা জোটে না, আবার অধিক দিন সয়ও না। পৃথা সেই
য সম্পদকে পেয়ে হারাবে? মমতায় ভরে উঠল ভীষ্মের অন্তর। কিন্তু
' ও পৃথার মধ্যবর্তী হয়ে রয়েছে দ্বৈপায়ন। কাঁটার মত তার অস্তিত্বটা
ক্ষণ বিঁধে আছে ভীষ্মের ভাবনায়। পৃথা দ্বৈপায়নের অস্ত্র। রাজ্যক্ষমতাকে
: খুশি ব্যবহার করার এক যন্ত্র। হস্তিনাপুরের রাজনীতি থেকে দ্বৈপায়নকে
ত হবে। দ্বৈপায়নের প্রভাব কমাতে হলে পৃথাকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে
ক্ত করা একান্ত দরকার। কেমন একটা হতাশ বিষণ্ণতায় সে মনে
স্থির করল, বন্ধুবর মদ্ররাজের অধিপতি শল্যের একটি অসাধারণ সুন্দরী
নী আছে। নাম তার মাদ্রী। তার সঙ্গে পাণ্ডুর পরিণয় হলে পৃথার
থেকে মাদ্রীর দিকে তাকে টানা সহজ হবে। তখন তাকে পুরো নিয়ন্ত্রণের
রাখা কোন অসম্ভব হবে না। মদ্ররাজ্য এবং যাদব সমবায় রাজ্য-র মধ্যে শত্রুর
র্ক। শত্রুতার বিদ্বেষ, ঘৃণা ভুলে মাদ্রী কখনও পৃথার অনুগত ও বাধ্য হবে
বরং একটা সূক্ষ্ম স্নায়ু সংঘর্ষে উভয়ের সম্পর্ক আরো তেতো হয়ে উঠবে।

তাদের ভেতরকার রেষারেষি ও বিদ্বেষ যত বাড়বে ততই কুন্তী মাদ্রী দু'জনকে বি
চোখে দেখবে। আর তখন পাণ্ডু নববধূর মোহে, তার শরীরী আঘ্রাণের লো
তাকেই বেশি করে সন্তুষ্ট করতে চাইবে। মাদ্রীর রূপের আকর্ষণ যত তাকে টান
তত কুন্তীর কাছ থেকে সে সরে যাবে। কুন্তীও দুরন্ত অভিমানে তার সংস্রব ত্য
করবে।

ভীষ্মের দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের কোণে বক্রতা জাগল। চোখের তারা অঙ্গারের ম
জ্বলতে লাগল। পৃথাকে তার অচেনা লাগল।

বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দ্বৈপায়ন। পথে নানারকম খবর শুনল
সংবাদের ভেতর একটা দুর্যোগের পূর্বাভাস ছিল। তাই মনটা ভাল যাচ্ছি
না। মনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। আভ্যন্তরীণ উত্তেজনায় মুখথ
গন-গন করেছিল। কিন্তু তার কোন বাহ্যপ্রকাশ ছিল না। সব সময় কেমন
হয়ে বসে থাকল।

লোকেরাই বলাবলি করে, ভীষ্ম পাণ্ডুর আবার বিয়ে দিয়েছে। মদ্রর
কন্যা মাদ্রীর সঙ্গে পান্ডুর বিবাহ খুব ধুমধামে হয়েছে। বহুজায়গা থে
বহু মানুষ, গুণী, জ্ঞানী, পন্ডিত, সামন্ত, অভিজাত, ব্যবসায়ী এবং নৃপতি
এসেছে। গান্ধারীর মত মাদ্রীকেও হস্তিনাপুরে এনে পান্ডুর সঙ্গে ত
বিবাহ দিয়েছে।

এই একটা বিয়ে দিয়ে কিন্তু ভীষ্ম থামল না। তাড়াতাড়ি করে বিদুরকেও শ
রাজা দেবকের পরমাসুন্দরী তনয়া পরাশবীর সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে দিল।

বিদুরের বিবাহসংবাদ দ্বৈপায়নকে বেশ বিচলিত করল। বেশ কিছ
তার কাছে পৃথিবীটা একদম শূন্য হয়ে গিয়েছিল, কোন অনুভূতি, র
হিংসা, জ্বালা কিছুই বোধ করছিল না। কিসের একটা ভার যেন ঝুলেছিল হৃৎপি
সঙ্গে। যা সন্দেহের মধ্যে ছিল, অনুমানের রাজ্যে ছিল, যাকে হয়ত চোখ ব
ভুলে থাকা যেত, সেটা এমন রূঢ় বাস্তব হয়ে উঠল মনের ভেতর, যে তার কথা ভেবে
একটু বিচলিত এবং অস্থিরতা বোধ করতে লাগল।

দ্বৈপায়ন একটুও উত্তেজিত হল না। প্রতিক্রিয়ার বদলে শুরু হল বিচার বিশ্লে
এবং সমাধানের চেষ্টা।

দ্বৈপায়নের মনে নানা প্রশ্ন জাগল। যে লড়াইটা একদিন তাকে ও অম্বিক
নিয়ে সূচনা হয়েছিল এবং ধৃতরাষ্ট্রর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এখন তা আর তা
সীমায় নেই। লড়াই-এ তটভূমি তাদের দিক থেকে ভীষ্মের দিকে সরে গেছে। ক
রাজনীতির স্রোত একখাতে কখনও বয় না, নদী যেমন তার গতিপথ বদলে ক

স্রোতধারাকে অব্যাহত রাখে রাজনীতিও তেমনি দেশ-কাল পরিস্থিতির অভিন্ন হয়ে রূপান্তরিত হয়, পরিবর্তিত হয়।

ভীষ্ম হস্তিনাপুরের মুকুটহীন সম্রাট। শান্তনুর মৃত্যু থেকে তার সূচনা। তখন সম্রাজ্ঞী সত্যবতীর প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য ও শাসনকার্য দেখাশোনা করত। সত্যবতীর ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আদেশ, নির্দেশ মেনে চলাই ছিল তার কাজ। রাজা ও রাজনীতির স্বার্থে কোন্‌টা ভাল আর মন্দ তার বিচার করত না কোনদিন। তার একটি অবাধ্যতাও যদি সত্যবতীর মনে কোন ধারণা সৃষ্টি করে, সে ক্ষমতালোভী —তাহলে তার দুঃখের জায়গা থাকবে না। এই ভয়ে সদা সতর্ক থাকত ভীষ্ম। সত্যবতীর সব ইচ্ছাকেই প্রশ্রয় দিত। ভীষ্মের দুর্বলতার সেই রন্ধ্রপথ ধরেই সে একদিন এই পরিবারের একজন হয়ে উঠল। যতদিন সত্যবতীর নামে রাজ্যশাসন হ'ত ততদিন তার অবাধ চলাফেরার কোন বাধা ছিল না।

কিন্তু এখন জমানা বদল হয়েছে। পাণ্ডুর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। ভীষ্ম তার সত্য ও প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। এখন আর বদনামের ভাগী হওয়ার আশংকা নেই ভীষ্মের মনে। তবু কি আশ্চর্য : নিজের অধিকারটুকু পাছে চলে যায় সেই ভয়ে সে পাগল হয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। ক্ষমতাকে শক্ত হাতে ধরার পথে কাঁটা দ্বৈপায়ন। সুতরাং তাকেই ভীষ্মের আগে উন্মূল করা দরকার হল। পাণ্ডুর দ্বিতীয় বার বিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধেই যেন জেহাদ ঘোষণা করল ভীষ্ম। এখানেই থামল না। বিদুরকে বিয়ে দিয়ে সে আরো একটা দুঃসাহস দেখাল। তার আচরণ দিয়েই বোঝাল, হস্তিনাপুরে দ্বৈপায়নের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সে এখন অবাঞ্ছিত অতিথি।

দ্বৈপায়নের বুক কাঁপিয়ে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিদুরের বিয়েটা তার মনে সবচেয়ে বেশি দাগা দিল। বিদুরের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ বেশি। মাখামাখিও গভীর এবং আন্তরিক। বিদুরের পাত্রী নির্বাচন নিয়ে কত স্বপ্ন জেগে উঠত তার মনে। কিছুদিন আগেও সে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু ভীষ্ম তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্বপ্নভঙ্গ করল। নিজের এই ছেলেটির প্রতি তার যে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল ভীষ্ম তা জেনেই যেন এই অপমান করল তাকে। ভীষ্ম জানত, দ্বৈপায়ন যতই না বোঝার ভান করুক, এই অপমানের পর সে আর হস্তিনাপুর যাবে না। সেখানকার দরজা তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। এই দুটি বিবাহ শুধু তার সংকেত দিল

দ্বৈপায়নের ভিতরে প্রতিক্রিয়াটা শুরু হল। এখন এই মুহূর্তে নিজের ভেতর একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল। ভারী অবশ লাগছিল তার শরীর। শরীরের ভিতরে একটা যন্ত্রণার মত কি যেন পাকিয়ে উঠতে লাগল।

পুষ্কর পেঁৗছে দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরের রাজনীতির পালাবদলের এক আশ্চর্য, চমকপ্রদ কাহিনী শুনল। কত সহজে পাণ্ডুকে সিংহাসনচ্যুত করে ধৃতরাষ্ট্র রাজনৈতিক

ক্ষমতায় এল। ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি খুব কৌশলে এবং গোপনে করাল ধৃতর হানাহানি রক্তারক্তি কিছুই করতে হল না তাকে। পাণ্ডুকে দিগ্বিজয়ে পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজকার্য দেখাশোনা ও শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করল। তা দিগ্বিজয় থেকে পাণ্ডু ফিরলে ধৃতরাষ্ট্র খুব স্পষ্ট করেই বলল : পাণ্ডু বিধাতা ছাড়া আমাকে সব দিয়েছে। অন্ধত্ব আমার জীবনে অভিশাপ। কিন্তু অন্ধ হ যে আমি ভাল রাজকার্য করতে পারি তা বোধ হয় আর গালগল্প নয়। বাস্তব স রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ এই কয়দিনে আমার জীবনে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দিয়েছে। যে অনুভূতি কাউকে বলে বোঝানোর নয়। এখন কেবলই মনে হয় সিংহাসন ধর্মতঃ, ন্যায়তঃ আমারই প্রাপ্য। আমার সিংহাসনকে তোমার কাছে গ রেখে লাভ কি? তোমাকে এই সিংহাসনের অধিকার ফিরিয়ে দিলে লোকে আ নির্বোধ বলবে। ভাগ্যের ছলনাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত নই। এই বি ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার স্বপ্ন আমার দুই চোখে। এ আর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

পাণ্ডু নীরব। তার সব কথা হারিয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্রের এইসব কথাবার্তার স সে একেবারেই প্রতিরোধহীন। পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রকে এমনিতে ভয় পায়। ধৃতর এমন একটা সহজ সরল অকপট ধারালো জিভ আছে যা অপ্রিয় কথাকে তরোয়ালে ব্যবহার করতে পারে।

স্তব্ধতার ভেতর ধৃতরাষ্ট্র একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। প্রসঙ্গটাও ছিল খ লজ্জাজনক। চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে পাণ্ডুকে খুঁজল। তার প্রস্তরবৎ আচ্ছন্ন মূর্তিকে স্পর্শ করল। তারপর গলাটা সামান্য নামিয়ে নিয়ে বল পাণ্ডু, ভাই আমার! অকপটে তোমাকে আমার মনের ইচ্ছা বললাম। ম নিজেই তার ভাগ্যনির্মাতা। অদৃষ্টের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে আমি যে নতুন সৌভ অর্জন করেছি তা বিধাতার দান নয়! নিজের কূটবুদ্ধির বলে আমি তা অর্জন করে অধিকার অর্জন না করলে তার ধার, গৌরব দুই-ই ক্ষয়ে যায়। কৃতকর্মের জন্যে আ কোন অনুশোচনা নেই। আমি রাজা। রাজধর্মে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু বলে কি নেই। স্নেহ, মায়া মমতা, ন্যায়-ধর্ম, বিবেক, সত্য বলেও কিছু নেই। রাজা শ চায় জয় আর শত্রুর বিনাশ। তুমি আর এখন ভাই নও, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। রা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে নেই। তাই তোমার আর হস্তিনাপুরে থাকা চলবে না। রা অধিকার ত্যাগ করে সপরিবারে তোমাকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যেতে হবে। রথ প্রস্তু নিশাবসানের আগে সপরিবারে হস্তিনাপুর ত্যাগ করে তুমি হিমালয়ের উত্তরে শত পর্বতমালায় চলে যাও। সেখানে তোমার থাকার সব ব্যবস্থাই করা আছে।

পাণ্ডুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিষণ্ণ স্বরে বলল : দিগ্বিজয়ী পাণ্ডুর সবচেয়ে পরাজয় হল তার নিজের ভাই-এর কাছেই। এই হার আমি ঠেকাতে পারলুম ক

পিতামহ বলেন, আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে শিখিনি। কথাটা কত সত্য আজ বুঝতে পারলাম।

ধৃতরাষ্ট্র থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: তুমি আমায় ভুল বুঝ না পাণ্ডু। তোমাকে যারা আমার স্থলাভিষিক্ত করেছে তারা সবাই লোভী, স্বার্থপর। কুরুবংশের কিংবা হস্তিনাপুরের কেউ মিত্র নয় তারা। তোমাকে পুতুল বানিয়ে স্বার্থের মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় তোমার কাছ থেকে বুঝে নিত। সেই মহাসর্বনাশ থেকে আমি হস্তিনাপুরের রাজবংশকে বাঁচাতে শাসনদণ্ড হাতে নিলাম। শুধু তাদের খবরদারী বন্ধ করার জন্যেই আমাকে নিষ্ঠুর হতে হল।

দ্বৈপায়ন বজ্রাহতের মত বসে রইল। বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে তার কিছু সময় লাগল। হস্তিনাপুরের ওই বন্ধ কপাট তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সব সম্ভাবনার পথে খিল তুলে দিল। সারা রাত বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল। দ্বৈপায়ন কম্বলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে চুপ করে জেগে রইল বিছানায়। তার ঘুম এল না।

ঘুম আসার কথা সহজ নয়। শুয়ে শুয়ে সে প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করছিল। মনের ভেতর তার বিবিধ জিজ্ঞাসা। হস্তিনাপুরের রাজনীতির পালাবদল কার চক্রান্তে হল? এর নেপথ্য নায়ক কে? ভীষ্ম? ভীষ্মের সঙ্গে তার বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে, কিন্তু তা আছে লোকচক্ষুর আড়ালে। সে হল রাজনীতির গোপন সংঘাত—ঠাণ্ডা লড়াই। কিন্তু পাণ্ডুকে উৎখাত করার লড়াই হল খোলা রাজপথে সবার দৃষ্টির সামনে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দ্বন্দ্বযুদ্ধ নয়! কূটবুদ্ধির যুদ্ধে কে কাকে হারাতে পারে তারই এক মহড়া হল। যুদ্ধ হল দুই ভাইয়ের—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর। বঞ্চিত ও সৌভাগ্যবানের সংঘর্ষের মধ্যে ভীষ্ম কোথায়?

কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বার করে বড় বড় চোখে চেয়ে রইল অন্ধকারের দিকে। খোলা জানলা দিয়ে উত্তরে হাওয়া আসছিল। শরীরের ভেতর কাঁপুনি দিচ্ছিল। তবু দ্বৈপায়ন জানলা বন্ধ করতে উঠল না। ঘরে বন্ধ জানলা সে একেবারে সহ্য করতে পারে না। জানলা বন্ধ থাকলে বেশি অস্থির হয়ে পড়ে। আজ এমনিতে তার অস্থিরতা কিছু বেশি। কিন্তু বিছানায় দেহখানি নিস্পন্দ, স্থির। চোখ দুটো খোলা জানলার সঙ্গে আঠার মত এঁটে থাকল।

বাইরে অন্ধকার রূপময়ী। জ্যোৎস্নার অদ্ভুত স্নিগ্ধ আলোর মায়া সেখানে। কুয়াশার ভেতর বড় বড় গাছের ভুতুড়ে চেহারা। জোনাকির মিট মিট আলো বন-ভূমির নিবিড় ঘন অন্ধকারে চুমকির মত ঝলমল করছিল।

প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে দ্বৈপায়নের নিঃশ্বাস পড়ল। বুক কেঁপে উঠল থরথর করে। দ্বৈপায়ন আতঙ্কিত চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

অবোধ দৃষ্টি। তারপর ফাঁকা অন্ধকার ঘরটার দিকে তাকাল। ভয়ংকর সব চিন্তা তার চারপাশে জড়ো হল।

সংঘর্ষের চেহারা যে রূপই নিক—মূল সংঘর্ষ তার সঙ্গে ভীষ্মের। পাণ্ডুকে হস্তিনাপুর থেকে বিদায় দেবার ব্যাপারে ভীষ্মের নীরব অনুমোদন ও সমর্থন ছিল। তা যদি না থাকত ভীষ্ম পাণ্ডুকে ফিরিয়ে আনত। কিন্তু সেরকম কোন চেষ্টা সে করল না? ছলনা প্রতারণার জন্যে ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনাও করল না। ভীষ্ম মনে মনে পাণ্ডুকে হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে যে চাইছিল না, তার এই নির্লিপ্ত নির্বিকার মনোভাবই যেন সেই রহস্যকে আঙুল দিয়ে ইংগিত করল। ধৃতরাষ্ট্র নিজের পথের কাঁটা নিজেই সরিয়ে ফেলতে যে ফন্দী করেছিল তাতে ভীষ্মের নীরব অনুমোদন ও প্রশ্রয় ছিল বলেই ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুকে ঠকিয়ে তার সিংহাসন কেড়ে নিল। এ কার্যে তার বড় মূলধন হল আনুগত্য। আনুগত্য একমাত্র ক্ষমতার তাপে শক্ত হয়ে লেগে থাকে। ক্ষমতা যার হাতে, অনেক কিছু করতে পারে সে। অনেক কিছু দিতে পারে। অনেক লোভও দেখাতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর অনুপস্থিতিতে মানুষকে পাইয়ে দেবার রাজনীতি করে তার অনুকূলে টানল। অনেক ভেজাল, অনেক মিথ্যে দিয়ে জয়লাভের পথ পাকা করল। পাণ্ডু যে মুহূর্তে ফিরল সেই মুহূর্তে প্রজা ও রাজকর্মচারীর আনুগত্য ও আস্থা নিয়ে পাণ্ডুকে গদিচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠাল। লোকচক্ষে তা পাণ্ডুর স্বেচ্ছানির্বাসন হয়ে থাকল।

পাণ্ডুর উপর এই নগ্ন প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ করে ভীষ্ম কার্যতঃ তার উপরেই প্রতিশোধ নিল। যেমন সে অম্বিকার প্রতিশোধ নিচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রের উপর। কিন্তু সংঘর্ষে জিতবার জন্যে সে কোন মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। অন্যায়কে সমর্থনও করেনি। কিন্তু ভীষ্ম ধর্মভ্রষ্ট হল। অনেক মিথ্যে দিয়ে জয়লাভের এই গৌরবকে, একদিন মোটা মাশুল দিয়ে তাকে শোধ করতে হবে।

কূটনীতির বিপর্যয় দ্বৈপায়নকে ভাবিয়ে তুলল। যেভাবে সব কিছু চলছিল তাতে প্রথম পর্বে সে জিতেছে। দ্বিতীয় পর্বে জেতার মধ্যেও অর্ধেক পরাজয় রয়ে গেছে, কিন্তু তৃতীয় পর্বে শুধুই পরাজয়।

দ্বৈপায়ন হতাশভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। পরাজয়ের অপমান এবং গ্লানি তাকে প্রায় ছেয়ে ফেলল। সে কিছু স্থির করতে পারছিল না। বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণার সূত্রপাত হল। মনটা অস্থির! দ্বৈপায়ন শয্যা ছেড়ে উঠল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল; আর ভাবতে লাগল। কিন্তু ভীষ্ম কিংবা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাকে তো কোন না কোনভাবে পাল্লা দিতে হবে। থেমে গেলে তো হবে না। পান্ডুকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ভীষ্ম তাকে যে কথাটা বোঝাতে চেয়েছে দ্বৈপায়নকে তা অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্পর্শ করে গেল।

হস্তিনাপুরে পান্ডু কেউ নয়। তার ব্যক্তিত্ব কিংবা রাজনৈতিক সত্তা নেই। কুন্তী তাকে চালায়। সে কুন্তীর অনুগত ও বাধ্য। কুন্তী তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেইজন্যে ভীষ্ম মাদ্রীর প্রয়োজন অনুভব করল। কিন্তু ভীষ্ম যা চেয়েছিল কুন্তী তা হতে দিল না। কুন্তীর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে, তার মধুর ব্যবহারে ও মিষ্ট আলাপে মাদ্রী কুন্তীর অনুরাগী হল। সপত্নীগত বিদ্বেষ, বিভেদ, ঘৃণার কোন দেয়াল তাদের মধ্যে তৈরী হল না। তাই পান্ডুকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে রাখা আর যুক্তিযুক্ত মনে হল না। তাকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত হল।

কিন্তু পান্ডুকে নিয়ে তার সব পরিকল্পনা। পান্ডুকে সরানো মানে তাকে সরিয়ে দেওয়া। ধৃতরাষ্ট্র জেনে-শুনে তার সঙ্গে সংঘাত বাধাতে চাইছে। ধৃতরাষ্ট্রের চোখে সে বনবাসী ঋষি এবং অনার্য। তাই তাকে অবজ্ঞা করার এই স্পর্ধা সে পেল। ক্রোধে দ্বৈপায়নের ভুরু কুঁচকে গেল। বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় সুরু হল।

ছয়

রাজ্যচ্যুত পাণ্ডুকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে দ্বৈপায়ন এক গোপন রাজনৈতিক চক্রান্তে লিপ্ত হল। সে কার্য চলল সতর্ক, মন্থর চক্রান্তে।

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, শকুনির মনে তার সম্পর্কে যে ধারণাটি জমে আছে, তাকে মুছে ফেলতে দ্বৈপায়ন পুরোপুরি ঋষির জীবন শুরু করল। বেদ-বিভাগের কাজ সমাপ্ত করল। বিবিধ পুরাণ লিখল। খুব দ্রুত এবং অল্প সময়ের ভেতর তার যশ, খ্যাতি ও গৌরব ছড়িয়ে পড়ল। লোকে তাকে মহর্ষি ব্যাসদেব বলে জানল। বিপুল খ্যাতি, গৌরব, প্রতিষ্ঠার তলায় চাপা পড়ে গেল তার মায়ের দেওয়া দ্বৈপায়ন নাম।

নিজের বিপুল নাম-গৌরবের ছত্রচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন এক নতুন রাজনৈতিক খেলা শুরু করল। ব্যাসদেব তার উদ্যোক্তা, সংগঠক ও পরিচালক। হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে এবং বাইরে এই রাজনীতি প্রবর্তন করতে ব্যাসদেব অনেকগুলি ব্যবস্থা নিল।

ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসন থেকে সরাতে হলে দরকার একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কূট রাজনৈতিককে। এ কার্যে বিদুরকে তার সবচেয়ে উপযোগী মনে হল। বিদুর তার পুত্র। তার শরীরে অনার্য রক্ত। বিদুর শান্ত-স্বভাবের মানুষ। খুব ধীর, স্থির, সংযত, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং চতুর। সর্বোপরি বিদুরের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অসাধারণ। তার দূরদৃষ্টিও অকল্পনীয়। সে ভাবী বিপদের সম্ভাবনাকে আগে থেকে আঁচ করতে পারে। কখন কোন কথাটা বললে মানুষ খুশী ও সুখী হয়, এই ধরনের লোকরঞ্জনের শক্তি এবং লোক-চরিত্রাভিজ্ঞতা তার প্রবল। শুধু তাই নয়, হস্তিনাপুরের প্রশাসনে সে ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত মন্ত্রণাদাতা, উপদেষ্টা এবং মন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। এ হেন ব্যক্তির রাজনৈতিক সহযোগিতা পেলে ষড়যন্ত্রের কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়। কিন্তু বিদুর আগের মত আর নেই। দেশ কাল পরিস্থিতি এবং ঘটনার আকস্মিকতায় সে বাধ্য হয়েছিল নিজেকে অবস্থার সঙ্গে বদলে নিতে। কিন্তু বিদুরকে এখানে কিছুতে থামতে দেওয়া যাবে না। তার মনে বৃহত্ত্বের স্বপ্ন জাগাতে হবে।

ব্যাসদেব খুব গোপনে বিদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। বিদুরের অনুরাগদীপিত শ্রদ্ধাশীল ঘটনাকে নাড়িয়ে দেবার জন্যে রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের গল্প বলল।

পিতার আদেশে অপ্রিয় অধর্ম কর্মানুষ্ঠান হলেও পরশুরাম বিনা তর্কে গর্ভধারিণী মাতাকে হত্যা করেছিল, সে উপাখ্যানও শোনাল।

তারপর সস্নেহে বলল, তোমার আমার শিরায় এক রক্তধারা বইছে। সে রক্ত অনার্যর। আর্যরা অনার্যদের চিরকাল দাবিয়ে রাখতে চায়। তাদের অবজ্ঞা করে। শ্বেতাঙ্গ আর্য কৃষ্ণবর্ণ অনার্যকে জঙ্গলের মানুষ ভাবে। তাদের সাথে জন্তুর মত আচরণ করে। তোমাকে এসব ক্ষোভের কথা আত্মগ্লানির কথা অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

আচমকা একটা অনুভূতি হল বিদুরের। মনে হল তার সত্তায় সত্তায় অনার্য রক্তের কলধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছে। বুকটা একটু কেমন করে উঠল। কাঁটা ফোটার মত ব্যথা টনটন করতে লাগল। সম্মোহিতের মত ব্যাসদেবের দিকে শূণ্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল। স্তিমিত কণ্ঠে বলল ঃ সবই জানি।

ব্যাসদেব মৃদু হাসল। বলল ঃ তাহলে কেন বুঝতে পার না, তুমি, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু ভাই ভাই হয়েও এক গোত্রের এক বর্ণের নয়। যদিও এক পিতার সন্তান তোমরা। তবুও অধিকারে তুমি অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে এক নও। তোমার পরিচয়ও আলাদা। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সঙ্গে তোমাকে পৃথক করে দেখা হচ্ছে। তারা হল রাজপুত্র, এই বংশের সন্তান, আর তুমি হলে শূদ্রাণী পুত্র। এই বংশের কেউ নও। কেন? তোমার জননী অনার্য রমণী বলে বিচিত্রবীর্যের বিবাহিত পত্নী ছিল না। এই তোমার অপরাধ?

বিস্ময়ে বিদুর কোন জবাব দিতে পারল না। জননীর কথা শুনে লজ্জায় তার মুখ রক্তিম হল। মনে মনে নিজের সঙ্গে বিদুর অনেক কথা বলল। হ্যাঁ, ব্যাসদেব তুমি ঠিকই বলেছ। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিল মা। সেই স্বপ্ন অনার্য রমণী বলে চুরমার হয়ে গেল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রায় পতিতার মত এক জীবন যাপন করতে হল তাকে। সে কার দোষ? অদ্রিকার অদৃষ্টের, না মানুষের অবিচারের। ব্যাসদেব তুমি মায়ের মর্মব্যথার কথা জান, তাই এমন করে তুমি আমার ভেতরে এক কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারলে। তুমি ভাল করেই জান প্রত্যেক মানুষের ভেতর প্রতিশোধ স্পৃহা থাকতে পারে। তুমি আমাকে দিয়ে তার শোধটা তুলতে চাও।

বিদুর নীরব। ব্যাসদেব তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে তাকে বুঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার স্তব্ধ গম্ভীর অভিব্যক্তি দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। কয়েকমুহূর্ত থেমে ব্যাসদেব অনেক কথা ভেবে নিয়ে তাকে নিজের বশে আনার জন্যে বলল ঃ বিদুর তোমাদের তিন ভাই-এর মধ্যে তুমিই রাজপদের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি ওদের নৃপতি নির্বাচনের গুণগুলি বলেছিলাম। কি আশ্চর্য দ্যাখ, ভুলেও ভীষ্ম, কণিক কেউ তোমার নাম করল না। তোমাকে বঞ্চিত করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। অন্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র যেমন অযোগ্য, পাণ্ডুও অপদার্থ,

ব্যক্তিত্বহীন বলে তেমনি অযোগ্য। তথাপি বিচিত্রবীর্যের দুই বধুর গর্ভজাত সন্তান বলেই তাদের সিংহাসনে অধিকার। আর তুমি দাসী পুত্র। অনার্য। আশ্রিত, অনুগ্রাহী। তুমি পেলে সামান্য মন্ত্রীর কাজ। কেন জান? তোমার ধমনীতে বিশুদ্ধ অনার্য রক্ত, তুমি কৃষ্ণবর্ণ– চির অনাদৃত। তুমি হলে ওদের অনার্য বিক্ষোভ, বিদ্রোহ বন্ধের রাজনৈতিক টোপ। তোমার জনরঞ্জনী শক্তিকে ওরা প্রজারোষের বর্মরূপে ব্যবহার করবে। তাই তোমার এত কদর, বুঝলে? কিন্তু রক্ত, বর্ণ, গোত্রের সম্বন্ধে এই হস্তিনাপুরে তুমি আমার আত্মজ। একান্ত বিশ্বস্ত, আপন জন। তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক?

ভিতরকার উত্তেজনায় বিদুরের বুক কাঁপছিল। ব্যাসদেবের কথাগুলো বার বার শিহরিত করল তার সর্বাঙ্গ। এরকম আগে কখনও হয়নি। কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে বলল ঃ আমায় কি করতে হবে?

ব্যাসদেব গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে স্নেহভরে বলল ঃ পুত্র তুমি আমি একত্র হলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারি। রাজবংশের অভ্যন্তরে তুমি আমার লক্ষ্য জয়ের সহযোগী হয়ে কাজ কর—এই শুধু মিনতি।

বিদুর চমকে উঠল। সহসা তার বুকে হৃৎস্পদনের শব্দ বেড়ে গেল। দ্রুত হল। শশব্যস্ত হয়ে বলল ঃ মিনতি কেন বলছ? পুত্রের কাছে পিতার কোন মিনতি, অনুরোধ থাকতে পারে না। থাকে শুধু কর্তব্য পালনের নির্দেশ। কিন্তু আমার চিন্তা, বিশ্বাস সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচেছ। আমি ভালমন্দ বিচার করতে অক্ষম।

বিদুরের দৃষ্টির মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব লক্ষ্য করল ব্যাসদেব। বিদুরের সব কিছুই তার গভীরভাবে জানা। ওই চোখ, চাহনিও তার গভীর ভাবে চেনা। মানুষ ঐ রকম দৃষ্টি কখন প্রাপ্ত হয় তাও অজ্ঞাত নয়। বিদুরের ভেতর তার কথার প্রতিক্রিয়া যে মানসিক ভারসাম্যের গোলমাল বাঁধিয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিদুরের সব চেয়ে অবাক লাগল কতখানি আস্থা আর গভীর বিশ্বাস নিয়ে ব্যাসদেব অকপটে তাকে তার বাসনার কথা বলতে পারল। নিজের অধিকারকে এমন ভাবে অকপটে ক'জন দাবি করতে পারে? তার দাবির মধ্যে সংশয়, দ্বিধার লেশমাত্র নেই। এই বিশ্বাস, আস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি ও তার নেই। নিজের ভেতর এতবড় বিস্ময়টাকে বিদুর কিছুতে লুকোতে পারছিল না। তবু নিজের মনটাকে কঠিন ও নির্বিকার রেখে প্রশ্ন করল ঃ নিজের গোষ্ঠীর প্রতি তোমার মমতা অসীম। মানুষের মর্যাদা নিয়ে তারা আর্যদের সমকক্ষ হয়ে থাক এটাই তুমি চাও। কিন্তু এর জন্যে বিরোধ বিভেদের বৃষবৃক্ষ কেন বপন করতে চাইছ হস্তিনাপুরে? পাণ্ডুর পক্ষে গেলে যে স্বার্থ রক্ষা পাবে, ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে থাকলে তা পূরণ হবে না কেন?

ব্যাসদেব মৃদু হেসে উত্তর দিল ঃ পুত্র অধিকার অর্জন করতে হয়। অধিকারকে বুদ্ধি, রক্ত অথবা বাহুবল দিয়ে যদি অর্জন না করা যায় তবে তার গৌরব বা মর্যাদা

বাড়ে না। দয়ার দান হলে তার কিছু ধার থাকে না। অনুকম্পায় অনুগ্রহের পাত্র নিঃশেষ হলে অধিকারের পাত্রও শুকিয়ে যাবে। তাই যে পক্ষে সংঘর্ষ সেই পক্ষ নিয়েছি।

পিতা, তুমি শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষী হয়ে শ্বেতাঙ্গদের পক্ষাবলম্বন করে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তোমার কৃষ্ণাঙ্গাভিমানের গায়ে কি একটু আঁচড় লাগবে না? যদি তোমার পরিকল্পনা সফল হয়, তাহলে সে জয় তো শ্বেতাঙ্গ আর্যের। অনার্যের কি গৌরব বাড়বে তাতে?

বিদুরের এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্নে ব্যাসদেব অস্বস্তি বোধ করল। চট করে জবাব দিতে পারল না। উদ্বেগে তার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে উঠল। কিন্তু সে খুব অল্পক্ষণের জন্যে। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে ব্যাসদেব খুব শান্তগলায় স্মিত হেসে মৃদুস্বরে বলল: পুত্র তোমার এই প্রশ্নের জবাব সকলকে দেওয়া যায় না। কিন্তু তুমি আমার অত্যন্ত আপনজন, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করব না। এ হল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নীতি। আর্যে আর্যে বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে তাদের ধ্বংস করা আমার লক্ষ্য। বৎস এখন কোন যুদ্ধই দুই দেশের ভেতর হবে না। প্রতিবেশী দেশগুলি নানা স্বার্থে জড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধ মানেই দুই বৃহৎ শক্তি জোটের লড়াই। এর অর্থ, সমগ্র আর্য-নৃপতিরা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এক মহাযজ্ঞের মহাযুদ্ধের শ্মশানবেদীতে অনার্য সাম্রাজ্যের নবযুগের অভিষেক হবে। আমি তার অভ্যুদয়ের দিকে তাকিয়ে আছি। বল পুত্র, তুমি আমার সহায় হবে? বল -

বিদুরের সম্মোহন অবস্থা। দ্বৈপায়নের চোখে চোখ রেখে নীরব। বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল তার জবাব। বলল: হব।

পাণ্ডুর শতশৃঙ্গ পর্বত যাত্রার বহুকাল পর মহর্ষি দ্বৈপায়নের পদার্পণ ঘটল সেখানে। পর্বতের পরে পর্বত, আবার পর্বত। বিশাল বিশাল সমুদ্রের ঢেউ যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়েছে। কোন অদৃশ্য যাদুকরের মায়ায় তারা যেন অচল পাষাণে পরিণত হয়েছে। দিগন্তরেখা পর্যন্ত শত শত শৃঙ্গ যেন ঢেউ-এর মত জেগে আছে। পাহাড় খুব খাড়াই নয়। গাছপালা জঙ্গল খুব গভীর নয় এখানে। তবে বিশাল বিশাল দেবদারু শমীবৃক্ষের বন আছে। আর বহু নীচে জলন্ত রুপোর পাতের মত চক চক করছে পাহাড়ী নদীর জল।

পথ খুব খাড়াই নয়। চড়াই উতরাই পথ ব্যাসদেবকে গভীর থেকে গভীরে টেনে নিয়ে চলল। এখানকার পাহাড়ের মত এত রহস্যময় আকর্ষণ ব্যাসদেব অন্য পর্বত পরিক্রমার সময় আগে অনুভব করেনি।

বেলা পড়ে এল। সূর্যের নিভন্ত আলো গাছের ছায়া দীর্ঘতর করল। ঝোপে ঝোপে পাখিরা নিঃশব্দে যে যার নিরাপদ আস্তানা করে নিচ্ছিল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। জায়গাটা ভীষণ নির্জন আর জনশূন্য।

সূর্যের শেষ আলোটুকু মুছে গেল। কিন্তু সারা আকাশ যেন রক্তের সমুদ্র হল। দ্বৈপায়নের মনে হল, শতশৃঙ্গ পর্বতের শিখরগুলি যেন এক একটা ছিন্ন মুণ্ডের মত রক্তে ভাসছে। একটা রক্তময়ী যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যপট যেন তৈরী করেছে প্রকৃতি। দ্বৈপায়ন আনমনা চোখে দেখতে লাগল। হু হু করে হাওয়া এসে তার কানে কত কি যেন ফিসফিস করে বলল। দ্বৈপায়ন অন্ধকার অগ্রাহ্য করেই পথ চলতে লাগল। নরম চাঁদের আলোয় পাহাড় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটা স্বপ্ন সৃষ্টি হল সেখানে।

দ্বৈপায়ন বাতাসের কথা শুনতে শুনতে পথ হাঁটছিল। সে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বাতাসের অসংখ্য প্রলাপ শুনতে লাগল। বাতাস যেন বলছিল দ্বৈপায়ন তুমি বহুদূরে এসে গেছ। বহুদূরে, তোমার আর ফেরবার পথ নেই। ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ, তুমি সেই পথে এসে গেছ। তুমি এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

দূরে একটা আলো দেখে দ্বৈপায়ন থমকে দাঁড়াল। ভাল করে দিক ঠিক করে নিয়ে সে আবার পথ চলতে লাগল। পূর্বের ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাব আর নেই। এখন মনে হল, যাকে বাতাসের কথা বলে ভাবছিল আদৌ সে তা নয়। এ হয়তো তারই গভীর অভ্যন্তরের কথা, ভাবনা। বাতাসে সেই চিন্তাই ছড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিজের অজান্তে।

কুটিরের কাছাকাছি এসে যখন দাঁড়াল দ্বৈপায়ন তখন রাত হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও ঘন অন্ধকার নেই। পঞ্চমী চাঁদের নিষ্প্রভ আলোয় আলোকিত। বনফুলের গন্ধের সঙ্গে রাতের আবেশ, বাতাসের স্নিগ্ধতা মিশে আছে। ভীষণ ভাল লাগছিল দ্বৈপায়নের। কিন্তু কুটিরের ভেতর এত অন্ধকার কেন? কিছুক্ষণ আগেও একটা প্রদীপ জ্বলতে দেখেছিল, সে কি নিভে গেছে? না, নিভিয়ে দিয় ওরা শুয়ে পড়েছে? প্রকৃতিজুড়ে কী অপরূপ চাঁদের আলো, সমস্ত পার্বত্য পরিবেশ আলোকিত হয়ে আছে। শুধু এই কুটিরেই অন্ধকার? কেন? সাড়াশব্দও নেই। ভুতুড়ে লাগছে পুরো বাড়িটা। দরজাও বন্ধ। গা ছমছম পরিবেশ।

দ্বৈপায়ন আঙিনার ভেতরে ঢুকল। দরজায় গায়ে কান রাখল। ভিতরে জাগা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। জোরে কাকে কাশতে শুনল। তারপরেই ভিতর থেকে পাণ্ডুর মত পুরুষের গলা পেল।

বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন ডাকল : পাণ্ডু, আমি। আমি এসেছি। দরজা খোল।-

ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না।

কণ্ঠস্বর শুনে কুন্তী তড়াক্ করে উঠে বসল। উৎকর্ণ বোবা আনন্দের বিশাল স্রোত যেন তার বুকের ভেতর ভেঙ্গে পড়ল। তার সারা দেহমন প্লাবিত করল ঐ কণ্ঠস্বরের মূর্ছনা।

কয়েকদিন ধরে বিদুরের জন্যে তার মনটা ছটফট করছিল। দুর্বিষহ অসহিষ্ণুতার ভেতর তার দিন কাটছিল। আজ সারাদিন বিদুরের জন্যে তার মন কেমন করছিল। শুয়ে শুয়ে বিদুরের সঙ্গে প্রণয় কলহের একটা কাল্পনিক ছবি আঁকছিল মনে। ঠিক এরকম সময় বাইরে বিদুরের মত গলার আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠল। সেই মুহূর্তে একটা অবরুদ্ধ আবেগ তার গলার কাছে যেন দলা পাকিয়ে উঠে এল। কিন্তু তবু সে সাড়া দিল না। চুপ করে রইল। এত রাতে তার বিদুর আসবে? বিদুর! বিশ্বাস হল না কুন্তীর।

নির্জনে বাস। রাতে হুট করে দরজা খুলে বাইরে বেরোনোর আগে অনেক কিছু ভাবতে হয়। তাই সে দরজা খুলল না। উৎকর্ণ হয়ে সে আরো একটা ডাক শোনবার প্রতীক্ষায় রইল।

বাইরে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ পর আবার অন্তরঙ্গ কণ্ঠে ডাকল: পাণ্ডু, পৃথা তোমরা কি ঘুমোলে? আমি, আমি এসেছি।

কুন্তীর ভেতরটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সম্মোহিতের মত সে দরজা খুলল। নিশি পাওয়া মানুষের মত নেমে এল আঙিনায়। অন্ধকারের ভেতর দ্বৈপায়নকে বিদুর ভেবে নিল! আর তীব্র আনন্দের যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে যেতে যেতে বলল: এসেছ দেবর বিদুর। এতদিন পর সময় হল তোমার? এত নিষ্ঠুর হলে কেন? কতকাল তোমাকে দেখিনি বলতো? তুমি তো জান, এখানে কত একা আমি। এও এক ধরনের বন্দী জীবন। কি আছে এখানে? কি নিয়ে থাকব বলতে পার? কেন বোঝ না— তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার জীবন-মরণ, আমার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সব। তোমার শরীরের জীবন্ত ছোঁয়ায় আমার জঠরে যে প্রাণের অংকুর হয়েছে তার খোঁজ রাখ কি?

দ্বৈপায়ন স্তব্ধ। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। শীতের মধ্যে সে দরদর করে ঘামছিল।

কুন্তীর বুকের মধ্যে অনেক দিন ধরে যে সব কথা পুঞ্জিত হয়েছিল, লাভাস্রোতের মত তার বুক ঠেলে তা বেরিয়ে এল।

অন্ধকারের ভেতর মানুষটাকে ভাল করে চিনতে পারেনি কুন্তী। পারলে বোধ হয় লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেত। সেই সময় একখণ্ড কালো মেঘ এসে পঞ্চমীর চাঁদকে আড়াল করেছিল।

হতবুদ্ধি দ্বৈপায়ন এটুকু বুঝতে পারছিল, কম্বলে আবৃত শরীর আর এই আঁধার

তাদের উভয়ের এখন লজ্জার আড়াল। এই লজ্জার দেয়াল ভেসে গেলে তারা কেউ আর পরস্পরের দিকে তাকাতে পারবে না কোনদিন। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কুন্তীকে বুঝতে দেবে না সে দ্বৈপায়ন।

দ্বৈপায়নের প্রস্তর মূর্তিবৎ আচ্ছন্নতা কুন্তীর আশাভঙ্গ করল। বুকে তার অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল। রাগ টলটল করছিল। বলল: নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর তুমি! মিথ্যেবাদী। ভালবাসার নাম করে মেয়েমানুষ ঠকাও। ভণ্ড, ভণ্ড কোথাকার। বলতে বলতে দুকূল ছাপানো ভালবাসার আবেগে সে অসহায়ের মত ফুঁপিয়ে কাঁদল। বুক জুড়ে একটা রাগ, ঘৃণা আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। অপমানে বুকটা ভেঙে যেতে লাগল। উচিত অনুচিতের বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। উত্তেজনায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে সে দৌড়ে নিজের কুটিরে গেল। দরজা দিল।

কুন্তী চলে গেলে দ্বৈপায়নের নাভি থেকে অবরুদ্ধ শ্বাসটা বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে। বেশ কিছুটা স্বস্তিবোধ করল। সৌন্দর্যের একেবারে লীলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়নের এক অনাস্বাদিত জীবন-রহস্য দেখার সৌভাগ্য হল। গভীর ভালবাসায় সিঞ্চিত জ্বালাধরা অনুভূতি কত নগ্ন আর কত প্রত্যাশায় ভরা—এই প্রথম অনুভব করল।

কুন্তীর জন্যে দ্বৈপায়নের সত্যি খুব কষ্ট হল। কিন্তু একটা অদ্ভুত ভ্রমের ঘোরে কুন্তী তার নিজের মনের আবরণ দিল খুলে। না হলে দ্বৈপায়নের জানাই হ'ত না কুন্তী বিদুরকে ভালবাসে, এ ভালবাসা কোন অভ্যাস বা সংস্কার নয়। কুন্তী তার জীবনকে খুঁজেছে, তার ভবিষ্যৎকে দেখেছে। পাণ্ডুর প্রজনন ক্ষমতা নেই বলেই শরীরী প্রার্থনা নিয়ে সে বিদুরকে আহ্বান করেছে। বিদুরের সন্তান এখন তার গর্ভে। দ্বৈপায়ন চমৎকৃত হল। ভীষণ খুশি হল। আর তার বিদুরকে হারানোর ভয় নেই। বিদুর এখন তার সন্তানের স্বার্থে, কুন্তীর প্রেমের টানে কাজ করবে। হস্তিনাপুরে বিদুর আর একটা নয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার সত্তা। সে পুত্র, পিতা আবার প্রণয়ী। টুকরো টুকরো বিদুর। বিদুরের সাধ্য কি ধৃতরাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করে।

অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে ছিল দ্বৈপায়ন। রাতের আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মাথার উপর তার ধ্রুবতারা। চোখ বরাবর ধনুরাশি। তার বামে কালপুরুষ।

পাণ্ডু বোধ হয় কুন্তীর গলা পেয়ে পিছনের একটি কুটির থেকে বেরোল। হাতে তার প্রদীপ। প্রদীপের আলো পড়ে অন্ধকারটা হাল্কা হল। দ্বৈপায়নের খুব কাছে এল, প্রদীপ তুলে দেখল তার মুখ। কুন্তীর ভ্রম-বিভ্রাটের রহস্য জানলে লজ্জায় পড়বে। তাই, পাণ্ডুর কোন কৌতূহল প্রকাশ করার আগে মুখে আঙুল দিয়ে তাকে থামতে বলল। কানের কাছে মুখ এনে বলল: প্রদীপ নেভাও। আমি মহর্ষি ব্যাসদেব। তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে। স্থানান্তরে চল।

নিঃশব্দে তারা পাশাপাশি বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করল। একটি খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে জোনাকী পোকারা চারদিকে উড়ছিল পরীর চোখের

মত। কিছুই তেমন ভাবতে পারছিল না পাণ্ডু। মাথাটা তার অস্থির এলোমেলো।

দ্বৈপায়নের চোখে গভীর অন্যমনস্কতা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল : বৎস, প্রতীক্ষায় প্রহর গণনার কাল শেষ। আমি কালের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছি। আর ভয়-ভাবনা নেই। বিধাতা স্বয়ং অদৃষ্টের সঙ্গে কোমর বেঁধে নেমেছেন তাঁর কাজে। পাণ্ডুর অপলক দুই চোখে বিস্ময়ের ঘোর। কিন্তু বাক্যে তার সংশয়। বলল : মহর্ষি, চারদিকের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ ধৃতরাষ্ট্রের দিকে হাত মেলে দিয়েছে। এর ভেতর সুখ-স্বপ্ন দেখব কি আশায়? আমার কি আছে? বাহুবল, লোকবল, অর্থবল, বন্ধুবল কিছু নেই। আমি একা। নির্বাসিত। আমার সহায়, বন্ধু, আত্মীয় বলতে আপনি, শুধু আপনি। তবু আমি স্বপ্ন দেখি, বিশ্বাস করি, একদিন হস্তিনাপুরে ফিরবই। মহর্ষি আমার সে দুরাশা কি সত্যি পূর্ণ হবে? আপনি ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। বলুন কি করলে এই নির্বাসনে থেকে রাজ্যোদ্ধার করতে পারি?

দ্বৈপায়ন একটু ইতস্তত : করে বলল : পুত্র, আমি সুমের, ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মলোক, অমরাবতী হয়ে তোমার কাছে আসছি। সমতলভূমির রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে মত্ত। তোমার মত রাজ্যচ্যুত নির্বাসিতের পক্ষাবলম্বন করে বৃহৎ শক্তিজোটের অন্যতম শরিক জরাসন্ধের অনুগত বান্ধব ও সহায় ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারণ করবে না। তোমার কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং তোমার পক্ষে তারা যাবে কেন?

পাণ্ডুর হৃদয় মথিত হয়ে এক দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : তবু আপনি এখনও আশা পোষণ করেন। একমাত্র আপনিই আমাকে যা অন্ধকারের ভেতর একটু আলো দেখান।

শোন পুত্র, হিমালয় নিবাসী দেব-নৃপতিরাই তোমার বন্ধু ও আত্মীয় হতে পারে। শুধু তাই নয়, তোমার দুঃসময়ে একমাত্র বন্ধু হওয়ার মত সামর্থ্য তাদের আছে। এখনও তারা রাজনীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতিতে সমতল প্রদেশের নৃপতিদের চেয়ে অনেক উন্নত এবং প্রগতিশীল। সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত তাদের রাজ্যগুলি শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে। সমতল অঞ্চলের সমস্ত নৃপতিরা তাদের ভয় করে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। তাই এদের বন্ধুত্বের জন্যে আমি সে দেশে গিয়েছিলাম।

পাণ্ডু সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে বলল : দেবতাদের মত মহৎ মানুষদের কথা চিন্তা করাও ভাল। তাদের সাহায্য পাওয়ার জন্য আমি যে কোন কঠিন কাজে রাজী।

দ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ চোখ বুজে দেবতাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তাব স্মরণ করল। দেব-নৃপতিরা এখন বৃহৎ শক্তিজোটের আক্রমণ আশঙ্কায় ভুগছে। সেকারণ, তারা

নিজস্ব একটি বাহিনী সৃষ্টি করে এই নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে প্রয়াসী। কিন্তু তাদের লোকবলের অভাব। অতীতে ক্ষমতাচ্যুত, রাজ্যচ্যুত মনুর বংশধর মানুষকে সাহায্য করতে তাঁরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী রাজ্যচ্যুত মানুষ দেব-নৃপতিদের কৃপা, অনুগ্রহ ও সমর্থন নিয়ে উদ্ধার করেছে হৃতরাজ্য, ক্ষমতা, সম্মান ও গৌরব। তারপর শপথের কথা ভুলে গেছে। তাই দেব-নৃপতিরা অতীতের ভুল করতে আর রাজি নয়। তারা সরাসরি নিজের উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দেবে অস্ত্র। এই ব্যবস্থাতে আনুগত্য স্থায়ী হবে। তাদের দেবনির্ভরতা অটুট থাকবে। সমতল প্রদেশে মানুষ যত তাদের সৌভাগ্যগর্বে ঈর্ষান্বিত হবে ততটা তারা দেবলোকের উপর নির্ভর হয়ে পড়বে। রাজ্যচ্যুত রাজা যদি দেব-নৃপতিদের সহায়তায় ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করে তা হলে সেই দেবতার ঔরসজাত পুত্রদেরই তারা সরাসরি সাহায্য করবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার এত কথা মনে পড়ল! কিন্তু পান্ডুকে সে কথা বলতে কেমন একটা সংকোচ লাগল তার।

নিস্তব্ধ রাত। বাতাসও যেন চঞ্চলতা প্রকাশ করতে সাহস পেল না। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কেমন বুক উঠাপড়া করছিল নিভৃতে। খোলা জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। কোন অনুশোচনা, অপরাধবোধ, বিবেকের দংশন কিছুই এল না মনে। শুধু কুন্তীকে মনে পড়ল। বুকে তার ঝড়, রক্তে গোলাপ রাঙা কামনার সমুদ্র। তার তাজা প্রাণ চায় জীবনের উত্তাপ। অনেকের প্রেমিকা হওয়ার মতো ক্ষমতা তার আছে। তার ভেতর নারীর সংস্কার কিছু নেই। বিবাহিত-ভালবাসা তার কাছে একটা অভ্যাস শুধু। একমাত্র কুন্তীরই ক্ষমতা আছে অনাগত বিধাতাকে আহ্বান করার।

পান্ডু অল্প অল্প ঠান্ডার মধ্যে ঘামছিল। দ্বৈপায়নের কথা বলতে বেশ কিছু সময় লাগলো। আস্তে আস্তে বলল: বৎস, কৃতান্ত নগরের কৃতান্তরাজ, অমরাবতীর ইন্দ্র এবং দেব-নৃপতি পবন পরস্পর নিবিড় সৌভ্রাত্রবন্ধনে বাঁধা! এঁদের বন্ধুত্ব তোমার হৃতরাজ্য লাভের পথ সুগম করবে।

পান্ডুর বুকের ভেতর এক আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। বলল: উত্তম প্রস্তাব। আপনি আদেশ করুন, কি করলে আমি এঁদের কৃপা ও অনুগ্রহ পাব।

দ্বৈপায়ন অস্বস্তিবোধ করল। খুব অল্পক্ষণের মধ্যে দ্বিধা কাটিয়ে বলল: পুত্র, দেব-নৃপতিরা অত্যন্ত স্বার্থপর। স্বার্থ ভিন্ন তারা এক পা অগ্রসর হয় না। এখন যদি প্রশ্ন করে, কার জন্য কিসের স্বার্থে তুমি হৃতরাজ্য চাও? তোমার উত্তরাধিকারি কে? কি জবাব দেবে তুমি? পুত্রের জনক কোনদিন তুমি হতে পারবে না। এক্ষেত্রে শুধু তোমার জন্যে তারা এগিয়ে আসবে কেন? তোমার একটা ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে হবে, কুন্তী ও মাদ্রীকে দিয়ে। কোন দ্বিধা না করে এই সব দেব-নৃপদের ঔরসে

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন কর। এই সব পুত্রদের প্রতি স্নেহ ও মমতার ঋণে তারা তোমার প্রতি অনুরক্ত থাকবে, তোমার সর্বকাজে সহায় হবে। তাদের ছত্রছায়ায় তুমি নিজেকে সর্বদা নিরাপদ ভাবতে পারবে। তোমার নিরাপদ রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের আর কোন বাধা থাকবে না। ধৃতরাষ্ট্রের হাত থেকে রাজক্ষমতা খসে পড়বে। সুতরাং তুমি দ্বিধা না করে কুন্তী মাদ্রীকে সেই ভাবে উৎসাহিত কর। মনে রেখ, এই ক্ষেত্রজ পুত্রেরা দেবতাদের সহায়তা ও আশীর্বাদে একদিন সর্ববিজয়ী পরাক্রমশালী হবে। পৃথিবী শাসন করবে।

পাণ্ডুর সব উৎসাহ আনন্দ এক ফুৎকারে নিভে গেল। ভুরু কুঁচকে দ্বৈপায়নের দিকে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। মুখখানিতে বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। বিষণ্ণ গম্ভীর কালো চোখের দৃষ্টিতে যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল, তা নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল। অবাক। ভিতরের উত্তেজনা চাপা দিতে পাণ্ডুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। নিজেকে তার বড় অবসন্ন লাগছিল। নিবীর্যের আত্মগ্লানিতে শরীর ও মন পুড়ছিল। পৃথিবীকে তার একটা ভয়ংকর জঞ্জালের বোঝা মনে হল। তোর আবার চিন্তিত হল। মনে মনে বলল: কিছুই তো সঙ্গে যায় না, সব রেখে যেতে হয়। তবে এত নিজের নিজের করে মোহ কেন? দেহ অবসানের পর এসব ত কিছুই থাকে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের নিজের বলে কিছু ছিল না। নিজের বিলাস সে শেখেনি তখন। মানুষ তার পিতৃপরিচয় পর্যন্ত জানত না। মানুষ সভ্য হয়ে যত গণ্ডগোল হয়েছে। এখনও তার জঙ্গলের জীবন ভুলতে পারেনি সে। জঙ্গলের অলিখিত আইন মানুষের সভ্য সমাজে আছে এবং থাকবেও। তাহলে দ্বিধা কেন? তাকেও বাঁচতে হবে জীবন্মৃত হয়ে, এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। সংস্কার মিছে। সে নিজেও ক্ষেত্রজ পুত্র।

পাণ্ডু অন্ধকারে ব্যাসদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রেতের মত একটু হাসল। স্তিমিত স্বরে বলল: এ হল আমার বিধিলিপি। এতে আপত্তির কি আছে?

স্তব্ধতা নামল সেখানে। পঞ্চমীর চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। দৃষ্টির সম্মুখে এখন অতল অন্ধকার, মাথার উপর শুধু আকাশভরা নক্ষত্র।

এবার হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সংঘাতের এক আবর্ত রচনার প্রতি দ্বৈপায়ন মনোযোগ দিল। ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ভয়কে প্রবল করে তোলাই তার লক্ষ্য। ধৃতরাষ্ট্রের মনের গভীরে বহির্ঘটনার সংকট সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক ভয়ংকর 'বিষে বিষক্ষয়' নীতি গ্রহণ করল। ধৃতরাষ্ট্রের মনের বেশীভাগ শক্তিকে ক্ষয় করে ফেলতে এবং আসন্ন সংঘাতের বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে দ্বৈপায়ন কুন্তীর পুত্রলাভের সংবাদ বিদুরের মাধ্যমে বহন করে আনল রাজ অন্তঃপুরে। একেবারে পারিবারিক জীবনের মধ্যে।

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মনের প্রতিক্রিয়া ভাল করে বুঝতে ও জানতে বিদুর

তারপর উভয়ের সম্মুখে বলল : মহারানী, গুপ্তচরের মুখে জানতে পারলুম শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডু-পত্নী কুন্তীর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে।

গান্ধারী অকপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : কুন্তীর পুত্র হয়েছে? তুমি বলছ কি দেবর? পাণ্ডু ত শুনেছি –

বিদুর গান্ধারীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে মৃদু হাসল। বলল : তোমার অনুমান সত্য রানী। তবু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্ষেত্রজ পুত্র হতে তো কোন বাধা নেই।

গান্ধারী নিমেষে গম্ভীর হল। কেমন ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছিল তাকে। হতাশ গলায় বলল : মেয়ে মানুষ, কলঙ্কের ভয় নেই! ক্ষেত্রজ পুত্রের একটা নিয়ম আছে। এ তো আর কুন্তীর নিজের খেয়াল-খুশির ব্যাপার নয়।

ধৃতরাষ্ট্র ভেতরে ভেতরে একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। তার স্তব্ধ শান্ত, নিস্পৃহ, স্থির দুই চোখে দেখতে না পাওয়ায় শূন্যদৃষ্টি নিয়ে বিদুরের দিকে চেয়ে রইল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় তার বুকের ভেতরটা কাঠ হয়ে গেল। তার মনে অন্য আর একধরনের ভয় দেখা দিল। দূর ভবিষ্যতে কুন্তীর এরকম অনেক অবাঞ্ছিত পুত্র যদি হয় তাহলে এই রাজ্যের এবং পরিবারের একটা সমস্যা অবশ্যই সৃষ্টি হবে। ধৃতরাষ্ট্রের আতঙ্কিত মনে পলকে পলকে প্রশ্ন জাগল। একের পর এক প্রশ্ন করছিল সে নিজেকে। চোখের পাতায় ভ্রূপল্লবে ললাটে যেন কি এক উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে উঠল। অনেকক্ষণ বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : সেটাই ত সমস্যা রানী। পাণ্ডু স্বেচ্ছায় সব ছেড়েছুড়ে পর্বতবাসী হলে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম নিষ্কণ্টক হওয়া গেল বুঝি। কিন্তু এ তো এক নতুন কাঁটা এল জীবনে। সম্পর্কের শেষ সুতোয় বাঁধা এই কাঁটার ফুলটা তোমার আমার বুকে ফুটে শুধু রক্তই ঝরাবে রাণী।

তারপর কেমন একটা বিস্ময় বোধে আচ্ছন্ন হয়ে বিদুরকে প্রশ্ন করল : বিদুর কার ঔরসে কুন্তী পুত্রটি লাভ করল, জানতে পেরেছ?

বিদ্যুৎ খেলে গেল বিদুরের শরীরে। আর কেউ না জানলেও সে ত জানে এই সন্তান তার। প্রথম পিতা হওয়ার সুখানুভূতিতে অনেকক্ষণ ধরে তার হৃদয় টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল ধৃতরাষ্ট্রের মুখের উপর চিৎকার করে বলে : এই পুত্র আমার। ওকে পৃথিবীতে আনতে আমি নিঃশেষে নিবেদন করেছি নিজেকে। ওর দেহ, আত্মা, মেদ, মজ্জা সব আমার বীর্যে গঠিত। একটা অদ্ভুত সুখকর উল্লাসে আর আনন্দে বিদুরের নিঃশ্বাস বুজে এল। সে যেন কল্পনায় শিশুর শরীরের আঘ্রাণ নিল। রক্ত-মাংসের দলাটাকে বুকের ভেতর নিয়ে আদর করল, চুমু খেল। এই নীরব থাকার ভেতর যে অনির্বচনীয় সুখ শতধারায় নেমে এল তার আনন্দ দামামার মত বেজে যেতে লাগল বিদুরের শরীর জুড়ে। বিদুর চট করে তার মনের বিস্ময় গোপন করে ধৃতরাষ্ট্রকে একটু ইতস্তত করে বলল : শুনেছি দেবলোকের ধর্মরাজকে পাণ্ডু ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্যে নিয়োগ করেছিল।

সবিস্ময়ে ধৃতরাষ্ট্র উচ্চারণ করল ঃ ধর্মরাজকে—

বিদুরের অধরে হাসির তরঙ্গ খেলে গেল! বলল ঃ তাই ত শুনি। শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে যে সব ঋষি ব্রাহ্মণ ফিরেছে তাদের পাণ্ডু বলেছে, কুন্তীর নারীজন্মকে সার্থক করে তোলা তার কর্তব্য। কুন্তীর মত মহীয়সী নারীর উপযুক্ত পুরুষরূপে সে ধর্মরাজকে নির্বাচন করেছে। সব শিশু নিষ্পাপ। তবু পৃথিবীতে পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দর কথা আছে তো। বাচ্চাটাকে যাতে কেউ অপয়া না ভাবে সেজন্যেই পাণ্ডু ধর্মরাজকে আমন্ত্রণ করল।

এমন করে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কথাগুলোকে বলতে পেরে বিদুর বেশ তৃপ্তি অনুভব করল।

ধৃতরাষ্ট্রের মুখে সহসা কোন কথা যোগায় না। দুই ভুরুর মধ্যস্থল কুঁচকে গেল। ললাটের মধ্য-শিরা ফুলে উঠল। আতঙ্কিত সংশয়, জিজ্ঞাসায় তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সে। ধৃতরাষ্ট্র পায়ের তলায় মৃদু ভূকম্পন টের পাচ্ছিল। এ অন্য এক অনুভূতি।

গান্ধারী বজ্রাহতের মত অবাক হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে মুখ করে বসেছিল। বিদুরের কথা শোনার পর কিছুক্ষণ বোধ হয় তার দেহে প্রাণ ছিল না। হয়ত মূর্ছা গিয়েছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে অনেকক্ষণ নীরব দেখে সে ভয় পেল। পাণ্ডুকে তার ভয় ছিল না। সে জানত পাণ্ডু কোনদিন পুত্রের জনক হবে না। কুন্তী সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ সে মেয়েমানুষ তার ভয় সমাজকে, কলঙ্ককে। কিন্তু তার সব ভাবনাকে কুন্তী উল্টেপাল্টে দিল। গান্ধারী কাঁপতে কাঁপতে জ্বরাগ্রস্ত গলায় বলল ঃ দেবর, এভাবে ক্ষেত্রজ পুত্র হয় না! এ ভাবে নয়। পরিবারের লোকের মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। পারিবারিক অনুমোদন ছাড়া ক্ষেত্রজ পুত্র করা যায় না।

গান্ধারীর উদ্বেগের অর্থ ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাত ছিল না। কুন্তী যে একটা অঘটন ঘটাতে চাইছে ধৃতরাষ্ট্র তা দেশ কাল অবস্থা বিচার করে উপলব্ধি করল। ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাব থেকে জেগে উঠে থমথমে গম্ভীর গলায় বলল ঃ রাণী, তোমার মতই উদ্বিগ্ন আমি। ভেবে কূল কিনারা করতে পারছি না। তবে এটুকু টের পাচ্ছি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে আবার বোধ হয় একটা সংকট পাকিয়ে উঠবে। পাণ্ডুপুত্র আগে জন্মানোর জন্য আমাদের পুত্রের কোন দাবি-অধিকার থাকবে না সিংহাসনের উপর। কিন্তু—বলতে বলতে ধৃতরাষ্ট্র কেমন উদাস অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর থেমে গেল। অদূর ভবিষ্যতে পাণ্ডুপুত্রকে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার এক কাল্পনিক চিন্তায় সে মনে মনে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হল।

বুক খালি করা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গান্ধারী বিদুরের দিকে মুখ করে জিগ্যেস করল, দেবর পাণ্ডুর পুত্র-সংবাদে তুমি খুশি হয়েছ—তাই না?

গান্ধারীর জিজ্ঞাসায় সন্দেহ। তার ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তির তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হল না বিদুরের। কিন্তু সে অভ্যাসবশতঃ এমনভাবে মাথা নাড়াল যার অর্থ নানাবিধ এবং অপারচ্ছন্ন। কিন্তু গান্ধারী বা ধৃতরাষ্ট্র কেউ তার অভিব্যক্তি দেখতে পেল না। তাই খুব বিষণ্ণ থমথমে ভারাক্রান্ত গলায় বলল: রাণী তোমার নিঃশ্বাসে অবিশ্বাস, কথায় সন্দেহ। কিন্তু অগ্রজ বাল্য থেকে আমার উপর নির্ভরশীল, আমার ওপরে তার ভরসা বেশী। চোখে দেখতে পায়না বলে খুঁটিয়ে সব বলি। কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ভাবছে করছে বলছে, তার সামগ্রিক ছবি যদি তার কানে তুলে না ধরি তাহলে ভাল-মন্দ নিরূপণ করবে কেমন করে? অগ্রজ স্বচক্ষে দেখে না বলেই কোন কিছু লুকোই না, গোপন করি না। অনেক দেখে ভেবে রাজাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমার সেই বিশ্বস্ততাকে তুমি এমন সন্দেহের চোখে দেখতে পার ভাবিনি রাণী। তোমার কথাগুলো আমর মর্মে বড় আঘাত করেছে।

বিদুর যখন কথা বলছিল ধৃতরাষ্ট্র তখন আসন থেকে উঠে চঞ্চল পায়ে পায়চারী করতে লাগল। বুকের মধ্যে তার ঝড়ো বাতাসের দোলা, মনের ভেতর কত চিন্তার ছবি ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু সেই গভীর গোপন কথা তো আর কাউকে জানান সম্ভব ছিল না। তাই বিদুর তার বাইরের অস্থিরতাকে দেখতে পেল।

গান্ধারী বুঝতে পারল সে একটা বড় অপরাধ করেছে। তার ভুলটা মর্মান্তিক। লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে তার দুই চোখ ভরে জল এল। কিন্তু চোখে বস্ত্রখন্ড থাকার জন্যে বিদুর তা দেখতে পেল না। কিন্তু কান্নায় তার ঠোঁট মুখ ভুরু বেঁকে যেতে লাগলো। গান্ধারী দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। কিন্তু কোন শব্দ বেরোল না তার কণ্ঠ দিয়ে।

অবাক চোখে বিদুর দৃশ্যটা দেখছিল। শেষে অপরাধবোধে গান্ধারী কেঁদেই ফেলল। ভাঙ্গা বিকৃত গলায় বলল: দেবর! দুর্ভাগা নারী, কি বলতে কি বলেছি নিজেই জানি না। আমার অপরাধ নিও না ভাই। তোমাকে যন্ত্রণা দেবার জন্য কিংবা অপমান করার জন্য কথাগুলো বলিনি। বিশ্বাস কর কুন্তীর পুত্র হওয়া সংবাদে আমি খুশি হতে পারিনি। একটু আনন্দ হয়নি আমার। বরং বিষাদে ভরে গেছে অন্তর। আমার কিছু ভাল লাগছে না। ভাল করে কিছু ভাবতেও পারছি না। বুকের ভেতর একটা বিরাট ভাঙাগড়া হচ্ছে। সব কেমন গোলমাল হয়ে হয়ে যাচ্ছে। মাথাটাও ঠিক নেই। স্বপ্নভঙ্গের কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার সন্তানের কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না। তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার আর কি প্রয়োজন আছে? না, পৃথিবীতে তার কোন প্রয়োজন নেই। গর্ভজ ভ্রূণকে আমি পৃথিবীর আলো দেখতে দেব না।

তারপরেই গান্ধারী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিজের উপর। আশাভঙ্গের নিদারুণ দাহে ও যন্ত্রণায় অতি তীব্র ও ভয়ংকর হয়ে উঠল। গর্ভের উপর তার আক্রোশ। দুই হাত দিয়ে এলোপাথারি সে গর্ভের উপর উপর্যুপরি আঘাত করতে লাগল।

বিদুর বিব্রত অস্বস্তিতে তাকে প্রবোধ দিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল। ঝুঁকে

পড়ে ধরার চেষ্টা করল। তার তপ্ত নিঃশ্বাস বিদুরের গলায় চিবুকে এসে লাগল। চুলগুলো খুলে গান্ধারীর মুখখানা ঢেকে গিয়েছিল। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিল সে। আর একটা কাতর যন্ত্রণার স্বর তার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল। বিদুর বিভ্রান্ত স্বরে বার বার ডাকল ঃ রাজমহিষী! রাজমহিষী! এ উন্মাদনা তোমায় মানায় না। জননীকে অধীর হতে নেই। অনেক ধৈর্য, সহিষ্ণুতা উত্তরণের পর তবে জননী হয়। এ সব তোমার চেয়ে আর কে বেশী জানে।

ধৃতরাষ্ট্র অসহায়ের মত তার পাশে বসে গায়ে হাত বুলোল। তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। কণ্ঠস্বর তার ভিজে গেল দরদে সহানুভূতিতে। আর্তস্বরে বলল মহিষী, তুমি শান্ত হও। অমন করে গর্ভ নষ্ট করলে, মহাপাতকিনী হবে তুমি। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবে না। প্রথম সন্তান এসেছে তোমার। আমাদের দু'জনের কত স্বপ্ন, কত আশা, কত কল্পনা বলত? তুমি নিজের হাতে তাকে ছিন্ন মূল করছ? তুমি কি পাগল হলে শেষে?

গান্ধারী হাঁফাতে লাগল। জোরে জোরে এবং ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার। একটা কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় মুখখানা নীল হয়ে গেল। নাকের হীরা কেঁপে গেল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় টাটাতে লাগল তার সারা শরীর। মাঝে মাঝে ছুঁচ ফোটার মত অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীরটা বেঁকে যাচ্ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে একটা অস্ফুট ক্লান্ত গোঙানির স্বর হতে লাগল। অনুভূতির ভেতর একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। যন্ত্রণামথিত রুদ্ধ স্বরে গান্ধারী বলল ঃ ওগো আমি আর পারছি না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আর বাঁচব না। আমাদের সন্তানও আর পৃথিবীর আলো দেখবে না। আমার রাজমাতা হওয়ার স্বপ্ন গেল। আমি আর কি নিয়ে থাকব?

ধৃতরাষ্ট্রের বাহুমূলের উপর মাথা রেখে গান্ধারী কাঁদছিল। সহসা তীব্র গোঙানিতে আর্ত হয় তার কণ্ঠস্বর। বল, কি নিয়ে থাকব? কী আশায় বেঁচে থাকব। যন্ত্রণার আর্ত তীব্র হাহাকারে ঝংকারে বাজতে লাগল তার কণ্ঠে।

ক্রমে অবসন্ন হয়ে এল তার দেহ। একটু একটু করে তার চেতনা বিলুপ্ত হয়ে এল। বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে সে অনুভব করল কি একটা গরম তরল পদার্থ নরম মাংসের দলার সঙ্গে এক হয়ে তার গর্ভদেশ থেকে যেন স্খলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

শ্বেত মর্মরের মেঝে লাল হল রক্তে।

বিদুর বিভ্রান্ত স্বরে বলল ঃ সর্বনাশ মহারাজ; মহিষীর গর্ভপাত হয়েছে।

চমকে উঠল ধৃতরাষ্ট্র। শিরে করাঘাত হেনে বলল ঃ হা ঈশ্বর, একি করলে তুমি?

বিদুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রস্থান করল।

ব্যাসদেবের অসাধারণ চিকিৎসার গুনে গান্ধারী সুস্থ হল। সে যাত্রার মত তার

গর্ভ রক্ষা পেল। যথাকালে এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুত্র হল। কিন্তু দিনটা ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিপূর্ণ। প্রকৃতিলোকের অশান্ত অস্থিরতা গান্ধারীকে বিচলিত করল। নারীর নিজস্ব সংস্কার কতকগুলি অমঙ্গল আশংকা এবং অশুভ ভাবনা তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। অকস্মাৎ মনে পড়ল এক ভয়ংকর দুর্যোগময় অন্ধকার রাতে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণও জন্মগ্রহণ করেছিল। সেদিনটার সঙ্গে আজকের কোন প্রভেদ নেই। অমনি কেমন একটা স্বস্তিতে বিশ্বাসে মনটা ভরে উঠল।

গান্ধারী পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। সমস্ত শরীরে তখন অবসাদের টান ধরেছে। অবসন্নতায় দু'চোখ তার বোজা। তবু একটা অদ্ভুত সুখের উল্লাসে তার হৃদয় টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। চুম্বকের মত এক অদৃশ্য টান বুকের মধ্যে অনুভব করল। সেই সঙ্গে বাৎসল্যের ঢল নামল। যা প্রশমিত করার জন্য শিশুকে চেপে ধরল বুকের ভেতর। কচি নরম তুল তুলে মুখের উপর মুখ রাখল, নিজের গালের উপর তার গাল রাখল; শরীরের ঘ্রাণ নিল, বক্ষের স্পন্দন শুনল। আদর করল। চুম্বনে চুম্বনে রাঙিয়ে দিল তার নরম দেহখানি শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আপন মনে কত কথা বলল। সে কথার কোন অর্থ নেই। জবাবের প্রতীক্ষা নেই; তবু সে প্রগলভতায় সব জননীই এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও সুখ অনুভব করে। গান্ধারী সেরকম একটা সুখের ভেতর আবিষ্ট হয়ে রইল। তার কোন বাহ্য চেতনা ছিল না।

ধৃতরাষ্ট্রের নিঃশব্দ প্রবেশ তাই টের পেল না। ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে তার তন্ময়তা ভঙ্গ হল। তাড়াতাড়ি চক্ষু আবরণী দিয়ে চোখ বেঁধে সে উত্তর করল: স্বামী! তুমি এসেছ।

রাণী এতবড় একটা আনন্দের খবর শুনে চুপ করে থাকতে পারি? মানুষের জীবনটা বড় অদ্ভুত। একদিন জঠরে যাকে অবাঞ্ছিত মনে করে হত্যা করতে চেয়েছিলে আজ তাকে পেয়ে তোমার হৃদয় মমতায় ভরে গেল কেন? পৃথিবীতে এ কোন্ প্রলয় নেমে এল? এর অর্থ কি?

গান্ধারী বিব্রত হয়ে বলল: অমন করে বল না গো! আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভয়! ধৃতরাষ্ট্র উচ্চৈস্বরে হাসল। তার সে হাসি খলখল করে অনেকক্ষণ বাজতে লাগল। হাসির রেশ কণ্ঠে রেখে সে বলল: কিসের ভয়? কার ভয় রাণী? তুমি ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী।

গান্ধারী সভয়ে বলল: সব সময় সত্যি কথা বলতে নেই রাজা। মাঝে মাঝে মনের দিকেও তাকাতে হয়।

গান্ধারী চক্ষু আবৃত না থাকলে দেখতে পেত ধৃতরাষ্ট্র তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কাটার পর ধৃতরাষ্ট্র বলল: রাণী তোমার উদ্বেগের কোন মানে নেই। এই সিংহাসন ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ আমার। আমাদের

শিশুপুত্র হবে তার উত্তরাধিকার। এর মধ্যে পাণ্ডুপুত্রের কোন স্থান নেই। তার কথা ভাবাই মিথ্যে।

গান্ধারী দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল: তবু ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে তোমার অনুকূলে থাকছে না তার আঁচ পেলাম। ধাত্রী বলছিল, কুন্তীর আরো একটি ক্ষেত্রজ সন্তান আসন্ন। হয়ত সে ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে। রাজধানীতে খবর পৌঁছয়নি। পাণ্ডু পবনদেবকে এবার আহ্বান করেছে।

রাণী! এসবের অর্থ কি?

প্রতিশোধ! সিংহাসনে তার নিজের অথবা তার পুত্রের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পাণ্ডু এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। দেবতাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করে দেব-পুত্রদের সামনে রেখে সে এক অঘোষিত স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা করছে রাজ্যে, রাজপুরীর অভ্যন্তরে এবং রাজার মনোরাজ্যে।

রাণী, তোমার আশংকাকে অমূলক বলব এমন জোর নেই মনে। তবু সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল। আমি শীঘ্রই সভাসদবর্গের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে গোটা ব্যাপারটাকে জেনে নেব।

কয়েকদিন কাটতে না কাটতে এক অদ্ভুত আলোচনার ঝড় উঠল, দুর্যোগের দিনটির কোন অপব্যাখ্যা হতে পারে গান্ধারী বা ধৃতরাষ্ট্রের কেউ কল্পনা করেনি। অথচ বাস্তবে তাই ঘটল। রাজ্যে রাজপুরীর অভ্যন্তরে সর্বদা কারা যেন গোপনে বলাবলি করতে লাগল দুর্যোধন দুরাত্মা! পাপী! ঘোর কলি! তার আবির্ভাবে ধরণী খুশি হয়নি। চরাচর মেনে নেয়নি তার আগমনকে। তাই প্রকৃতির অভ্যন্তরে এক ভয়ংকর গোলমাল সুরু হয়েছিল। চৈত্রের নীল আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে গাছপালা সারি সারি ম্লানমুখে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাখিরা ভয়ে কর্কশস্বরে ডেকে উঠেছিল। পশুরা অসহায়ের মত ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল। নরাধম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে এক তাণ্ডব সৃষ্টি হল। আকাশ গর্জন করতে লাগল। বাতাস শাসাতে লাগল। বজ্রের ভীমপ্রহরণে ধরিত্রী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। দুর্যোধন পাপাত্মা বলে তার জন্মের নিমিত্ত এই সব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেল। এহেন শিশুপুত্র রাজ্যের পক্ষে ভয়ংকর বিপজ্জনক।

এরকম অদ্ভুত নিন্দায় ধৃতরাষ্ট্র বিস্মিত হল। অবোধ কঠিন গভীর এক ব্যথায় তার বুক টাটাতে লাগল। নিজের মনের কথা কাউকে বলতে পারছিল না, গান্ধারীকেও নয়।

ধৃতরাষ্ট্র ঘরে ঢুকলে গান্ধারীর বুকের ধকধকানিটা শুরু হয়ে যায় এক সময়! সে বেশ বুঝতে পারে ধৃতরাষ্ট্র কিছু বলতে চায়। এই ঘন ঘন আসাটা তার ভূমিকা। কিন্তু তার মায়ের অন্তর সেই নিষিদ্ধ কথা শুনতে যুগপৎ আতংক ও কষ্ট অনুভব করল। চুপ করে বসে থাকলে সে কষ্ট আরো গভীর হয়ে উঠে। অস্ফুট শব্দ বেরোয় মুখ দিয়ে।

ধৃতরাষ্ট্র শশব্যস্ত হয়ে উঠল। মিন মিন করে বিবর্ণ গলায় বলল: রাণী, কিসের কষ্ট তোমার?

গান্ধারী এই আচমকা কথায় সামান্য নাড়া খেয়ে বলল: স্বামী, কী সব শুনছি! তুমি বিশ্বাস কর।

গান্ধারীর চক্ষু আবরণী না থাকলে দেখতে পেত ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিতভাবে দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় ঘরময় পায়চারি করছিল। গান্ধারীর প্রশ্ন শুনে হঠাৎ সে টান টান হয়ে দাঁড়াল। মেরুদণ্ড সোজা করে গান্ধারীর মুখের উপর তার দৃষ্টিহীন চোখ রাখল। অনেক বড় একটা কিছুকে সে অনুভব করল। তার গায়ে কাঁটা দিল। গম্ভীর গলায় বলল: রাণী, পৃথিবীর সব শিশু নিষ্পাপ। নিরাবরণ দেহ সম্বল করে যে ভূমিষ্ঠ হল যার বোধ বুদ্ধি কিছুই বিকাশ হল না, যে সম্পূর্ণ অসহায় পরনির্ভরশীল, যার আত্মপর জ্ঞান পর্যন্ত বিকাশ হয়নি, জীবনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছাড়া অন্য কিছু যে জানে না সে কখনও পাপী বা দুরাত্মা হতে পারে না! তার বিরুদ্ধেই যখন এই অপপ্রচার তখন বুঝতে হবে এর পেছনে এক গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থ কাজ করছে। তোমার অনুমান সত্য। হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উপর পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের দাবিকে নিষ্কণ্টক করতে তারা এই অপপ্রচার করছে। দুর্যোধনের বর্জনের দাবি তাই একটা চক্রান্ত। ঐ চক্রান্তকে আর বাড়তে দেব না রাণী। যারা দুর্যোধনের নিন্দা করবে তারা হস্তিনাপুরের শত্রু। তাদের প্রত্যেককে কঠিন শাস্তি দেব। রসনা নির্মূল করব। প্রতিটি লোককে জানিয়ে দেব ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী দুর্যোধন। তার কপালে আছে জন্মগত রাজটীকা। দুর্যোধনের যে বিরুদ্ধাচারণ করবে আমি তাকে হত্যা করব। রাণী তুমি নিশ্চিন্ত হও। শকুনিও শীঘ্র ফিরছে। তারপর, হ্যাঁ, তারপরেই আমি চক্রান্তকে ছিন্নভিন্ন করে দেব।

গান্ধারী নিরুত্তর। আবছা ঘরে বহুক্ষণ বিবশ হয়ে রইল সে। বুকজোড়া তার ভয়, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, মাথায় এলোমেলো হাজার চিন্তা।

রাত গভীর। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। জল স্থল-অন্তরীক্ষ সব একাকার হয়ে গেছে।

অন্ধকারের ভেতর বিদুরের বাড়িটা ভূতুড়ে লাগছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে দ্বৈপায়নের খেয়াল হল রাত খুব বেশি। বিদুর হয়ত ঘুমোচ্ছে।

গা ছমছম পরিবেশ। দূরে শেয়ালেরা ডেকে উঠল হুকাহুয়া করে।

বিদুরের কুটীরের সামনে এসে দেখল প্রদীপ জ্বলছে ভিতরে। দরজার উপর কয়েকবার আস্তে করে টোকা দিল। তারপর একটু জোরে জোরে শব্দ করল। ভিতর থেকে বিদুরের গলা পেল।

টোকা শুনেই বিদুর টের পেয়েছিল দ্বৈপায়নের আগমন। ইতস্ততঃ না করেই দরজা খুলল। বলল : এস। এত রাতে কি মনে করে? কিছু হয়নি তো।

প্রদীপের আলো পড়েছিল বিদুরের আনন্দসুন্দর মুখের উপর। দ্বৈপায়ন মায়াবী চোখে তার দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। মৃদু কণ্ঠে বলল : তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই।

বিদুর নিজের প্রশ্নে লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে নিচের দাঁতের উপরের ঠোঁট কামড়ে বলল : আমাকে খবর পাঠালে না কেন?

দ্বৈপায়নের চোখের কোণে হাসি ঝিলিক মেরে গেল। বলল : ধৃতরাষ্ট্রের চররা চতুর্দিকে কড়া নজর রেখেছে। তোমাকে আমাকেও হয়ত চোখে চোখে রেখেছে। তাই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসতে হল। তোমার আমার দেখাশোনা যত না হয়, তত ভাল। শীঘ্রই দেশ পর্যটনে বার হব। অনেককাল আর দেখাশোনা হবে না। তাই যাত্রার পূর্বে কয়েকটা জরুরি কথা তোমাকে বলে যাব।

জানলার কাছে গিয়ে দ্বৈপায়ন কপাট বন্ধ করল। দরজার ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল। তারপর পলতে কমিয়ে প্রদীপের তেজ নিষ্প্রভ করল। ঘরে ছাইছাই অন্ধকার। কৃষ্ণবর্ণ দ্বৈপায়নকে সেই আবছা মৃদু অন্ধকারে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

বিদুর অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখল। দ্বৈপায়নের এ ধরনের অদ্ভুত আচরণ তার বোধগম্য হল না। মনের মধ্যে অনেক ওলটপালট প্রশ্ন জাগল। এই কুটির তার বাসগৃহ নয়। মাঝে মাঝে অবকাশ যাপন করতে এখানে আসে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের দিনগুলিতে পাহাড়ঘেরা নির্জন এই পরিবেশটি তার মনকে স্নিগ্ধ করে। তাই অবকাশের দিনগুলিতে কেউ আসে না এখানে। দ্বৈপায়নও এই নির্জন কুঠিতে কখনও পদার্পণ করেনি। তা-হলে কোন্ জরুরী প্রয়োজনে তাকে আসতে হল? অশুভ কোন খবর নেইত? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে বিদুর নির্নিমেষ চোখে চেয়ে ছিল দ্বৈপায়নের দিকে। বিদুরের মনে হল, দ্বৈপায়ন তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। খুব ধীরে ধীরে তার বাহ্যচেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার আগে সে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল : কী হয়েছে বল তো?

কুঞ্চিত ভুরু সটান হল দ্বৈপায়নের। একটু হাসল। বলল নিস্তব্ধ রাতে খুব মৃদুস্বরে কথোপকথনও অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। কথাবার্তায় সাবধান হওয়া ভাল। অসতর্কতার ফাঁক-ফুকুর দিয়ে বিপদ আসে। সব দিকেই চোখ রাখতে হবে।

বিদুরের চোখে-মুখে কেমন একটা ভয় ফুটে উঠল। দ্বৈপায়ন তীক্ষ্ণ চোখে বিদুরকে লক্ষ্য করছিল। আস্তে আস্তে বলল : তোমার ভেতর একটা অদ্ভুত শক্তি আছে যা সমস্ত রকমের বিরুদ্ধতাকে জয় করতে পারে, সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে পারে। আমি আজ সেই শক্তির প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

বিদুর উদাস গলায় বলল : তোমার আচরণ কথাবার্তা কেমন রহস্যময়। সেই

অবোধ রহস্যময় অনুভূতির কোন কিছু আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তুমি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

ব্যাসদেব হাসি হাসি মুখ করে বলল: বৎস, ধৃতরাষ্ট্রকে ধ্বংস করার শক্তি সৃষ্টি করতে হবে দেশের অভ্যন্তরে এবং রাজ্যের বাইরে। তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশ সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে অভ্যন্তর থেকে, শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, ধৃতরাষ্ট্রের মনের অভ্যন্তরে ও নিয়ে যেতে হবে এই সংঘাত। এই অসাধারণ কার্জটি করার শক্তি একমাত্র তোমার আছে। আমি জানি, তুমি পারবে।

বিদুর কি বলবে ভেবে পেল না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন মুখে ভাবল। তারপর স্পষ্ট করে দ্বৈপায়নের মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হয়ে বলল: কিন্তু। সংশয় কাটাতে কয়েক মুহূর্ত থামল। তারপর বলল: আমাকে ভুল বুঝ না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ অসহায়। আমি তার একমাত্র ভরসা। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি কেমন করে?

দ্বৈপায়ন হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসল। গভীর দৃষ্টিতে বিদুরের দিকে চেয়ে রইল। দ্বৈপায়নের দুই চোখে কৌতুক, মুখে চতুর হাসি। বলল: তুমি অভিনয়ে যেমন পটু বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত।

বিদুর ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল: একথা বলছ কেন?

দ্বৈপায়ন নিস্পৃহভাবে জবাব দিল: যা সত্যি বলে মনে হয়েছে তাই বলছি।

বিদুর একটু কুপিত হয়েই বলল: কথাটা ঠিক নয়।

দ্বৈপায়নের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এক ঐকতান সৃষ্টি হল মুহূর্তে। বলল: সত্যি তো তুমি ধর্মপ্রাণ। ধর্মে তোমার অনুরাগ শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসা অবিচল রাখতে ভীষ্ম তোমাকে আদর করে ধর্মপুত্র বলে, ধৃতরাষ্ট্র স্নেহবশে ধর্মরাজ বলে ডাকে। সুতরাং ধর্মের নামে ভণ্ডামি করার এতবড় সুযোগ হাতে পেয়ে কেউ ছেড়ে দেয়? ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে কি সুন্দর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছ শতশৃঙ্গ পর্বতে। সবাই জানে যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র। কিন্তু কোন্ ধর্মরাজ সে? সুমেরের, না হস্তিনাপুরের?

কথাটা শুনে বিদুর ভীষণ চমকে উঠল। ভেতরটা তার শীতের হাড় কাঁপুনি বাতাসের মত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। বিদুরের মুখ কাগজের মত সাদা। অবিশ্বাসভরা চোখে দ্বৈপায়নের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু তার প্রতিবাদ করার মত কোন শক্তি ছিল না। যা পাণ্ডু পর্যন্ত জানে না, তা দ্বৈপায়ন কেমন করে জানল? লজ্জায় বিদুরের কথা আটকে গেল। বড় একটা শ্বাস পড়ল ধীরে।

ফাঁদে পড়া পাখির মত অসহায় অবস্থা বিদুরের। দ্বৈপায়ন তীক্ষ্ণ চোখে বিদুরকে দেখে বুঝবার চেষ্টা করল। বিদুরের চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব দেখতে পেল। ওই চোখ তার গভীরভাবে চেনা। একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া যে তার ভিতর কাজ করছে এটুকু অনুমান করতে পারল দ্বৈপায়ন। তাকে দেখে বড় কষ্ট

হল। বিমর্ষ মুখখানার দিকে মায়াভরা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে নরম গলায় বলল : পুত্র, শতশৃঙ্গ পর্বতে ষোল বছর ধরে যে নাটকের মহড়া হল সে নাটক এবার হস্তিনাপুরের রাজগৃহেই হবে। পাণ্ডু এখন একা নয়। বান্ধবহীনও নয়। মিত্র শক্তির বাহুবল, লোকবল আছে তার পেছনে। দেব-নরপতির সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজ্য ও সিংহাসনের দাবি নিয়ে সে শীঘ্রই হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করবে। পঞ্চপুত্র এবং মহিষীদ্বয় ছাড়াও সঙ্গে থাকবে দেবলোকের কিছু ব্রাহ্মণ, ঋষি এবং দেব-প্রতিনিধি।

দ্বৈপায়ন দম নেবার জন্যে একটু থামল। বিস্ময়ে হতবাক হল বিদুর। দু'চোখের পলক পড়ে না তার। দ্বৈপায়নের দিকে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে থাকতে তার অভ্যন্তরটা কেঁপে গেল কয়েকবার। বুক ভরে সে স্বস্তির শ্বাস টানল।

বিদুরের দিকে চেয়েছিল দ্বৈপায়ন। গলার স্বর নরম করে প্রশ্ন করল : তুমি কিছু ভাবছ! তোমার কিছু করার আছে। কি করবে স্থির করেছ?

দ্বৈপায়নের কথাটা বিদুরের কানে ঢুকল, কিন্তু মগজে কোন ছাপ ফেলল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে বিদুর অস্থিরতায় মাথাটা নাড়ল। বলে উঠল : না, এই মুহূর্তে কিছু মনে পড়ছে না।

দ্বৈপায়ন বিদুরের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল : তোমার মনকে আমি চিনি। যত দিন যাবে তত বেশি করে ভাববে। দুশ্চিন্তাও বাড়বে। তবু স্থির করতে পারবে না তোমায় কর্তব্য। মাথা ঘামানোর দায়টা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু আদেশ আর নির্দেশ মেনে কাজ কর। তা-হলেই হবে।

বিদুর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। বড় চোখ দুটো দ্বৈপায়নের চোখে রাখল। তারপর স্ফুরিত অধরে একটু অভিমান প্রকাশ করে বলল : তা হলে শুধু সেটুকুই করব।

দ্বৈপায়ন একটু ক্ষীণ হেসে বলল : তুমি পাণ্ডবদের আপনজন। একেবারে ভেতরের লোক। যুধিষ্ঠিরের পিতা একথাটা ভুলে যেও না। তার পিতা হিসাবে তোমারও কিছু করণীয় আছে।

দ্বৈপায়নের কথা শুনে বিদুর অতিকষ্টে নিজের লজ্জাটা সামনে নিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার সারা শরীর ঘেমে উঠল। শ্বাস ছাড়তে গিয়ে টের পেল, শ্বাসের বাতাসটাও কেমন কেঁপে গেল।

দ্বৈপায়নের কিছুই দৃষ্টি এড়াল না। হাসি হাসি মুখ করে বলল : নেপথ্যের কুশীলব হয়ে তুমি ধৃতরাষ্ট্রের আত্মবিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হান। তার মনের শান্তি বিনাশ সাধনের ব্যবস্থা কর। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে দেশের অভ্যন্তরে ধৃতরাষ্ট্রের মনের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে হবে তার সংঘাতকে। সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেও।

সাত

শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে পাণ্ডু পাঁচ পুত্র, দুই মহিষী, কিছু দেব ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং দেবনরপতিদের রাজ-প্রতিনিধির সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে যাত্রা করল।

বসন্তকাল। প্রকৃতি রূপবাজোর রস বর্ণের পশরা মেলে দিয়েছে বনে বনে, গাছে গাছে, পাহাড়ে পাহাড়ে, নদীতে, ঝর্ণায়, আকাশে, প্রান্তরে, তৃণক্ষেত্রে। নীরব চাহনি মেলে যেন বসে আছে কোন অধরা রূপবতীর দিকে। মন ছুঁয়ে গেল পাণ্ডুর। দেহ-মনে একটা সুর বেজে উঠল। দু'চোখ ছেয়ে আসে অপূর্ব আবেশ। হৃদয়ের অভ্যন্তরটা অব্যক্ত আনন্দ উত্তেজনায় টলটল করে। জীবনের একটি পরমস্পর্শের স্বাদ যেন প্রকৃতি দিল তাকে। এমন করে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যকে হৃদয়ের মধ্যে আগে কখনও অনুভব করেনি।

শতশৃঙ্গ পর্বতে ষোলোটি বসন্ত সে কাটিয়েছে। সে সময় জীবনটা দুঃসহ বোঝায় ভার হয়ে উঠেছিল। কুন্তীই তার মনে জোর এনে দিত জীবনকে সয়ে নেবার। শুধু সয়ে নিতে নয়, ভালবাসতে। শতশৃঙ্গ পর্বতের নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবন সে ভালবেসেছিল, মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছিল তার ভেতর। কিন্তু আজকের মত এমন অন্তরভরা ভাল-লাগার প্রশান্তি কখনও অনুভব করেনি। এ অনুভূতি সম্পূর্ণ অভিনব আর নতুন স্বাদে ভরা।

পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়লে পাণ্ডুর লোকজন লোকালয়ের কাছে রাত কাটানোর এক শিবির প্রস্তুত করল।

বসন্তের আসন্ন সন্ধ্যায় এক আশ্চর্য মহিমা সৃষ্টি হল বনে—জঙ্গলে। ময়ূর-ময়ূরী ডাকল থেকে থেকে বনের ভেতর থেকে। নানা রকমের পাখির সম্মিলিত কাকলীতে কাকলী-মুখর হয়ে ছিল বন-বনান্তর। ঝিঁঝিঁও ডাকছিল নিরন্তর গাছ-গাছালির মধ্যে থেকে।

অন্ধকার গাঢ় হলে চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ঝলমল করতে লাগল। শিশির ভেজা বনে, প্রস্তরের গায় আলো যেন পিছলে পড়ল। গোটা অরণ্যভূমি যেন চাঁদের আলোয় হাসছিল।

পাণ্ডু সেই সাধারণ অথচ অসামান্য দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে নির্জন এক স্থানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ।

ঝর্ণার জলে মাদ্রী দেহটা ডুবিয়ে একটু স্নিগ্ধ করে নিল। পাণ্ডু পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মাদ্রীর নিরাবরণ শরীরের আশ্চর্য সুন্দর গড়ন। চাঁদের আলোয় তাকে অপরূপ লাগছিল। একটা শিলার উপর হাঁটু দুটি বুকের কাছে মুড়ে স্তনদ্বয় ঢেকে

মাদ্রী গা মুছতে লাগল, তার কোমল স্পন্দিত বুকের মধ্যে পেলব ভাঁজটি দেখা যাচ্ছিল। তার সুন্দর গ্রীবা, কণ্ঠার হার, তার কালো চোখের কটাক্ষ, অধরে আশ্চর্য হাসির আভাস —সব মিলিয়ে এক দুর্নিবার মোহ তাকে মাদ্রীর দিকে টানছিল। সমস্ত সত্তা দিয়ে মাদ্রীর দিকে চেয়েছিল। পাণ্ডুর শরীর-মন বিদ্যুৎ চমকের মত চমকে উঠল, জ্বলে উঠল। একটা দারুণ পিপাসা বহুগুণ হয়ে উঠল তার ভেতর। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। পতঙ্গের মত আগুনের দিকেই সে এগিয়ে যাচ্ছিল। উত্তেজনায় কাঁপছিল তার শরীর। হঠাৎ নেশার মত কেমন একটা অবসন্নভাব হল। পাণ্ডু বেশ অনুভব করল, তার পায়ের তলার মাটি দুলছে। চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ হলুদ ফুল ফুটেছে। চেতনার সীমানায় সব কেমন নিমেষে গুলিয়ে যাচ্ছে। তার পরেই হঠাৎ দেহটা ধপ করে মাটিতে ঢলে পড়ল।

অকস্মাৎ চমকে উঠল মাদ্রী। সমস্ত মুগ্ধতা কেটে গেল একটা বুক কাঁপানো চিৎকারে। সে চিৎকার মাদ্রীর বুকের পাঁজরে পাঁজরে চমক তোলে। পাগলের মত তর তর করে নীচে থেকে উপরে এল। নিথর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। তার সে ভয়ার্ত চিৎকারে অন্ধকার শিহরিত হল। অনেকক্ষণ কাঁপতে থাকল পাতায় পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে, পাথরে পাথরে।

মাদ্রীর গলার স্বর কুন্তীর বুকের মধ্যে, সমস্ত বোধ ও চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। টুকরো টুকরো হয়ে মিশে গেল তার ভাবনায়, আশঙ্কায়! উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পঞ্চপুত্রের সঙ্গে কুন্তী শিবির থেকে বেরিয়ে এল।

হস্তিনাপুরের পথে পাণ্ডু যে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল, এ সংবাদ ব্যাসদেবের কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হল না। একটা দূরত্ব রচনা করে ব্যাসদেব পচ্ছন্নভাবে তাদের সঙ্গে অবস্থান করছিল। কুন্তী, মাদ্রী, পাণ্ডু এবং তাদের লোকজনের তা জানা ছিল না।

পাণ্ডুর মৃত্যু সংবাদ অকস্মাৎ ব্যাসদেবকে স্তব্ধ করে দিল। এত বড় শূন্যতা সে আগে কখনো অনুভব করেনি। সংবাদ পেয়ে যে তাকে দেখতে যাওয়া সেই শক্তি পর্যন্ত তার দেহে ছিল না। প্রবল নৈরাশ্যে হতাশায় তার জড়বৎ দেহটি এক প্রবল সম্মোহনে তাকে আটকে রেখেছিল। নিরাশ হওয়ার ঘটনা তার কাছে কিছু নতুন নয়। পিতার আশ্রমে সহপাঠীরা তাকে হতাশ করেছিল। স্বপ্ন, কল্পনা প্রথম আঘাত খেল আশ্রমের মুনি-ঋষিদের প্রবল ঈর্ষা ও শত্রুতায়, অম্বালিকার ঘৃণায় প্রত্যাখানে, অম্বিকার অসহায় আত্মসমর্পণে, ভীষ্মের নিঃশব্দ বৈরীতায়, ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতায়। কিন্তু দৈব কখনও বিরূপ হয়নি তার প্রতি। আজ সর্বপ্রথম মনে হল বিধাতা যেন তার

বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্তে-লিপ্ত আছে। তা না হলে শতশৃঙ্গ পর্বতের নাটকের শ্বাসরোধকারী উত্তেজনার এক চূড়ান্ত মুহূর্তের উপর অকস্মাৎ যবনিকাপাত পড়বে কেন?

ব্যাসদেবের বুকে এক প্রগাঢ় যন্ত্রণা থাবা গেড়ে বসল। মৃত্যু মানে কি স্তব্ধতা? পরিচয়হীনতা? কিংবা পরিজনহীনতা? পাণ্ডুর দেহ কিংবা অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে পঞ্চপাণ্ডবের অস্তিত্ব কেমন করে প্রমাণিত হবে? এরা যে পাণ্ডুর ইচ্ছায়, সম্মতিতে কুন্তী, মাদ্রী গর্ভে হয়েছে—এ স্বীকারোক্তি কে করবে? কি করেই বা তারা প্রমাণ দেবে?

পাণ্ডুর নশ্বর দেহ একটু পরে অগ্নিতে সমর্পণ হবে! তারপর সব চিহ্ন মুছে যাবে। তখন ওই মানুষটির স্ত্রী কে? পুত্র কারা? রাজ্য-সিংহাসনের কেন ভাগ পাবে তারা এসব জটিল কূট প্রশ্নের কি প্রমাণ আর জবাব দেবে কুন্তী বা তার সঙ্গীরা।

ব্যাসদেব পায়ের নীচে মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পেল। আসলে সেটা কোন ভূমিকম্প নয়, তার নিজের শরীরের এক অপ্রতিরোধ্য দুর্বলতাজনিত কম্পন। যা তার সমস্ত সত্তার ভেতর এক তীব্র হতাশায় আর নৈরাশ্যে সম্মোহিতের মত থরথর করে কাঁপছিল।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সে পথে পা বাড়াল। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নিশান্তের ঘন অন্ধকার নামল চতুর্দিকে। রহস্যময় এক স্বর্গীয় আলোর আভা জাগল আকাশে। ভূতুরে ছায়াগুলো ধীরে ধীরে অপসারিত হল। পাখির ডাকে সূর্যের আলো ফুটল। সরস্বতীর বুক থেকে হু হু করে উত্তরের হিমেল হাওয়া এল। ব্যাসদেবের খোলা চুল হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল। বুকের ভেতর আগের ভারটা আর নেই। মাথাটাও বেশ হালকা বোধ হল।

ব্যাসদেব যখন শিবিরে পেঁছল তখন চারদিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছিল। পাণ্ডুর শবের উপর মাদ্রী মূর্ছিতা। কুন্তী পাণ্ডুর পদপ্রান্তে নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ব্যাসদেবকে দেখে করুণ সুরে কেঁদে উঠল। আর পঞ্চপাণ্ডব নিষ্প্রাণ পিতার শবদেহের দিকে সাশ্রুনয়নে তাকিয়ে ছিল। তাদের অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে জায়গাটি বিষণ্ণ হয়েছিল।

পাণ্ডুর সেই ফর্সা সুন্দর দেহটির দশা দেখে ব্যাসদেবের অনুভূতির ভেতর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল। বুকটার ভেতর কেমন উথলে উঠার ভাব হল। পাণ্ডুর অনস্তিত্বেই প্রশ্নটি হঠাৎ প্রবলভাবে তার মনকে নাড়া দিল। মানুষের এই দেহটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তার অস্তিত্ব। শকুন্তলার আংটির গল্পের মত। শকুন্তলার আংটি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সবাই তাকে চিনবে, মানবে, ভয় করবে, শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু একবার আংটি হারাল তো সব পরিচয় গেল। শকুন্তলার আংটির মতো মূল্যবান অভিজ্ঞান পাণ্ডর ঐ নশ্বর দেহ। যতক্ষণ তার নিষ্প্রাণ দেহটা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার

একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে। ঐ দেহ একবার অগ্নিতে সমর্পিত হলে তাংটি হারানোর দশা হবে পাণ্ডবদের। তারা যে সত্যি পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র একথা বিশ্বাস করানো শক্ত হবে। দেহ দাহন করার অর্থ বিশ্বাস নষ্ট হওয়া। সুতরাং, পাণ্ডুর শব রাজধানী হস্তিনাপুরে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মনে মনে।

পাণ্ডুর সহযাত্রী ব্রাহ্মণ, ঋষি এবং দেব প্রতিনিধিদের ব্যাসদেব বোঝাল, পাণ্ডুর মৃতদেহ এখানে সৎকার নয়। রাজধানী হস্তিনাপুরে এই শবদেহ তাদের বহন করে নিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানেই তার শবদেহ ভূতপূর্ব নরপতিদের মত রাজকীয়ভাবে সৎকার করা নিয়ম।

সকলে ব্যাসদেবের কথা একবাক্যে অনুমোদন করল। কিন্তু হস্তিনাপুর পৌঁছতে এখনও দু'দিন লাগবে! এই সময়ের মধ্যে শরীরে পচন দেখা দেবে, বিকৃতি ঘটবে এবং দুর্গন্ধ বেরোবে।

দ্বৈপায়ন প্রত্যুত্তরে বলল: শব সংরক্ষণের আরক প্রস্তুত প্রণালী এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি আমি জানি। আরকের মধ্যে মৃতের শরীর রাখলে অবিকৃত থাকবে। তোমরাও নির্ভাবনায় হস্তিনাপুরে যেতে পারবে।

দীর্ঘ দেড় যুগ পর পাণ্ডু হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করল। কিন্তু জীবিত নয়; মৃত। তার দেবতুল্য পঞ্চপুত্র এবং মহিষীদ্বয় মৃত পাণ্ডুর মরদেহ নিয়ে হস্তিনাপুরে আসছে এই সংবাদটা ব্যাসদেব কৌশলে রটিয়ে দিল। মুখে মুখে সে কথা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র হস্তিনাপুরে এবং তার পাশাপাশি অঞ্চলে।

ভোরের আলো ফোটার বহু আগে থেকে দলে দলে লোক চলল রাজবাড়ির অভিমুখে। সকাল থেকে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে লোক জড় হতে লাগল! বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ বাড়ির চত্বর ছাপিয়ে রাজপথে গিয়ে পড়ল সে ভীড়। পাণ্ডু পুত্রদের নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অজ্ঞ, মূর্খ জনগণ বিচার না করেই বিশ্বাস করল: পাণ্ডুর মহিষীদ্বয় এক অলৌকিক মন্ত্রবলে দেবপুত্র লাভ করেছে। তাদের গড়ন অত্যন্ত সুন্দর। ভারী মিষ্টি চেহারা। মুখ দিয়ে তাদের জ্যোতি বেরোচ্ছে। আগুনের মত নাকি তাদের রূপ। চোখ দুটি এত অপরূপ যে, একবার তাকালে আর ফেরানো যায় না, আঠার মত আটকে থাকে। কথাও নাকি সাধারণ মানুষের মত নয়। এরা নাকি জন্মেছে পৃথিবী থেকে মানুষের ভেদাভেদ বৈষম্য দূর করতে। এ পৃথিবীটা মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য ঈশ্বর তাদের অংশে জন্মেছে। ভীড়ের ভেতর কথাগুলো সত্য-মিথ্যা যাচাই করার মত কেউ ছিল না। নির্বিবাদে এর ওর মুখে কথাগুলো ফুলে ফেঁপে পাণ্ডুপুত্রেরা

এক অসাধারণ আশ্চর্য মানুষ হয়ে উঠল। জনতা এখন দেবতুল্য পঞ্চপাণ্ডবকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। উৎকর্ণ আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে তারা প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পাণ্ডুর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে রাজসভা স্তব্ধ। সূচীপাতের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে অত্যন্ত বিমর্ষ ও গম্ভীর। ভীষ্ম তার পাশের আসনে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছিল—অতঃ কিম্? কণিক, শকুনি উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৌন হয়ে থাকল। গোটা রাজসভা শোকের সৌজন্য সূচক স্তব্ধতায় থমথম করছিল।

ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। কাঁটা বিঁধলে যেমন অস্বস্তি ও যন্ত্রণা হয়, অনুরূপে একটা কষ্টের ভার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল। এই কষ্টের কোন বেদনা ছিল না। কেবল একটা তীব্র জ্বালা ছিল।

দুঃসংবাদ ভীষ্মকে কাতর করল। তার মুখখানি বিমর্ষ ও মলিন লাগল। ভুরু কিছু কুঞ্চিত, মুখে যথাযথ উদ্বেগ। পাণ্ডুর মৃত্যু সংবাদের আচ্ছন্নতা অনেকক্ষণ তাকে গভীর শোকে জড়বৎ করে রাখল।

ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ রব উঠল 'ঐ আসছে ঐ আসছে'। কৌতূহলী জনতার মুখে সেই সাগর কল্লোলবৎ স্বরধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত শোনা গেল। রাজসভাতেও তার ধাক্কা এসে লাগল। অমনি একজন ব্যজনরত পরিচারিকা সরু স্বরে কেঁদে উঠে ভিতর বাড়িতে ছুটে গেল। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র শকুনি মুখ তুলে তাকাল। কণিক ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে শকুনিকে কি যেন ইঙ্গিত করল।

পরিচারিকার কান্নায় স্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হল। বুক কাঁপিয়ে ভীষ্মের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল! শ্বাসের সঙ্গে অনেকখানি জমা বেদনা, দুঃখ বেরিয়ে গেল। বুকের ভার হাল্কা হল। গম্ভীর গলায় ভীষ্ম বলল: বৎস ধৃতরাষ্ট্র, এরকম একটা গভীর দুঃখের মুহূর্তে আমাদের কথাবার্তা, আচরণ খুব নম্র এবং আন্তরিক হওয়া দরকার। পাণ্ডু মহিষীদ্বয় এই পরিবার ও বংশের বধূ। তারা এখন শোকার্ত! তাদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি এবং সমবেদনা থাকা দরকার। উদার পুরুবংশের কোন নিন্দা, দুর্নাম হয় এমন কাজ আমরা কেউ করব না। শোনা যাচ্ছে, এঁদের সঙ্গে বাইরের দেশের গণ্যমান্য ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেব-প্রতিনিধিরা আছেন। বিপন্ন পরিবারের বন্ধু হয়ে এঁরা সাহায্য করতে এসেছেন। এঁদের সামনে আমরা যেন পারিবারিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার না হই! এই সব অতিথিদের আদর যত্ন, আপ্যায়নের কোন ত্রুটি না হয় তাও দেখতে হবে। আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে, পাণ্ডুপুত্রদের সম্পর্কে আমাদের যে সংশয়, অভিযোগ এবং প্রতিবাদ থাকুক না কেন; এখন যেন তা প্রকাশ না পায়। এদের কোন দুঃখ, ব্যথা কিংবা মনস্তাপ আমরা দেব না। বৎস ধৃতরাষ্ট্র, দেশ-বিদেশের মানুষের চোখে এবং আমাদের এক পরমাত্মীয়ের কাছে কঠিন পরীক্ষা দেবার দিন আজ। সহিষ্ণুতার

মূল্যে এই সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার শপথ আমরা নিলাম। জয় হোক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের।

কেউ কোন কথা বলল না। মনে হল গভীর বিষাদে ও শোকে থমকে আছে রাজসভা। নিস্তব্ধতা রাজসভায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিরাজ করল। অনেকগুলি ভারী নিঃশ্বাসপতনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর বিদুর কপট গম্ভীর গলায় বলল : পিতৃব্যের ইংগিত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। আমিও অবাক হচ্ছি, কোন্ জাদুবলে রাতারাতি এতবড় একটা জনসমাবেশ করা সম্ভব হল? এ কি নিছক জনতার কৌতূহল, না পাণ্ডুর প্রতি তাদের আন্তরিক ভালবাসা ও সমর্থন? পাণ্ডু দীর্ঘ আঠারো বছর রাজধানীতে নেই, তবু এই গণসমর্থন তার পক্ষে থাকল কেমন করে? প্রাজ্ঞ পিতৃব্য আভাসে ইঙ্গিতে এই বিপুল জনতার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নানারকম আশংকা করছেন। পাণ্ডুপুত্রদের প্রত্যাগমন জনতার ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দেবার মতো হতে পারে। আমারও বিশ্বাস, জনতার আবেগে আঘাত লাগলে তারা আগুনের মত জ্বলে উঠবে। পাণ্ডুর মরদেহ যতক্ষণ চোখের সামনে থাকবে ততক্ষণ জনতার আবেগ শেষ হবে না। সমস্ত রকমের বিরূপতাকে জয় করতে এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জ্যেষ্ঠের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিতে হলে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রদের আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। শুধু আজ নয়, চিরকাল! কয়েকজন দেব-প্রতিনিধির উপস্থিতিকে আমি ভাল চোখে দেখছি না।

কণিক বেশ কয়েকবার মাথা নেড়ে বিদুরের বাক্য সমর্থন করে বলল : মহামাত্য বিদুরের অনুমানে একটা রাজনৈতিক দিক আছে। পাণ্ডুপুত্রেরা এখন আর একা কিংবা অসহায় নয়। তারা দেবতাদের পুত্র। তাদের পিছনে দেবনায়কদের বিপুল সমর্থন আছে। এই কথাটা জানান দেবার জন্যেই তাদের সঙ্গে দেব-প্রতিনিধিরা আসছে। এটা আমাদের উপর একটা পরোক্ষ রাজনৈতিক চাপ।

ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাল। একটা ভয় তার মাথায় থাবা গেড়ে বসল। স্পষ্ট, পরিষ্কার ভবিষ্যতের কোন ছবি সে চিন্তা করতে পারছিল না। সিংহাসনের পশ্চাতে পিঠ দিয়ে সে যেন শরীরের ভর রক্ষা করছিল। তার চোখ বোজা। চোখের পাতায় ক্লান্ত অবসন্নতার একটা নীল ছোপ পড়েছিল। ঠোঁট দুটি শুকনো। দৃশ্যটা দেখে শকুনির ভিতরটা টাটাতে লাগল।

শকুনি সন্দেহের গলায় কণিকের কথার উত্তর দিল। ধীরে ধীরে বলল : তার মানে, ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরে তাদের স্থান না দিলে তারা দেব শিবিরের সাহায্য চাইবে। দেব-প্রতিনিধিরা তাদের হিতৈষী সেজে সমস্ত ব্যাপারটা সরজমিনে তদন্ত করতে এসেছে। এর অর্থ একটা রাজনৈতিক গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলা। এটা খুবই আশংকার কথা। তবু, এই ভয় দেখানো রাজনীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। এই ধরনের রাজনীতির

ফাঁদে পা দিলে আমরা তাদের নিত্য নতুন দাবি পূরণ করতে করতে দেউল হয়ে যাব। রাজনীতিতে আবেগের কোন স্থান নেই।

ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ বলল: তোমার কথা সত্য। কিন্তু এখনি ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে জিতবার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হবে। রাজনীতিতে কৌশলটাই মুখ্য কথা। জয়ের জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হয়।

ভীষ্মের কথায় ধৃতরাষ্ট্র যেমন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কথা বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও যেন অনেকখানি বেরিয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বলল: শকুনি, পিতৃব্য ঠিকই বলেছেন। এ-লড়াইয়ে জিতবার জন্যে আমরা পরে ছল, চাতুরী, কূটনীতি, শঠতা সব কিছুর আশ্রয় করতে পারব। আমাদের কাজকর্ম এখনও নিশ্ছিদ্র নয়। ঘটনার আকস্মিকতায় যা ঘটল, তার দিকে তাকালে বড় বড় ফাঁক আর ফাঁকি চোখে পড়ে। এই মুহূর্তে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে তার চেহারা খুঁজে বার করার অবকাশ পাব না। প্রদীপের আলো যখন কমে আসে তখন নতুন তেল না হলে সে আর জ্বলে না। এই জ্ঞানটুকু না থাকলে রাজনৈতিক হঠকারিতা শুধু ধ্বংস ডেকে আনে। তারপর বিদুরের দিকে তাকিয়ে বলল: বিদুর! সমস্যা এমন জটিল হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। কৌশলগত এই পরাজয় আমাকে মেনে নিতে হল। এখন যা যা করলে হস্তিনাপুরের পারিবারিক সম্মান এবং রাজনৈতিক গৌরব বৃদ্ধি পায় তুমি তার আয়োজন কর। পাণ্ডুর মরদেহ রাজনৈতিক মর্যাদায় সৎকার কর। পারলৌকিক ক্রিয়াও সেইভাবে কর।

পাণ্ডুর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মে যোগ দিতে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এসেছিল। বেশ কিছুদিন হস্তিনাপুরের অতিথি গৃহে কাটিয়ে ব্যাসদেব প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হল। বিদায় নিতে জননী সত্যবতীর গৃহে প্রবেশ করল।

স্তব্ধ কক্ষ।

সত্যবতী দুই আঁখি মুদিত করে একমনে প্রাতঃ আহ্নিক করছিল। ব্যাসের আগমন টের পেয়েও তার দিকে ফিরে তাকিয়ে আহ্নিকের ব্যাঘাত করল না। কিন্তু তার সমস্ত শরীরটা পলকের জন্যে কেঁপে গেল। তাড়াতাড়ি আহ্নিক শেষ করে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ইষ্টকে প্রণাম করল।

জননীর শান্ত পবিত্র মুখশ্রীর স্নিগ্ধ মাধুর্য দেখে ব্যাসদেবের হৃদয় ভরে গেল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে জননীর দিকে চেয়ে রইল। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করল না।

আহ্নিক শেষ করে সত্যবতী ব্যাসদেবের স্বপ্নাতুর চোখের দিকে তাকিয়ে অবরুদ্ধ গলায় অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল: পুত্র, শুনলাম তুমি আজই হস্তিনাপুর ছেড়ে যাচ্ছ।

ব্যাসদেব সত্যবতীর চোখে চোখ রেখে বলল : যেতে ত হবেই। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে যেতে পারি ততই মঙ্গল।

সত্যবতী চমকাল। আশংকা ও উদ্বেগে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করল : কেন? কি হল আবার?

ভিতর ভিতর ব্যাসদেবের অস্থিরতার একটা ঢেউ বয়ে গেল। তার সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে বুকের ভেতর নানা মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া টের পেল। ক্ষণিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বলল : হয়নি, তবে শীঘ্রই হবে।

উৎকণ্ঠায় সত্যবতীর বুক শুকিয়ে গেল। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা নিবিড় হল। বিভ্রান্ত গলায় সত্যবতী বলল : পান্ডুপুত্ররা এখানে ভালই আছে। তাদের কোন অযত্ন হচ্ছে না। অল্পদিনের মধ্যে তারা সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে। হবেই-বা না কেন? ছেলেগুলো শান্ত, নম্র, বিনয়ী আর মিষ্টভাষী বলেই বোধ হয় চুম্বকের মত সকলকে আকর্ষণ করে। গুরুজনদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগের কোন তুলনা নেই। তারা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নয়নমণি। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ আর পান্ডুপুত্ররা তো হরিহর আত্মা। কেউ কারো বিচ্ছেদ একদন্ড সইতে পারে না। এক বৃন্তে যেন দুটি কুসুম পান্ডব আর কৌরব। ভাই-ভাইয়ে এই সদ্ভাব দেখে আমার বুক জুড়িয়ে যায়। হস্তিনাপুরে আজ স্বর্গের সুখ নেমে এসেছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যেন এই অনাবিল সুখ, শান্তি আর প্রসন্নতা দেখে যেতে পারি।

ব্যাসদেবের অধরে বাঁকা হাসি। চোখে কৌতুক। মৃদু স্বরে বলল : মা, ফুলে শুধু মধু থাকে না, কীটও থাকে। এখন এরা ছোট। যুধিষ্ঠিরের বয়স পনেরো আর দুর্যোধনের বয়স তেরো। স্বার্থ নিয়ে কোন কোন্দল নেই তাদের মধ্যে। কিছুদিনের মধ্যে রাজপুত্রদের বিদ্যাশিক্ষা এবং অস্ত্রশিক্ষা শুরু হবে। যোগ্যতা, পারদর্শিতা কার কত বেশী তা নিয়ে প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি দেখা দেবে তখন। সেদিন যারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে তাদের অন্তরের বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষার এই মধুর প্রীতির সম্পর্ক হয়ত বিষিয়ে উঠতে পারে। পরিবারের স্বাস্থ্যভঙ্গের সূচনা হবে সেদিন থেকে। তারপরেই সিংহাসনের দাবি এবং সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে ভাই-ভাইয়ে বিবাদ, বিরোধ-রেষারেষি যে উত্তাল হয়ে উঠবে না কে বলতে পারে? হস্তিনাপুরের পারিবারিক আবহাওয়া পান্ডব কৌরবের বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে যদি তপ্ত হয়ে উঠে তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এর ফলে, আরম্ভ হতে পারে এক নতুন সংঘাত। কোন প্রতিবেশী কিংবা বিদেশীর সঙ্গে এ সংঘাত নয়। এ হল অধিকারের দ্বন্দ্ব, এবং ক্ষমতা ও দাবির লড়াই। নিজেদের মধ্যে এক পরিবারের সঙ্গে আর এক পরিবারের। ভাই-ভাইয়ে। এর উত্তাপ পরিবারের অভ্যন্তরে যে ছড়িয়ে যাবে না, কে বলতে পারে। একপক্ষের সঙ্গে

আর এক পক্ষের হয়ত বিরোধ বাধতে পারে। এ বিরোধ বন্ধুতে বন্ধুতে, সহকর্মীর সঙ্গে সহকর্মীর। এই আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে এই পরিবারকে, বংশকে বাঁচানোর কোন রাস্তাই বোধহয় খোলা থাকবে না। দু'পক্ষই জিতবার জন্যে মনের গোপনে অন্ধকারে হিংসার ছুরিতে শান দেবে।

সত্যবতীর মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। উদ্গত নিঃশ্বাস সহসা যেন বুকের খাঁচায় আটকে রইল। ব্যথায় টাটিয়ে উঠল। কান্না পেল। কান্না গিলে গিলে ... বটে ব্যাকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলল : পুত্র, অমন করে অমঙ্গলের স্বপ্ন দেখতে নেই। আমার ভয় করছে।

ব্যাসদেবের দুই চোখ জলন্ত ঘৃণায় চক চক করে উঠল। বলল : দম্ভ, ঘৃণা, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতার দাম না দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজত্ব করছে, মহাকাল সেই রাজত্ব করার দাম যে তার কাছ থেকে সুদ সমেত আদায় করে নিতে চায়, মা।

ব্যাসদেবের বাক্যে শান্ত নিথর স্তব্ধতাও কেঁপে উঠল। সত্যবতীর দুই চোখে কেমন একটা নিবিড় ব্যথা ফুটে উঠল। ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর শঙ্কিত গলায় বলল : পুত্র, আমি মন্দভাগিনী। জীবনে অনেক শোক, দুঃখ, তাপ কষ্ট ভোগ করেছি। এই সুখের, শান্তির স্মৃতিটুকু নিয়ে আমি যেন মরতে পারি। অমঙ্গল, অকল্যাণ সূচনার আগে তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

ব্যাসদেব অন্তহীন বিস্ময় নিয়ে জননীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সত্যবতীকে হস্তিনাপুর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার মতলব নিয়েই সে এসেছিল। কেন না, সত্যবতীর মনোভাব এখন বার্ধক্যের জন্যে একটু একটু করে যেন বদলাচ্ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সব মানুষের অন্তরটা ক্ষমায় স্নিগ্ধ হয়ে থাকে। নিরাবেগ চিত্তে সব কিছুকে নির্বিকারভাবে গ্রহণ করে। অশান্তি বিরোধের ভেতর ক্লান্তি অনুভব করে। পারিবারিক ছোট ছোট সুখ, আনন্দ আর শান্তি তার কামনা হয়। কিন্তু আগামী দিনগুলিতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অশান্তি, বিশৃংখলা, উত্তেজনা সংকট সত্যবতীর সুখ-শান্তি এবং প্রত্যাশার ব্যাঘাত জন্মাবে। তাই বাকী দিনগুলো যাতে ঈশ্বর চিন্তায় কাটে, সেজন্য তাকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সে কাজটা এত সহজে এবং অনায়াসে হবে ব্যাসদেব ভাবতে পারেনি। মায়ামোহ মানুষের জন্মগত। বিশেষ করে নারী জাতির মায়ামোহ কিছুতে কাটতে চায় না। কিন্তু দৈব তাকে ত্যাগের জন্যে উন্মুখ করে রেখেছিল। ব্যাসদেবের ইচ্ছাটাই দৈব কেবল মুখ দিয়ে কবুল করল।

আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ব্যাসদেবের অন্তরটা টৈটম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। স্বপ্নাতুর দুই চোখে কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাব তার। অম্বিকার ঘৃণাভরা মুখখানা একবার মনে পড়ল। তার কথাগুলো বুকের ভেতর ঝংকারে বেজে গেল। আশ্চর্য লাগল ব্যাসদেবের। কতকাল হল, তবু সেই অপমানটা তার বুকের ভেতর থাবা গেড়ে আছে।

ব্যাসদেবকে নীরব দেখে সত্যবতী পুনরায় বলল : পুত্র, তুমি আমার ইহকাল, পরকাল। তুমি ছাড়া আমার কে আছে? বৃদ্ধ বয়সে আমাকে একটু শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

ব্যাসদেব ভীষণ চমকে উঠল। তার দৃষ্টিটা খুব করুণ দেখাল। তার মুগ্ধ দুটি চোখ সত্যবতীর চোখের উপর রাখল। ধীরে ধীরে বলল: সেই ভাল জননী। স্বীয় বংশের বিনাশ দেখার চেয়ে বনে বাস করা অনেক ভাল। অরণ্য কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সে সর্বজীবের আশ্রয়। অরণ্যে কোন দুঃখ নেই। অনাবিল সুখ, শান্তি, আনন্দের জন্য, তোমাকে আমি অরণ্যঘেরা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বদরিকাশ্রমে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে।

দ্বৈপায়নের আশংকা সত্য হল। রাজপরিবারের অভ্যন্তরে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে অচিরেই এক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হল। পাণ্ডু পুত্রদের বিনয়ী, নম্র, শান্ত উদার ও সহিষ্ণু মনোভাবের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদের গর্বিত, উদ্ধত প্রকৃতি ও স্বভাবের এমন এক বৈষম্য ছিল যা ধার্তরাষ্ট্রদের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। পাণ্ডু পুত্রদের জনপ্রিয়তা এবং লোকরঞ্জনী ক্ষমতা তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করল তা কালক্রমে প্রকাশ্য রেষারেষি ও সংঘাতে গিয়ে দাঁড়াল। ভ্রাতৃপ্রেমের বিদ্বেষের হলাহল থেকে উদ্ভূত হল পাণ্ডব ও কৌরব নামে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর।

হস্তিনাপুরের প্রাসাদে পাণ্ডবেরা যে অত্যন্ত অসহায় বিপন্ন এবং আত্মীয় ও বান্ধবহীন এরকম একটা ধারণা লোকের মনে এবং পাণ্ডু পুত্রদের অন্তরে সৃষ্টি করার জন্যেই বিদুর গোপনে দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ ভ্রাতাদের ক্রীড়াঙ্গনে পাণ্ডবদের উপর নানারকম নিগ্রহ লাঞ্ছনায় উৎসাহ দিল।

পিতৃহীন অনার্য পাণ্ডুপুত্রেরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অবাঞ্ছিত বলেই পুত্রদের দিয়ে নানারকম অত্যাচার করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। দুর্যোধনের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্যেই এসব করছেন ধৃতরাষ্ট্র, এরকম একটা কানাঘুষা সর্বত্র হতে লাগল।

হস্তিনাপুরের প্রাসাদ অভ্যন্তরে আরম্ভ হল এক নতুন সংগ্রাম। ভাই-ভাইয়ে বিরোধ। ক্রীড়াচ্ছলে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ ও সংঘর্ষ থেকে গৃহ বিবাদের আগুন জ্বলে উঠুক এটাই বিদুরের ইচ্ছা।

পাণ্ডু পুত্রদের মধ্যে ভীম ছিল বলশালী। তাকে দিয়ে বিদুর, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ ভ্রাতাদের মনে পঞ্চ-পাণ্ডব সম্পর্কে এক আতঙ্ক উদ্রেক করল। ক্রীড়াচ্ছলে ভীম ধার্তরাষ্ট্রদের উপর নানারকম নির্যাতন এবং পীড়ন চালাতে লাগল। কাউকে হয়ত কেশ ধরে এমন টান দিল যে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে থাকল। হাত-পা কেটে হয়ত রক্তারক্তি হল। ভীম ধার্তরাষ্ট্রদের এক আতঙ্ক হয়ে উঠল। অবশেষে এমন দাঁড়াল যে সমবয়সী দুর্যোধনও তাকে দেখে ভীত হত।

ভীমের দৌরাত্ম্য নিবারণের কোন চেষ্টা করল না কুন্তী। বরং তাকে প্রশ্রয় দিয়ে, প্রশংসা করে ইন্ধন দিতে লাগল। পাণ্ডুপুত্রদের এই উৎপাত দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ ও উত্তেজিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র তাদের শাসন করুক, তিরস্কার ভৎর্সনা করুক, প্রহার করুক—এটাই ছিল বিদুরের অভিপ্রায়। তাহলে ধৃতরাষ্ট্রবিরোধী প্রচারে কিছু সুবিধা হয়।

এদিকে ক্ষুব্ধ ধার্তরাষ্ট্রেরা তাদের উপর ভীমের অত্যাচার স্তব্ধ করার জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে ভীমকে কৌশলে রজ্জুবদ্ধ করে নিদ্রিত অবস্থায় সরোবরে নিক্ষেপ করল। দৈবক্রমে ভীম অবশ্য রক্ষা পেল। কিন্তু লোকের মুখে সে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। ধৃতরাষ্ট্রের কানেও সে সংবাদ পৌঁছল; কিন্তু অন্ধস্নেহে কিছু করল না এবং বলল না পুত্রদের।

কিন্তু বাইরে প্রচার হয়ে গেল দুর্যোধন সিংহাসনের দাবিকে নিষ্কণ্টক করার অভিপ্রায়ে গোপনে এবং কৌশলে ভীমকে গুপ্তভাবে হত্যা করে পাণ্ডবদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার ফন্দী করেছে। পাণ্ডবেরা শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে রাজপ্রাসাদে বাস করছে। সেখানে তারা বিপন্ন অসহায়, আত্মীয়হীন। তাদের জীবন আদৌ নিরাপদ নয়। এরকম একটা প্রচার সর্বক্ষণ চলতে লাগল। অসহায় নির্যাতিতের প্রতি লোকের যে একটা সাধারণ সহানুভূতি, সমবেদনা আছে তা পাণ্ডবেরা প্রচুর পরিমাণে লাভ করল।

বিদ্বেষের আগুন জ্বলল পাণ্ডব ও কৌরবদের মনের অভ্যন্তরে। নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্য এবং অন্যদের সমাদর ও প্রীতি অর্জনের জন্য পাণ্ডুপুত্রেরা নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা এবং অস্ত্রশিক্ষা করল। এক্ষেত্রেও তাদের পারদর্শিতা, পটুতা কৌরবদের ঈর্ষান্বিত করল। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ পাণ্ডবদের অসাধারণ কৃতিত্বে এবং ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল হল। এতে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হল।

উত্তেজিত ক্রুদ্ধ দুর্যোধন মাতুল শকুনিকে বলল: মাতুল এ সব আর সহ্য হয় না। আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। দূর কর এ আপদ।

শকুনির অধরে মৃদু হাসি! বিস্মিত স্বরে বলল: সে কি ভাগিনেয়। ওরা তোমার আপনজন, বিশ্বাসভাজন। তাদের—না, না, এ তুমি কি বলছ!

মাতুল, তোমার পরিহাস নির্মম। একদিন সত্যই তারা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খেলার সাথী ছিল। তাদের না হলে চলত না। সেদিন তাদের পেয়ে হাতে স্বর্গ পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ স্বপ্ন ভেঙেছে। ঈর্ষায়, ঘৃণায়, বিদ্বেষে, মন তিতিবিরক্ত হয়ে আছে। তাদের নাম পর্যন্ত সইতে পারি না। তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নেই। এই যন্ত্রণা থেকে, অস্বস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও।

শকুনির মুখে চতুর হাসি। চোখে কৌতুক। বলল: বৎস সর্ষের মধ্যে ভূত।

দুর্যোধনের ভেতরটা ক্রোধে উত্তেজনায় জ্বালা করছিল। কোন কিছু গভীর করে চিন্তা করার মত মনের অবস্থা ছিল না। নির্বিকারভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর করল: দূর কর তাকে।

ভাগিনেয়র উত্তেজনায় হাসি পেল শকুনির। বলল ঃ তোমাদের খুল্লতাত বিদুর মহারাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন। কিন্তু সততার নামাবলী গায়ে দিয়ে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের শত্রুতা করছেন বলেই আমার ধারণা। এতদিন তোমার নির্বাসনের দাবি উঠেছিল। কিন্তু কর্তা কিছু বলেনি। তবু আমার বিশ্বাস বিদুর এর ভেতর ছিল।

মাতুল! তুমি কি বলছ?

বৎস বিস্মিত হয়ো না। রাজনীতিতে বন্ধু নেই, ভ্রাতা নেই, বিশ্বাস আনুগত্য কিছু নেই। আছে শুধু স্বার্থ, লোভ, আর অন্ধ উন্মত্ততা।

মাতুল, তা হলে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাকেও নির্বাসনে পাঠাও।

ভাগিনেয়, তোমার উচ্চাশা যত, বুদ্ধি তার চেয়ে অনেক কম। বিদুরকে এই মুহূর্তে হাতছাড়া করা যায় না। তাকে সরালে শত্রুর হাত শক্ত হবে। তখন আর প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে কোন বাধা থাকবে না। তাই আমাদের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে রেখে সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে। মোক্ষম অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে অকেজো করে দেওয়া হল প্রকৃষ্ট রাজনীতি। পাণ্ডবেরা হল বিদুরের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার কেড়ে নিতে হবে বিদুরের হাত থেকে।

দুর্যোধন উৎসাহিত হয়ে মাথা নাড়ল, প্রশ্ন করল ঃ কি করতে হবে?

শুধু পাণ্ডুপুত্রদের এই রাজ্য থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে হবে। সেখানে তাদের সকলকে গুপ্তহত্যা করে শত্রু নির্বংশ করতে হবে।

আবার হত্যা!

হাঁ ভাগিনেয়! রাজনীতিতে হত্যা করা পাপ নয়। যে কোন উপায়ে ক্ষমতা করায়ত্ত রাখা হল একমাত্র উদ্দেশ্য। অমন যে রামচন্দ্র তাকে পর্যন্ত যুদ্ধে জিতবার জন্য নিরপরাধ বালীকে হত্যা করতে হয়েছিল। রাবণও প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার আশংকায় আপন ভগ্নীপতি বিদ্যুৎজিহ্বাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। রাজনীতি মানে ছল, চাতুরী, শঠতা। রাজনীতিতে এগুলিকে একত্রে বলা হয় কূটনীতি।

বুকের অভ্যন্তর থেকে স্বস্তির শ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল কথাগুলো ঃ তোমার কূটকৌশল কি?

শকুনি গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল। গভীর অন্যমনস্কতার মধ্যে টান টান করে সে মাথা নাড়ল। যার অর্থ নানাবিধ ও অপরিচ্ছন্ন। দুর্যোধন শকুনির মুখের দিকে অপলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কাটল। তারপর আস্তে আস্তে বলল ঃ হ্যাঁ, লোকালয়ের বাইরে নির্জন কোন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে দাহ্যবস্তু দিয়ে সুদৃশ্য আরামদায়ক রমণীয় কুঠি নির্মাণ করলে ভ্রমণপ্রিয় বৈচিত্র্যলোভী পাণ্ডুপুত্রদের সহজেই প্রলুব্ধ করা যাবে। তারপর একদিন প্রতিশোধের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠবে গৃহে। তখন তোমার আর কোন শত্রু রইবে না ভাগিনেয়।

আট

বারণাবতের জতুগৃহের সুড়ঙ্গ দিয়ে পাণ্ডবেরা পালিয়ে গহন অরণ্যের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অকস্মাৎ, ব্যাসদেবের সঙ্গে তাদের দেখা হল। আসলে ব্যাসদেব তাদের সন্ধানেই সেখানে এল।

নিঃসঙ্গ, অসহায় অবস্থার ভেতর পাণ্ডবদের দিন কাটছিল। তাদের সামনে বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। কোথায় চলেছে নেই তার ঠিকানা। কেবল একটা গুণই আছে তাদের—সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করতে পারে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে পারে। এ জন্যে যেখানে যায় সেখানকার মানুষ ভালবেসে ফেলে তাদের। এরকম কোন মোহের টানে বাঁধা পড়ল কি তার হৃদয়? ব্যাসদেব নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল।

পঞ্চপাণ্ডবের নিষ্পাপ সরল মুখের দিকে তাকালে বুকের মধ্যে কেমন উথলে উঠা ভাব হয় তার। তখন কে যেন ভেতর থেকে তাদের দিকে প্রবলবেগে টানে। মায়া-মোহ মানুষের জন্মগত টান। সহজে কাটে না। সংসার উদাসী, সন্ন্যাসী মানুষ হলে কি হবে, তার মনের ভেতর মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বেগ একটা অদৃশ্য টান অনুভব করে শুধু পাণ্ডবদের প্রতি। কেন? দুর্যোধনের ভাইদের সঙ্গেও তার সমান সম্পর্ক। তবু তাদের প্রতি এ ধরনের কোন আত্মিক টান কেন জাগে না অন্তরে। কেন?

মুগ্ধ চোখে পঞ্চপাণ্ডবদের দেখছিল ব্যাসদেব। প্রতিটি ভাইয়ের চোখের দৃষ্টি কি গভীর, শান্ত, অথচ ধারাল। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। দেখলেই বুকের ভেতরটা শ্রদ্ধায়, অনুরাগে, ভালবাসায় টৈটম্বুর হয়ে যায়। তখনই স্নেহ কাঙাল অন্তরটা তাদের জন্যে উদ্বেগে, দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠে। শুধু পাণ্ডবদের জন্যে কেন এমন হয়! এই গভীর একাত্মতার মূল কোথায়? সহসা মনের গভীর থেকে উত্তরটা যেন ঝংকারে কানে বাজল, এ হল জারজের প্রতি জারজের সমবেদনা।

ব্যাসদেব স্বপ্নাতুর চোখে নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল যুধিষ্ঠিরের দিকে। দু'চোখের তারা দুটি মমতায় নিবিড় হয়ে উঠল।

দুঃসময়ে ব্যাসদেবকে পেয়ে পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের জননী কুন্তীর অন্তরে অপার রহস্যময় আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি হল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে হাজার জিজ্ঞাসা। ব্যাসদেব কেমন করে জানল তারা গহন অরণ্যের জনবিরল

এক অখ্যাত দরিদ্র পল্লীতে আছে? লোকে জানে তারা মৃত। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মরেছে। সর্বত্রই রটেছে ভস্মস্তূপের ভেতর থেকে পাঁচটি পুরুষের ও একটি রমণীর দগ্ধ দেহ পাওয়া গেছে। তবু ব্যাসদেব কেমন করে জানল তারা জীবিত আছে? কি করে তাদের গোপন অবস্থান টের পেল? গহন অরণ্যে আদিবাসীর ছদ্মবেশে বাস করছে এ সংবাদ তো কারো জানার কথা নয়। মহাত্মা বিদুরও জানে না বারণাবতের পর কোথায় কিভাবে আছে তারা? জানবে কোথা থেকে? তারা তো কখনও একজায়গায় অধিক দিন কাটায় না। নবাগত সম্পর্কে অপরের কৌতূহল কিংবা সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার আগেই তারা সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। অল্প সময়ের ভেতর কত নগর রাজধানী, গ্রাম, অরণ্য তারা ঘুরেছে। ফলে তাদের গতিবিধির উপর শত্রুর দৃষ্টি রাখা অসম্ভব ছিল। তবু, ব্যাসদেবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল কেমন করে? এ কি নিতান্ত ঘটনাচক্র? না, এর ভেতর কোন রহস্য লুকোন আছে?

ঘটনার আকস্মিকতায় যুধিষ্ঠির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। ডাক ভুলে যাওয়া পাখির মত তার অবস্থা। বিস্ময়ে আনন্দে সে শুধু ব্যাসদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বুকের মধ্যে যেন দুটো হৃৎপিণ্ড ধুক্‌ধুক্ করছিল তার।

প্রথম দর্শনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল উভয়ের।

অপরাহ্ণের রোদ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পুণ্যের আলোর মত ঝরে পড়ল ব্যাসদেবের মুখের উপর। আর তাতেই ব্যাসদেবের মুখের চারদিকে জ্যোতির্বলয়ের মত একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে বেরোতে লাগল। সেই অপার্থিব অলৌকিক দিব্যকান্তের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করল: পিতামহ, কতকাল পরে আমাদের সাক্ষাৎ হল বল ত?

ব্যাসদেবের সম্মুখে গহন অরণ্যের কত বড় বিশাল বিশাল গাছের ছায়া, কত লতানো গাছ আর কতরকম ফুল ফুটে তাতে। অবিশ্বাস্য রূপময় জগতের বিস্ময় তার দুই চোখের চাহনিকে দ্যুতিময় করে তুলল। যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় তার প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে মুখে মৃদু হাসির আভাস ফুটল। মনে মনে হিসাব করে মৃদুস্বরে বলল: চোদ্দ বছর পরে আমরা আবার একত্র হলাম।

কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল: চো-দ্দ-অ-বছর!

কেন, সন্দেহ হচ্ছে? তোমরা যখন হস্তিনাপুর গেলে তখন তোমার বয়স ষোলো, ভীমের চোদ্দ, অর্জুনের তেরো, নকুল সহদেবের তখন বারো। তারপর হস্তিনাপুরে তোমরা তেরো বছর কাটালে। জতুগৃহে কাটালে ছ'মাস। বনে বনে ঘুরলে আরো কয়েক মাস।

ব্যাসের কথায় কুন্তীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গভীর দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশে ছিল তা গভীর হতাশায় শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। বলল:

ছেলেদের বয়স হিসাব করার সময় হল কৈ ? আমার মন্দ কপাল। অদৃষ্টে শুধু কষ্টই আছে। কবে যে অবসান হবে জানি না। পুত্রদের কোন ভবিষ্যৎ চোখে দেখি না। যাযাবরের মত জীবন কাটছে আজ এখানে, কাল সেখানে। একে কি বেঁচে থাকা বলে ?

কুন্তীর বাক্যে নিথর স্তব্ধতাও কেঁপে উঠল। ব্যাসদেব একটু দিশাহারা বোধ করল। কুন্তীর কথায় কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। তার বুকের ভেতরটা কেমন করছিল।

যুধিষ্ঠির নীরব। ভীম অর্জুন করুণ চোখে জননীর দিকে চেয়ে রইল। থমথমে দুই চোখে তাদের কেমন একটা ঘোরলাগা আচ্ছন্ন ভাব।

স্তব্ধ কুটীরে সকলের মিলিত বিষন্ন শ্বাসের শব্দ শুধু শোনা যাচ্ছিল। ব্যাসদেবের সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল সে। মৃদুস্বরে ব্যাসদেব বলল : পৃথা ! বিধাতার কাজ কে কবে বুঝতে পারে ? হস্তিনাপুরের ছোট্ট একখণ্ড রাজ্যের পরিবর্তে ঈশ্বর তোমার পুত্রদের লিখে দিল এক বিশাল ভুবন। ধৃতরাষ্ট্র শুধু হস্তিনাপুরের শাসক, আর তোমার পুত্রেরা মানুষের হৃদয়ের রাজা—এক বিশাল দুনিয়ার রক্ষক। গণ্ডী দিয়ে বিধাতা তাদের হাত-পা বেঁধে দেয়নি। নিজের কর্মের জগতে তারা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র।

বঞ্চনার কষ্টে কুন্তীর দুই চোখ ছলছলিয়ে উঠল। মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। বহু কষ্টে কান্না গিলে গিলে বলল : মহর্ষি, আর কেউ এ কথা বললে হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু আপনি কি ভেবে যে এমন সান্ত্বনার কথা শোনালেন জানি না। সব জননীর মত পুত্রদের নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি। কিন্তু স্বপ্নের সেই আকাশখানা হতাশার গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

কুন্তীর মুখের উপর ব্যাসদেবের দৃষ্টি স্থির। নিশ্চল। খানিকটা সমবেদনায় মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ পর আবেগগাঢ় স্বরে উচ্চারণ করল : পৃথা, তোমাদের জীবনটা নিয়তির মত এক অমোঘ সংকেতে রহস্যময়। প্রকৃতির নিয়মে ফুল ফোটে, ফল হয়, বীজ হয়, বীজ থেকে গাছ জন্মে, তেমনি তোমাদের দুঃখ দুর্দশা, দুর্ভাগ্যের ভেতর একটা রহস্যময় কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। এ তো চোখে দেখার জিনিস নয়, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ছাড়া তাকে অনুভব করা যায় না। তবে, এটুকু বুঝেছি, বিশাল পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে তোমার পুত্রদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কুন্তীর মুখে এমনি একটা কষ্টের ছাপ লেগেছিল। ব্যাসদেবের বাক্যে তার ভুরু কুঁচকে গেল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কণ্ঠস্বর সহসা স্খলিত হল। বলল : মহর্ষি, পাণ্ডবদের আপনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাই, আমার মতই আশ্চর্য অ শ্চর্য স্বপ্ন সৃষ্টি করেন মনের অভ্যন্তরে। নিজের সঙ্গে নিজের এই ছলনায় আমি ক্লান্ত। ভবিষ্যতের কোন ছবি পড়ে না চোখে।

ব্যাসদেব কুন্তীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার মুখ একটু গম্ভীর হল। কপালে চিন্তার বলিরেখাগুলো স্পষ্ট ও গভীর হল। বিচিত্র দৃষ্টিতে পঞ্চপাণ্ডবের দিকে

তাকাল। গম্ভীর গলায় বলল : বেশ, আমার দুটি প্রশ্নের জবাব দাও। হিড়িম্ব আর বক রাক্ষসকে হত্যা করা হল কেন? ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করল কেন?

কুন্তী বিস্ময়ে চমকাল। তার মুখের ভাব বদলে গেল। একমুহূর্তের মত স্তব্ধ বিস্ময়ে ব্যাসদেবের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয়, তার কোন অনুভূতি ছিল না। শুকনো অধর উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় মৃদু মৃদু কাঁপছিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিব্রত গলায় বলল : এ সব কথার মানে কি?

আমার প্রশ্নের উত্তর এড়াতে চেও না।

মহর্ষি!

পৃথা! ব্যাসদেবের তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে বনের নিথর স্তব্ধতা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

কুন্তীর দুই চোখে অসহায়তা ফুটল। বলল : মহর্ষি! এ সব কথা আপনাকে কে জানাল?

তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

ভেবেচিন্তে কিছু করা হয়নি।

তবু একটা চিন্তা তো করেছিলে?

কুন্তীর দু'চোখে তার ছবি ভাসতে লাগল। তখন নিশান্তের কুয়াশামাখা অন্ধকার ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে চারদিক থেকে। জল স্থল অন্তরীক্ষের একটা স্পষ্ট ছবি বাস্তব হয়ে উঠছে এক রহস্যময় কুহেলিকায়, এ যেন এক স্বপ্নদৃশ্য।

ভাগীরথীর অন্য প্রান্তে পঞ্চপান্ডবের সঙ্গে কুন্তী এসে দাঁড়াল। অরুণ আলোর রক্তিম আভায় তখন ভোর হয়েছে ধরায়। পাখিরা সূর্য-বন্দনা করতে নীল আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে।

কি ভেবে কুন্তী পুত্রদের সঙ্গে ভাগীরথীর শীতল জলে অবগাহন করল। তাতে শরীর ও মন দুই স্নিগ্ধ ও পবিত্র হল। তারপর নবোদিত সূর্যের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কুন্তী বলল, আর পঞ্চপাণ্ডব গলা মিলিয়ে তার সঙ্গে উচ্চারণ করল :

> সম হোক মন্ত্র মোদের, প্রাপ্তি হোক সবার সমান,
> সমান সে মন হোক—হোক সবে সমচিত্ত জ্ঞান।
> আমরা সকলে সম মন্ত্রে দীক্ষিত—
> সমভাবে সম হবিধারে মোদের যজ্ঞ আচরিব।
> এই বাক্য প্রতিষ্ঠিত হোক মনে, মন হোক বাক্যেতে স্থাপিত ;—

তারপর নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল তারা। গাছপালা ছায়ার ভেতর দিয়ে সরু পথে দু'টা রাস্তা চলে গেছে বনের গভীরে। সেই পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। এ পথ লোকালয়ের। এই মুহূর্তে মানুষের বসতির মধ্যে থাকা ঠিক হবে না ভেবে তারা পথ পরিবর্তনের কথা ভাবছিল। ঠিক সে-সময় হঠাৎ একটা হলুদ বসন্তের পাখি ডেকে উড়ে গেল একটা পাতাঝরা গাছের ডাল ছেড়ে ভাগীরথীর তীর ধরে গভীর জঙ্গলের

দিকে। কুন্তী, যুধিষ্ঠির চেয়ে রইল সেদিকে। পাখিটাকে অনুসরণ করল চোখ দিয়ে, যতক্ষণ তাকে দেখা যায়। তারপর পাখি যেদিকে গেছে, সেদিকে যেতে বলল কুন্তী।

কী ভালো লাগছিল তাদের প্রত্যেকের। কত শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য! অনাঘ্রাত, অশ্রুত, অদেখা। জঙ্গল কুন্তী বহুবার দেখেছে—এতবার করে আর এতরকম করে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে দেখেছে—তবুও আশ মেটে না চোখের। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল কুন্তী। হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দে চমকে উঠল তারা। ঝোপের নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে এসে দাঁড়াল একপাল হরিণ। অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তারা নবাগত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কি ভেবে চকিত ও সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্যে দৌড়ে চলে গেল।

দিনের পর দিন ধরে তারা চলল। রাতটা কেবল লোকালয়ের কাছাকাছি কাটাত। গাছের তলায় শুয়ে থাকার সময় কুন্তীর মনে হত দেবতারা আকাশে লক্ষ চোখ মেলে যেন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, পাহারা দিচ্ছে। গাছেরা, পাহাড়েরা, নদীরাও সব চেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর। পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে সে তো ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে, এই প্রত্যয়ে মন দৃঢ় হত। প্রাণের গভীরে প্রতিদিন শক্তির নিরন্তর প্রার্থনা নিয়ে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ত। সকালে তাদের জাগাত সূর্যের আলো আর পাখির ডাক।

পর্বতের চড়াই উতরাই ভেঙ্গে তারা ত্রিগর্ত দেশের দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতরে থেকে কে যেন বজ্রকণ্ঠে হেঁকে বলল: কোথায় চলেছ ভীমসেন, অর্জুন?

মুখের কথা শেষ হতে না হতে বুনো মহিষের মত বলিষ্ঠ দুই পায়ের প্রবল চাপে জঙ্গল মাড়িয়ে নির্ভয়ে পঞ্চপান্ডবের সামনে এসে দাঁড়াল এক মিশকাল মানুষ। শালতরুর মত সে দীর্ঘ, তেমনি পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারায় উদ্দীপ্ত। কালো পাথর কুঁদে কুঁদে তৈরী যেন সেই বলিষ্ঠ মূর্তি। পাথরের একটা চাঙড়ার উপর দাঁড়িয়ে সে ভীম, অর্জুন, কুন্তী, যুধিষ্ঠির প্রমুখ ভাইদের দেখতে লাগল। জঙ্গলী লোকটা চোখে চোখ রেখে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। নাক দিয়ে একধরনের অদ্ভুত শব্দ করে বলল: আমি এই অরণ্যের অধিপতি হিড়িম্ব। তোমাদের দু'জনকে আমি চিনি। একলব্যের গুরুদক্ষিণার অনুষ্ঠানে দেখেছি।

কুন্তীর দু চোখে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়। ইঙ্গিতে পুত্রদের কথা বলতে নিষেধ করে সে একটু অবাক হওয়ার চেষ্টা করল। নিরীহভাবে বলল: বাছা, তুমি বোধ হয় ভুল করছ। আমরা কিন্তু তীর্থযাত্রী।

কুন্তীর কথা শুনে হিড়িম্বর দাঁত রাগে কিড়মিড় করে উঠল। বাজখাই গলায় বলল: জঙ্গলের মানুষের চোখ বাঘের মত। শিকার দেখতে ভুল করে না।

ভয়ে কুন্তীর বুক কাঁপছিল। হিড়িম্বর কর্কশ, সুরহীন হিংস্র কণ্ঠস্বরে তার ভিতরের সব স্পন্দন যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবাহমানতা। তারপর মনের অভ্যন্তরে সাহস সঞ্চয় করে মলিন হাসল। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলল ঃ বাছা, তুমি আমার সন্তানের মত। তোমাকে ঠকাতে যাব কেন? তুমি যাদের নাম করলে, ওদের নাম তো শুনিনি কখনও। ওরা কারা? কি করে? তোমার বুঝি শত্রু খুব?

হিড়িম্ব সহসা পিলে চমকানো হুংকার দিল ঃ থাম! তোমাদের কোনো কথায় ভুলছি না। জতুগৃহে তোমরা কেউ পুড়ে মরলে না তবু ছ'টি মানুষের পোড়া শব পাওয়া গেল ভস্মস্তূপে। এতো কম আশ্চর্য নয়। কাজটা বেশ গুছিয়ে করেছ। কিন্তু লোকগুলো কে? তারা জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, না তাদের হত্যা করে আগুনে ছুড়ে দিয়েছ?

কুন্তীর মাথার মধ্যে বনবন করে ঘুরছিল। ভেতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পুত্রদের দিকে চেয়ে রইল। মাথা নেড়ে সতর্কতামূলক শব্দ করে হেঁয়ালী করে বলল ঃ যা বলুক শুনে যাও। নিজেরা ক্রোধের বশে কিছু করুল কোরো না। লোকটাকেও কিছু বল না। শুধু নিজেদের সংযত রাখ।

ব্যাসদেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ সব কথা মনে এল কুন্তীর। কিন্তু এ সব গল্প বলার মত তার মনের অবস্থা ছিল না। তাই কয়েক মুহূর্ত ধরে মনে মনে কুন্তী একটা জবাব তৈরী করল। কুন্তীর দিশেহারা অবস্থা দেখে ব্যাসদেব মৃদু একটু হাসি মাখানো মুখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সহসা ব্যাসের চোখে চোখ পড়তে কুন্তীর প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেটে গেল। নিমেষে বিস্মৃতি দূর হল। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে চোখ মেলল। বিবর্ণ মুখে একটু মলিন থেকে বলল ঃ ভাগীরথী পার হয়ে গহন অরণ্যে প্রবেশ করার অল্প কয়েকদিন পরেই হিড়িম্বর চোখে পড়ে গেলাম। সে ভীম অর্জুনকে চিনতে পারল। আমাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হল। অর্থের লোভে সে ভীম আর অর্জুনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। ভগিনী হিড়িম্বাকে দিয়ে ভীমকে প্রলুব্ধ করল। কিন্তু হিড়িম্বা ভীমের প্রেমে পড়ে গেল। প্রণয়বশতই হোক, অথবা ভীমকে পাওয়ার আশাতেই হোক হিড়িম্বা ভ্রাতার মতলব এবং মনোভাব ভীমকে খুলে বলল। শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করতেই পুত্রদের শিখিয়েছি। ভীম হিড়িম্বকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করল। সেই ভয়ংকর যুদ্ধে হিড়িম্ব প্রাণ হারাল। হিড়িম্বর মৃত্যুতে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত হলাম না, তার ভগিনী আমাদের নিরাপত্তার আর এক বিঘ্ন। সে নারী। তার সঙ্গে যুদ্ধ করাও চলে না, আবার তাকে হত্যা করাও যায় না। এরকম অবস্থায় তার সরল প্রেম যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে আমরা আবার বিপন্ন হব। আমাদের সেই দারুণ সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার

একটামাত্র পথ হল হিড়িম্বাকে বশে রাখা। তাই এক মানবিক কর্তব্যবোধে পিতৃমাতৃহীন অনাথ হিড়িম্বাকে হিড়িম্বহত্যাকারী ভীমের সঙ্গেই বিবাহ দিলাম।

ব্যাসদেব উৎফুল্ল হয়ে বলল: চমৎকার তোমার সিদ্ধান্ত। এই বিয়েতে তুমি এক ঢিলে দুই পাখি মারলে। হিড়িম্বাকে বধূর সম্মান দিয়ে তুমি অনার্যকুলের চিত্ত জয় করলে। অরণ্য তোমাদের নিরাপদ আশ্রয় হল। বিদেশ বিভূঁইতে তোমাদের সহায়সম্পদ, আত্মীয়বান্ধব কিছু ছিল না। হিড়িম্বাকে লাভ করে তোমরা বিনা আয়াসে সে বাধা উত্তীর্ণ হলে। রাজ্য পুনরুদ্ধারের কাজে হিড়িম্বা তোমাদের পায়ের তলার মাটি হয়ে থাকল।

কুন্তী বিস্ময়ে নির্বাক, নিশ্চল স্থির। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। কেবল মৃদু মন্থর ঢেউ বুকে উঠানামা করতে লাগল। ভাষাহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ব্যাসদেবের দিকে। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর বুকভরে পুনরায় শ্বাস নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল: মহর্ষি, বক রাক্ষস সম্পর্কে বলার কি বা আছে? তার দস্যুতায়, জুলুমে অত্যাচারে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষের এমন সাহস ছিল না যে দস্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তাদের অসহায় আত্মসমর্পণ দস্যুর আস্ফালন, স্পর্ধা, অত্যাচারকে কেবল বাড়িয়ে তুলল। আমার পুত্রেরা তাদের মতই দুঃখী ও লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষেব নিরাপত্তা এবং অধিকার সুরক্ষা করতে এগিয়ে গেল। বক রাক্ষস ভীমের শক্তি অবহিত ছিল না। তাই মূর্খের মত তাকে আক্রমণ করে বসল। আর তার পরিণাম যা হয় তাই হল। বক রাক্ষস মরল। লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

ব্যাসদেবের মুখে স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি। শান্ত মাদকতাময় দুই চোখের চাহনিতে এমন একটা নিবিড় তন্ময়তা নেমে এল যা তার মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটাল। মৃদুস্বরে বলল: পৃথা, বক রাক্ষসকে নিধন করে তুমি প্রমাণ করলে পান্ডবেরা দুঃখী মানুষের আশ্রয় ও সান্ত্বনা, দুর্গত মানুষের বন্ধু ও পরিত্রাতা এবং অত্যাচারীর যম। লোকের চোখে তাদের সার্থক পুরুষ হয়ে জন্মানোর গৌরব আমাকে দিন দিন প্রত্যয়বান করছে। সত্যি তাদের নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি। বড় আদর্শের আলোয় তুমি তাদের অন্তঃকরণকে আরো বড় করে তোলার শিক্ষা দিয়েছ। বিধাতা হয়ত সবাকার সামনে তোমাকে ও তোমার পুত্রদের আরো বড় করে তোলার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করতে চান। মানে, সম্মানে, ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় শুধু বড় হওয়া নয়। ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মহান সাহসে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করে যে বড় হওয়া সেই কার্যের আহ্বান জানাতেই হয়ত ঈশ্বর তোমাদের এই নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

কুন্তী ডাক ভুলে যাওয়া পাখির মত স্বপ্নালু চোখে ব্যাসদেবের দিকে চেয়ে রইল। সে প্রশ্ন করতে কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতে ভুলে গেল।

ব্যাসদেবের অধরে স্মিত হাসি। দু'চোখের তারার রহস্যের দ্যুতি উজ্জ্বল করল তার মুখমণ্ডল। মধুর স্বরে বলল: এ হল দৈব-রহস্য। মানুষের সাধ্য নেই তার রহস্যের তল খোঁজার।

ব্যাসদেবের চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নিবিড়তা নামল। কুন্তীর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল: পৃথা, এবার অরণ্য ছেড়ে তোমরা লোকালয়ে গিয়ে বাস কর। মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য না এলে পুত্রেরা তোমার জানতে পারবে না, কেমন করে সাধারণ মানুষকে প্রতিমুহূর্তে লড়তে হয় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। তাদের সংগ্রামদীপ্ত জীবনের সেই গৌরব ব্যর্থতা হতাশা দীর্ঘশ্বাসকে বুঝতে তোমরা এখন থেকে একচক্রানগরীতে বাস কর। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কখনও ঐ নগরী ত্যাগ কর না। দিনে ভিক্ষুকদের মতো গ্রামে নগরে ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করবে। চতুর্দিকে নজর রাখবে কোথায় কে কি বলছে, করছে এবং হচ্ছে, তা দেখতে ও জানতে চেষ্টা করবে।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে পঞ্চপাণ্ডবদের দুই চোখ বিস্ফারিত হল।

যতদিন যেতে লাগল ব্যাসদেব ভেতরে ভেতরে তত অস্থির হল। বুকের ভেতর কাঁটা ফোটার যে যন্ত্রণা জমাট বেঁধে আছে তার ভাষা কাবোকে বলার নয়। মনের অন্ধকারে বসে নিজের মনেই প্রতিকারের কত পরিকল্পনা করে। কিন্তু পাণ্ডবেরা অকস্মাৎ আশ্রয়চ্যুত হওয়ায় এক শূন্যতা ও সমস্যা সৃষ্টি হল। তারপর থেকে ধ্যানে মন বসে না। ধ্যানে বসলে অম্বিকার মুখ মনে পড়ে। চোখের পাতা বন্ধ করলে দেখতে পায় অম্বিকার নিষ্ঠুরতা ঘৃণা, প্রত্যাখ্যান, অপমান এবং পদাঘাতের দৃশ্য। অমনি প্রতিহিংসার ঝলকে [illegible] মুখ ঝলকে উঠে।

অম্বিকার অপমানের জন্য তার কোন গ্লানিবোধ ছিল না। কেবল যা বিঁধে ছিল তা তার কৃষ্ণাঙ্গ ঘৃণার কাঁটা, আর নিষ্ঠুরতা বেদনার। যার হৃদয় মাধুর্য পেলে জীবনটা ধন্য হয়ে যেত, সে কেন ঘৃণা করে তাকে প্রতিহিংসার অনলে নিক্ষেপ করল? ঐ একটা নারীর অপমান, বিদ্বেষ, ঘৃণা, লাঞ্ছনা পদাঘাতের বিষময় জ্বালায় জীবনটা তার এমন এলোমেলো আর অস্থির। ভীষ্মের অহমিকা, নীরব উপেক্ষা, অসম্মানও তার বুকে তীরের মত বিঁধে আছে। এদের অপমান, অসম্মানটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মের সঙ্গে লড়াইটা শেষ হবে না। মনের আগুন নিভবে না। আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য ইন্ধন চাই। পাণ্ডবেরা তার প্রতিহিংসার ইন্ধন। শত্রু নিধনের অস্ত্র।

কিন্তু পাণ্ডবেরা এখন অসহায়। তাদের সম্বল, পাথেয় কিছু নেই। ধৃতরাষ্ট্রর

সৈন্য, অস্ত্র, অর্থ, অশ্ব, হস্তি, রথ, লোকবল, বাহুবল, আত্মীয়, বান্ধব পান্ডবদের নেই। অথচ রাজশক্তি অর্জনের জন্য এগুলির প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য নিঃসহায় পান্ডবদের এসব সংগ্রহ করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তাদের পাশে দাঁড়ানোর মত একজন মহান রাজার সন্ধান ব্যাসদেব সারা ভারতে খুঁজে পেল না।

অবশেষে ব্যাসদেবের মনে হয়েছিল, দেবলোকের সাহায্য নিয়ে মর্তভূমিতে পান্ডব দের জন্য একটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু তাতে পান্ডবদের হিতের চেয়ে অহিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। মানুষ ও দেবতা দুই পৃথক নর গোষ্ঠীর লোক † † ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে তাদের লড়াই পুরাতন এবং চিরকাল। স্বর্গলোকের * বাসিন্দা দেবতাদের মানুষ বৈরীর চোখে দেখে। সুতরাং তাদের উপস্থিতির অনেক ঝক্কি পান্ডবদের সামলাতে হবে। মানুষের বিষ সন্দেহ এবং অসহযোগিতা পান্ডবদের জীবনে ডেকে আনবে মহা সর্বনাশ। অকারণ রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনা তাতে বৃদ্ধি পাবে শুধু। এতে তার নিজের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। পান্ডবেরাও হবে না লাভবান। দুর্গম গিরি, গহন অরণ্য অতিক্রম করে দেবলোক থেকে নিত্য সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা এক কঠিন সমস্যা। প্রতিবেশী দেশের দ্বারা আক্রান্ত হলে রাতারাতি দেবতাদের সাহায্য পাওয়া এবং যুদ্ধের সরবরাহ বাড়ানোও এক দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং বাইরের দেশ দেবলোকের সাহায্যে কিছু করতে যাওয়া বিড়ম্বনাকর এবং বিপজ্জনক।

ব্যাসদেব তাই রাজনৈতিক কৌশল বদলানোর কথা ভাবল। পান্ডবদের আত্মপ্রকাশের নিরাপদ ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল।

দ্রোণ ও দ্রুপদের বিরোধকে এক উত্তেজক রাজনৈতিক রূপ দিল ধৃতরাষ্ট্রে। পান্ডুপুত্রদের সিংহাসন এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মতলব নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিল। এর ফলে হস্তিনাপুরের সঙ্গে পাঞ্চালের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটল। পান্ডব মহিষী পৃথার পালক পিতা কুন্তি ভোজের সঙ্গে দ্রুপদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু দ্রোণ পান্ডবদের অস্ত্রগুরু হওয়ায় দ্রুপদের সঙ্গে পান্ডবদের মেলামেশার পথ বন্ধ হয়ে গেল। দ্রুপদের সঙ্গে পান্ডবদের শত্রুতা স্থায়ী করার মতলব নিয়ে তরুণ বালক অর্জুনকে দিয়ে দ্রুপদকে লাঞ্ছিত করল। দ্রুপদের মনে অর্জুনের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এ পান্ডবদের একজন প্রিয় বান্ধবকে শত্রু করে তোলা ছিল দ্রোণের দ্রুপদ নেপথ্য ইতিহাস। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে পাঞ্চালের সঙ্গে হস্তিনাপুর এবং পান্ডবদের ব্যবধান সৃষ্টির যে পরিকল্পনাই করে থাকুক, বিধাতা কিন্তু তার অন্য রূপ দিল।

---

† † এ সম্পর্কে বেশী জানতে হলে মৎ-লিখিত 'রামের অজ্ঞাত বাস' পড়ুন।

* অন্যমতে, পামির বা পূর্ব তুর্কিস্তান নিয়ে স্বর্গ। এখানে দেবতা নামে এক জাতি বাস করত।

দ্রুপদ, দ্রোণের অপমান লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নীতি গ্রহণ করল। এই কাজে তার সহায় হল ব্যাসদেব। দ্রোণের প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে দিয়ে দ্রোণের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার এক স্বপ্ন ব্যাসদেব দ্রুপদের মনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করল। সেই সুদূর অতীত ব্যাসদেবের চোখের তারায় ভেসে উঠল।

ঘটনাক্রমে সেদিন ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত ছিল। শিক্ষা সমাপনান্তে কৌরব ও পান্ডবেরা গুরুদক্ষিণা দিতে দ্রুপদের কুটীরে উপস্থিত হল। তাদের অভিলাষের কথা শুনে আচার্য দ্রোণ বলল: বৎসগণ, এক কঠিন গুরুদক্ষিণা দিতে হবে তোমাদের। গুরুগৃহে আমি ও পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ছিলাম অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রণয় বশে দ্রুপদ বলেছিল, রাজা হয়ে আমাকে তার রাজ্যে নিয়ে যাবে। দুই বন্ধু মিলে রাজকার্য করব। কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যে তা তার রাজসভায় এসে বুঝলাম। আমার মত গরীব ব্রাহ্মণকে বন্ধু সম্বোধনে সে লজ্জা পেল। অপমান বোধ করল। ভ্রূকুটি করে বলল: বন্ধু? কে তোমার বন্ধু? তারপর অকারণে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসিতে তার বিদ্রূপ ঝলকে উঠল। বলল: বন্ধু? ঐশ্বর্যবান, বিত্তবান, বীর্যবান রাজা আর দীন শ্রীহীন ব্রাহ্মণ—এদের মধ্যে কখনও বন্ধুত্ব হয়? বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে? তুমি বামন হয়ে চাঁদ ধরতে এসেছ ব্রাহ্মণ।

দ্রোণ কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল। চোখের কোণে তার জল চিক চিক করছিল। বুকের ভেতর উথলে ওঠা ভাবটা দমন করবার জন্য কয়েকবার ঢোক গিলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল: পুত্রগণ আমার সেই অপমান দুঃখ ঘোচাতে যদি পার তবে সেই হবে তোমাদের শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। যুদ্ধ করে পাঞ্চাল রাজ্যের দ্রুপদকে পরাজিত ও বন্দী করতে পার, তাহলেই আমাকে গুরুদক্ষিণা দেয়া হবে।

শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণাদানের গৌরব অর্জন করল অর্জুন। যুদ্ধে দ্রুপদের সৈন্য বাহিনী পর্যুদস্ত করে দ্রুপদকে গুরু পদে সমর্পণ করল।

শৃঙ্খলিত দ্রুপদের দিকে কৃপামিশ্রিত কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দ্রোণ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ব্যঙ্গের তীব্রাস্ত্রে বিদ্ধ করে বলল: তুমি আর রাজা নও দ্রুপদ। তোমার রাজ্য এখন আমার। একজন ভিখারীর মতন তুমি। তোমার কিছু নেই। রাজা ও অরাজা'ত সখা হতে পারে না।

দ্রুপদ অপমানে ক্রোধে কেঁপে উঠল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল: কে চায় তোমার বন্ধুত্ব? ক্ষত্রিয় ও অক্ষত্রিয়ে কখনও বন্ধুত্ব হয় না। কৃপা ও চাই না।

দ্রোণ গম্ভীর গলায় বলল: কিন্তু আমিও তোমার বন্ধুত্ব অস্বীকার করি না। পূর্ব বন্ধুত্বে মর্যাদা ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে অর্ধেক রাজ্য এই দন্ডে তোমাকে অর্পণ করলাম। এখন তোমার আমার সম মর্যাদা হল। এবার তোমার আমার সখা হতে আর কোন বাধা থাকল না।

দ্রুপদের দুই চক্ষু সিক্ত হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারল না। তারপর একটু ম্লান হেসে বলল : তোমার বন্ধু প্রীতির এই নিদর্শন আর কোন কালে ভুলতে পারব না। কিন্তু আমার কোন সান্ত্বনা রইল না।

দ্রুপদের এই কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করল ব্যাসদেব। দ্রোণের এই অনুকম্পা আর কোন দিনই দ্রুপদের মন থেকে মুছবে না। দ্রোণ দ্রুপদের চিরশত্রু হয়ে থাকল। দ্রোণের কারণে হস্তিনাপুর তার বৈরীরাজ্য হল। যতদিন দ্রোনের অপমানটা দ্রুপদের মনে থাকবে ততদিন দ্রোণের সঙ্গে, হস্তিনাপুরের সঙ্গে তার বিরোধটা শেষ হয়ে যাবে না।

ব্যাসদেব তার নিজ অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি দিয়ে মনে মনে সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে নিয়ে কয়দিন পরে দ্রুপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

তখন অপরাহ্ন।

কালো কালো মেঘগুলো একজায়গায় জমে স্তূপাকৃতি হচ্ছিল কালো মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে যাওয়ায় আকাশটা থম মেরে বসেছিল।

খুব সংকোচের সঙ্গে ব্যাসদেব রাজগৃহে প্রবেশ করল। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। দরজার গোড়ায় একটু থমকে দাঁড়াল। দ্রুপদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছিল। হয়ত নিজের অভ্যন্তরে ক্ষতগুলোর চিন্তা তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ-এবং হতাশ করে দিয়েছে। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিতরের তীব্র জ্বালা আর কষ্টের অভিব্যক্তিটা ব্যাসদের টের পাচ্ছিল।

ব্যাসদেব দ্রুপদের পাশে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটা লম্বা শ্বাস ফেলল। দ্রুপদ তাতেই একটু চমকে গিয়েছিল। দ্রুপদের মুখে প্রথম দেখার বিস্ময়ের ভাব ছিল না। কেমন একটা বিমর্ষ হতাশ ভাব তার মুখখানা আঁধার করে রেখে-ছিল। দ্রুপদ কিছু বলার আগে ব্যাসদেব বলল : পাঞ্চালরাজ দুঃখ কষ্ট পরিতাপের দহনে পুড়ে পুড়ে নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় করে তোমার কি লাভ? তাতে শত্রুর লাভ। তুমি কি একবারও ভেবেছ, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র মিলে যে আগুণ তোমার বুকে জ্বালল সে'ত ব্যর্থতার অঙ্গার নয়, পূর্ণতার শিখা। প্রতিহিংসার প্রতীক। বুকের আগুণে তুমি নিজে শুধু পুড়বে না। অপরকেও জ্বালাবে। ঐ আগুণে হস্তিনা-পুরও জ্বলে উঠতে পারে।

দ্রুপদ স্তব্ধ বিস্ময়ে ব্যাসদেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর খুব ধীরে বিমর্ষ গলায় বলল : আমার মন ভেঙে গেছে। কাজে কোন প্রেরণা, উদ্যম পাই না। মনে হচ্ছে আমি ফুরিয়ে গেছি।

ব্যাসদেব বেশ একটু রুষ্ট হয়ে বলল : দুঃখ, হতাশা জীবনের দুর্বিষহ অভিশাপ। বীর্যবান পুরুষের কাছে এই বিলাসিতার কোন মানে নেই। দুঃখ,

লাঞ্ছনায় বীর নিরাশ কিংবা হতাশ হয় না কখনও। দুর্বার প্রতিজ্ঞায় সে শুধু জ্বলে উঠে। দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঝঞ্ঝার মত আছড়ে পড়ে সমুদ্রে।

দ্রুপদ বোবা। বিষন্ন মুখে মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর খুব কাতর কণ্ঠে ভেঙে পড়া গলায় বলল: শুধু কেউ একটু চাইলেই বোধ হয় আমি অপমানের মধ্যে দুঃখের মধ্যে, আত্মগ্লানির মধ্যে বেঁচে উঠতে পারতাম।

ব্যাসদেব অকস্মাৎ গম্ভীর হল। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: আত্মবল, বিশ্বাস কেউ কাউকে দিতে পারে না। মনের অভ্যন্তরে অহং প্রতিকূল পরিবেশের চাপে কখনো কখনো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে তখন বড় বিপন্ন আর অসহায় বোধ হয় নিজের। কিন্তু অহংএর অহংকার, স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য, দম্ভ, ক্রোধ, ঘৃণা, প্রতিহিংসায় মন যদি টৈটুম্বুর থাকে তাহলে কার সাধ্য রোধে তার গতি? ক্রোধ, ঘৃণা বিদ্বেষ, হিংসার শেষ হয় না কখনও। এগুলির কেবল পুনরাবৃত্তি হয়। মানুষকে উজ্জীবিত করে অহংএর ঘুম ভাঙায়। তোমাকেও ক্রোধের, অপমান, বিদ্বেষ জ্বালিয়ে তুলবে। দ্রোণের প্রতিশোধের অস্ত্র হল অর্জুন। তাকে তোমার অপমানের প্রতিশোধের অস্ত্র করে নাও। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত শ্রেষ্ঠ কূটনীতি আর কিছু নেই।

দ্রুপদের বুকের ভেতর সহসা অর্জুন সম্পর্কে একটা আবেগ সৃষ্টি হল। আপনা থেকেই বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মনটা দীন হয়ে গেল আবেগে। মৃদু কণ্ঠে বলল: মহর্ষি, অর্জুনের পরাক্রমে মুগ্ধ আমি। তার কাছে হেরে মনে কোন কষ্ট নেই, ঈর্ষা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। একবারও তাকে আমার শত্রু মনে হয় নি। বরং এক অদ্ভুত বাৎসল্যের সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের সময় তার দিকে তাকিয়ে যতবার নিশানা করি ততবার পাঞ্চালীর মুখখানা আমার মনে পড়েছে। পাঞ্চালীর সঙ্গে অর্জুনকেই মানায়। বুকের মধ্যে আমার কেমন একটা উথলে উঠার ভাব। নিজের মনে প্রশ্ন করিছি যুদ্ধক্ষেত্রে এ সব চিত্তদৌর্বল্যের কোন স্থান নেই। তবু তীর ছুঁড়তে গিয়ে আমার হাত কেঁপে গেছে।

ব্যাসদেব লম্বা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মৃদু হাসি ফুটল তার অধরে। বলল: বিধাতা বড় রসিক। তার সব কাজের তাৎপর্য বোঝা ভার। এ হয়ত তোমার বিধিলিপি। মানুষের মন অনেক সময় অনেক কিছু আগে থাকতে টের পায়।

দ্রুপদ চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল। কয়েক পলক চোখ বন্ধ করে অর্জুনের মুখটা দেখতে পেল কল্পনায়। বিমূঢ়ের মত ব্যাসদেবের দিকে কিছুক্ষণ একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে চেয়ে রইল। দ্রুপদের আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল। বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলল: মহর্ষি! অর্জুনকে মনে মনে জামাতা করার স্বপ্ন দেখি। সে কি আমার অপরাধ!

ব্যাসদেবের ধমনীতে রক্তস্রোত সহসা কিছু উদ্দাম হল। বুকের ভেতর গুরু গুরু

করে উঠল ব্যাসদেবের। একটু হাসি পেল। হাসি হাসি মুখ করে আবার একটু ভাবলও। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল : মানুষের স্বপ্ন ছাড়া আর কি আছে বল ?

দ্রুপদের অতি স্পর্শকাতর মনটি তাকে সবচেয়ে বেশী উদ্দীপিত করল। মনের অভ্যন্তরে তলিয়ে গেল। তখন পৃথিবীর আর কোন আত্মজন বা সুহৃদকে নয়, ব্যাসদেবকে বেশী আপনার বোধ হল। শুধু ব্যাসদেবকেই তার মনের অভিলাষকে ব্যক্ত করা যায় এরকম একটা প্রত্যয় সৃষ্টি হল। দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে বলল : মহর্ষি আপনি আমার মনে স্বপ্নের স্রষ্টা। এখন কি করলে আমার স্বপ্ন স্বার্থক হয় তার উপায় নির্দেশ করুন।

ব্যাসদেব সেই মুহূর্ত্তে কোন কথা বলতে পারল না। অবাক হয়ে শুধু ভাবছিল, কোন রন্ধ্র দিয়ে নিয়তি আসে তা মানুষের অনুমান করা অসাধ্য। দ্রুপদের ক্ষেত্রে এই নিয়তি এল দ্রোণের রূপ ধরে, অনুকম্পার রন্ধ্র দিয়ে।

নিজের মনে কথাগুলো চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল ব্যাসদেব জানত না। তারপর, সকালে যখন সূর্যের আলো আর পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলতে টের পেল খোলা আকাশের নীচে একটা বেদীর উপর সে রাতটা কাটিয়েছে।

পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের দিকে নজর রেখে ব্যাসদেব দ্রুপদকে দিয়ে তার এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করল। এ কার্যে সহায় হল দ্রুপদের অসাধারণ রূপবতী কন্যা কৃষ্ণা। কৃষ্ণার রূপকে ব্যাসদেব রাজনৈতিক মূলধন করে তুলল।

কৃষ্ণার ভুবনমোহিনী রূপের কোন তুলনা হয় না। নীল নবঘন মেঘপুঞ্জের মত তার দেহলাবণ্য। নিবিড় কুঞ্চিত কেশ কাজল কালো রাত্রির মত। আর তার দুই নয়ন সরোবরে মধ্যে ফুটে থাকা নীলকমলে কলির মত অপরূপ। ফাল্গুনের মত যৌবন. দেহের কী দ্যুতি. কী দৃপ্ত ভঙ্গী? কৃষ্ণা শুধু সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নয়, এদিক থেকে কৃষ্ণা অনুপমা।

কৃষ্ণা যে পরম রূপবতী তা তো বিশ্বশুদ্ধ জানে। তাকে পাওয়ার জন্যে সকলে পাগল। ব্যাসদেবের দৃঢ় বিশ্বাস কৃষ্ণা বীর্যশুল্কা হলে দ্রুপদের বংশ গরিমার সঙ্গে কৃষ্ণার নিজের গরিমা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এবং যে তার বর হবে মানে মর্যাদায় বীর্যবত্তায় সে নিমন্ত্রিত প্রতিযোগিদের ছাড়িয়ে যাবে। শ্রেষ্ঠ পুরুষের সম্মান ও গৌরব অর্জন করবে। সকলের ঈর্ষার পাত্র হবে।

কৃষ্ণার এমন বর আসবে কোথা থেকে? ব্যাসদেব নিজেকে প্রশ্ন করল আর নিজেই তার জবাব দিল : একচক্রা নগরীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুটীর থেকে আসবে।

পাঞ্চাল রাজ্যে পাণ্ডবদের সৌভাগ্যের সূর্যোদয় হবে। কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভায় তার সূচনা করতে হবে। কাজেই তার আয়োজনও বিরাট। সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গ জানে পাণ্ডবেরা মৃত। জতুগৃহে পুড়ে মরেছে। এমন কি দ্রুপদও তাই জানে। কিন্তু ব্যাসদেব অন্য ভাবে দ্রুপদকে বোঝাল। পাণ্ডবদের জন্ম নক্ষত্র যদি নিভুর্ল হয় তা-হলে তাদের বেঁচে থাকার কথা। অবশ্য এই সময়টার শত্রুর ভয়ে প্রচ্ছন্ন থাকার যোগ তাদের। সুতরাং দ্রুপদের নিরাশ কিংবা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ব্যাসদেবের ঐ আশাটুকু দ্রুপদের একমাত্র সম্বল এবং পাথেয়।

ব্যাসদেবের নির্দেশে দ্রুপদ-স্বয়ম্বর সভার জন্য যা যা করলে ভাল হয় তার সব আয়োজন করল। কোন ফাঁক রাখল না দ্রুপদ। স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের উপস্থিতি ঘটানোর জন্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সংবাদ প্রচার করা হল। সর্বশ্রেণীর বর্ণের, ধর্মের নৃপতি, ব্রাহ্মণ এবং সাধারণ লোককে নিমন্ত্রণ করা হল। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণের অবাধ অধিকার থাকল। এর অর্থ, সাধারণ লোকের ছদ্মবেশে যদি অর্জুন এই সভায় উপস্থিত হয় তা-হলেও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে তার কোন বাধা থাকবে না।

প্রতিযোগীর সংখ্যা হল বিপুল।

কিন্তু কৃষ্ণা কাকে স্বামী নির্বাচন করবে। সেটা কৃষ্ণার স্বাধীন ব্যাপার। প্রেম নয়, নিজস্ব পছন্দ বিহ্বলতা নয়, নিজের বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা দেখানোর স্বাধীনতা তার থাকল। স্বয়ম্বরে অদ্ভুত দর্শনা কন্যা লাভের পণও বড় বিচিত্র আর আশ্চর্যকর।

'ব্যাসদেবের পরামর্শে দ্রুপদ বিশেষ ধরনের এক ধনু নির্মাণ করল ; যাতে গুণ পরানো এবং শর নিক্ষেপ করা খুব কঠিন কাজ। ব্যাসদেবের বিশ্বাস অর্জুন ছাড়া অন্য কেউ সে ধনু ব্যবহার করা দূরের কথা, নাড়াতে পর্যন্ত পারবে না। প্রতিযোগীকে সভামধ্যস্থ লৌহশকট থেকে ঐ ধনু উত্তোলন করে শর সংযোগ করতে হবে। তারপর, সভাকক্ষের সর্বোচ্চ বিন্দুতে রক্ষিত লক্ষ্য বস্তুটি ঘূর্ণমান চক্রের ছিদ্রপথ দিয়ে পর পর পাঁচটি শরে যে লক্ষ্যভেদ সমর্থ হবে কৃষ্ণা তার জয়লব্ধ হবে। তার কণ্ঠেই দেবে সে বরমাল্য।

স্বয়ম্বর সভায় সমস্ত আয়োজন এবং প্রয়োজন নির্দিষ্ট পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের দিকে দৃষ্টি রেখেই দ্রুপদ করল। কিন্তু বাইরে থেকে দ্রুপদের মনের সংগোপন ইচ্ছাকে কেউ আঁচ পর্যন্ত করতে পারল না। খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়েই সে কাজ করছিল, তাই কেউ তার রন্ধ্র খুঁজে পেল না।

লোক চক্ষুর অগোচরে স্বয়ম্বর সভা একটা রাজনৈতিক মঞ্চ হয়ে উঠল। তিন বৃহৎ শক্তিজোটের রাষ্ট্র নেতা জরাসন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবলোকের ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা,

ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষিরা আর্যাবর্তের নৃপতিকুল, দক্ষিণ দেশের সকল অনার্য নরপতি-এক কথায় সমগ্র ভারতবর্ষের নৃপতিদের নিয়ে এই সমাবেশ। ফলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনীতির দলগত চেহারা একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে।

ব্যাসদেব মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখল কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভা এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সম্মেলন হয়ে উঠেছে। অম্বালিকা ভীষ্মের আ্যার্যবিদ্বেষের বহ্নিতে সারা ভারতবর্ষের আর্যসন্তানদের আহুতি দেয়ার মহান সংকল্পের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির যেন এই স্বয়ম্বর সভায় রূপ পাচ্ছে। পতঙ্গ যেমন মরণের টানে হুতাশনের দিকে যায়, তেমনি নিমন্ত্রিত নৃপতিকুল ধ্বংসের অনিবার্য আকর্ষণে সমবেত হচ্ছে এই স্বয়ম্বর সভায়। কারো মনে কোন প্রশ্ন নেই, সংশয় নেই। গোষ্ঠী-অগোষ্ঠী নেই, রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব নেই। শত্রু মিত্র'র কোন পরিচয় নেই। কন্যাপণের বিচিত্র শর্ত চুম্বকের মত তাদের সকলকে কেবল আকর্ষণ করতে লাগল।

নিরাপদ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ব্যাসদেব ছ'মাস পরে পুনরায় পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য একচক্রা নগরীতে যাত্রা করল।

স্বয়ম্বর সভাশেষ।

দ্রুত ধাবমান রথের ঘর ঘর শব্দ আর অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল ব্যাসদেব। দুটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে একসঙ্গে তার কানে বাজছিল। ঘোড়ার পায়ের খট্‌খট্‌ শব্দ ক্রমেই নিকটতর হল। ব্যাসদেবের বুকের ধক্‌ ধক্‌ শব্দের গতির সঙ্গে বেড়ে গেল। অবোধ কঠিন গভীর এক কষ্টের যন্ত্রণায় তার বুক ব্যথা করতে লাগল। ব্যাথাটা অম্বিকার রূপ ধরল যেন। তার ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, আরোপিত হচ্ছিল তাতে। তার কয়েক মুহূর্তের জীবনে অম্বিকা এক দুরন্ত অভিশাপ। অম্বিকা আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার ছায়া আছে। সেই ছায়া ধৃতরাষ্ট্র। লড়াইটা এখন তার সঙ্গে। তার সমস্ত সত্তা একমুখী স্রোতের মত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে কালসমুদ্রের মহাসংগমে। একটু একটু তার সব আয়োজন যেন নেপথ্যে নিঃশব্দে সারা হচ্ছে বিবিধ ঘটনায়। বুদ্ধি দিয়ে তার কোন ব্যাখ্যা হয় না। তবু, এক আশ্চার্যভাবেই হচ্ছিল তাকে দিয়ে। উজান বাইবার শক্তি তার নেই। কালস্রোত তাকে আকৃষ্ট করতে লাগল। আর সে চলল এক অমোঘ লক্ষ্যে, নিয়তির নির্দ্দেশে।

বুকের মধ্যে ঘোড়াদৌড়ের তীব্র পদধ্বনি শুনছিল, না সে শব্দ তার হৃৎপিন্ডের হচ্ছিল; তা নিরূপণ করতে গিয়ে ব্যাসদেবের বুকের ভেতরে ছটফট আরো বেড়ে গেল।

কুটীরের দিকে যে কেউ আসছে, ব্যাসদেব বুঝতে পারল। দ্রুপদের কোন দূত হয়ত আসছে তার কাছে। কিন্তু তার বার্তাটি কি হতে পারে ব্যাসদেব তাও আন্দাজ করতে পারল।

মনের মধ্যে ব্যাসদেবের নানা কথার ঢেউ।

ধ্যানে বসল ব্যাসদেব। শির দাঁড়া সোজা, চোখ মুদ্রিত। কিন্তু ধ্যানে মন বসল না। হৃদয়ের অভ্যন্তরে অপ্রতিহত আন্দোলনকে দমন করতে যেন চোখ বুজে থাকল। চোখ বন্ধ করলেই কল্পনায় সব দেখতে পায়।

স্বয়ম্বর সভা, অর্জুনের লক্ষভেদ, কর্ণ, দুর্যোধন এবং বিক্ষুব্ধ নৃপগণের দ্রুপদকে আক্রমণ, অর্জুনের প্রতিরোধ, ভীমের শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতা, প্রতিযোগিদের বিদায়, পাণ্ডবদের ভার্গব কুটীরে প্রত্যাগমন, শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎ, পান্ডবদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গভীর আত্মীয় সম্পর্ক পুনঃস্থাপন প্রভৃতি দৃশ্য একের পর এক চোখে ভাসতে লাগল।

এক অজানা স্পন্দনে ব্যাসদেবের হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত হতে লাগল। কিছু ভয়, কিছু বোবা আনন্দ। কিছু শিহরণ সে টের পাচ্ছিল। স্বয়ম্বরের কথা মনে পড়লেই ব্যাসদেবের শরীরটা কন্টকিত হয়ে উঠে পুলকে গৌরবে, আনন্দে। স্বয়ম্বর তার পরামর্শে আয়োজিত হয়েছিল মাত্র। কিন্তু বিধিলিপি দিয়ে তার শেষ হয়েছিল। শেষটা যে কতদূর রহস্যময় হয়ে উঠেছিল তা নিয়ে ভাববার কারো অবকাশ ছিল না।

কৃষ্ণা অর্জুনের জয়লব্ধ হল। কিন্তু অর্জুনের একার ভার্যা নয় সে। পঞ্চপান্ডবের ভার্যা। সকল পান্ডবের সমান অধিকার থাকবে তার উপর। যুধিষ্ঠিরের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে দ্রুপদের মত ব্যাসদেবও আশ্চর্য হল কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল অনেক।

পাঁচজনে মিলে ভাগ করে নাও জননীর এই আদেশ শিরোধার্য করতে, এক ভ্রাতার জয়লব্ধ পত্নীকে পাঁচজনে মিলে বিবাহ করার সমাজ বিগর্হিত প্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরের মত ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত নীতিনিষ্ঠ, ধর্মজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কেন অটল রইল? এই প্রশ্নটা ব্যাসদেবের মনকে ছুঁয়ে রইল। অনেক কথা মনে এল তার।

যুধিষ্ঠিরের মত রামচন্দ্রও পিতৃসত্যরক্ষা পালনে অটল ছিল। পিতার সহস্র আবেদন-নিবেদন, নিষেধ সত্ত্বেও রামচন্দ্র রুগ্ন, মুমূর্ষু পিতাকে ত্যাগ করে বনে গিয়েছিল। অযোধ্যা ত্যাগের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে শত্রুর সন্দেহ চাপা দিতে সরল পিতৃভক্তিকে এবং কৈকেয়ীর নির্বাসন প্রস্তাবকে সে আত্মগোপনের একটি সুন্দর উপায় করে তুলল। এর ফলে লোকে ঠকল, বিভ্রান্ত হল, কিন্তু তার নিজের গৌরব ও মর্যাদা বাড়ল। যুধিষ্ঠির রামচন্দ্রের জীবন থেকে অনুরূপ কোন শিক্ষা নিয়েছে কি?

মানুষ নিয়তির অধীন। নিয়তিকে কে কবে অতিক্রম করেছে? রামচন্দ্রর নিয়তি অভিষেকের দিনে নির্বাসিত করল তাকে। আবার ঐ নির্বাসন যেন রাবণের নিয়তির রূপ ধরে এল। আচমকা কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ব্যাসদেব। কৃষ্ণার সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ অনুরূপ কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে কি? প্রশ্নটায় ব্যাসদেবের বুকের ভেতর একটু দুরু দুরু করে উঠল।

ব্যাসদেব খুব গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে কল্পনায় কৃষ্ণাকে দেখতে লাগল। কৃষ্ণা অসামান্যা সুন্দরী। জ্যোৎস্নার মতো কমনীয়তা মাখানো তার শ্যামরূপে। আগুনের মতো তার যৌবন। একটি জ্বলন্ত শিখা যেন। রূপের আগুনে সে জ্বলজ্বল করছে। তার চোখ জ্বালা করা সে রূপ পুরুষের বুকে কামনার আগুন জ্বালায়। তাইত তার সামান্য ছোঁয়া লাভের জন্য পুরুষের বুকে আগুন জ্বলে। তার রূপবহ্নিতে আহুতি দিতে বীর সয়ম্বর সভায় ছুটে এসেছে। কত তরবারি খুলেছে, কত মানুষ আহত হয়েছে। কৃষ্ণার রমণীয় রূপের মদির আবর্ষণ এত গভীর এবং সূক্ষ্ম যে কোন শাসন মানে না, যুধিষ্ঠিরের মত আত্মসংযমী পুরুষের নির্বিকার চিত্তও পাবক শিখা-রূপিনী কৃষ্ণার রূপবহ্নির আগুনে উদ্ভাসিত হয়। কৃষ্ণার রূপ আর যৌবন প্রতিযোগী নৃপতিকুলের নিভৃত মনে যে আগুন জেলেছে, তা যে রাজ্যে রাজ্যে দাবানল হয়ে জ্বলবে না, কে বলতে পারে? ব্যাসদেবের মনের অভ্যন্তরে বেশ খুশি খুশি ভাব জন্মাল। হ্যাঁ, কৃষ্ণার রূপের আগুনে শুধু কৌরবরা ধ্বংস হবে না সারা ভারতবর্ষও একদিন মহাশ্মশানে পরিণত হবে। মহাকালের সেই অমোঘ দাবি মেটাতে কৃষ্ণার সৃষ্টি।

নির্জন কুটীরে ভারী নিঃশ্বাসের উত্থান পতনের শব্দে সচকিত হয়ে সে ধীরে ধীরে চোখ মেলল। দ্রুপদ ও কৃষ্ণাকে দেখে তার দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। শ্রীকৃষ্ণের মুখে অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব চোখে গভীর সম্মোহন।

ব্যাসদেবের ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না দুটি চোখ পেতে রাখল শ্রীকৃষ্ণের চোখের উপর। বুকে সমুদ্রের অস্থিরতা, কত কথা তার মনকে স্পর্শ করে গেল। সবিস্ময়ে বলল: যদুপতি তুমি! আমি স্বপ্ন দেখছি না ত? তোমার পায়ের ধূলি পড়ে আমার কুটীর স্বর্গ হল। আমিও ধন্য হলাম। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে বাসুদেব, তোমাকে বোঝাতে পারব না।

শ্রীকৃষ্ণের অধরে টেপা হাসি। বলল: মনের গহনের ইচ্ছেটাকে মহান করে প্রকাশ করে আপনি আমাকে শুধু লজ্জা দিলেন।

বাসুদেবও কথা বলল না। মানুষের মহান কর্মকে মনে রাখার চেয়ে সৎকর্ম আর কিছু নেই।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ এক অনির্বচনীয় হাসিতে দীপ্তিময় হল।

দ্রুপদ এসব দিকে লক্ষ্য করল না। তার ভেতরটা টাটাচ্ছিল বিনা। ভূমিকার
নল : মহর্ষি, কৃষ্ণার কষ্ট যে আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না। পঞ্চপাণ্ডবের
াখে সে একটা মেয়ে মানুষ। তাদের শুধু সঙ্গিনী। মেয়েটার এই অমর্যাদা
়প হয়ে কেমন করে সইব? অথচ একদিন তুমিই পরামর্শ দিয়েছিলে অর্জুন
র যোগ্য বর। অর্জুনকে দিয়ে দ্রোণের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার শ্রেষ্ঠ
াস্ত্ররূপে ব্যবহার কর কৃষ্ণাকে। তোমার কথা মত আমি ধনুর্বাণ এবং
ক্ষ্য তৈরী করেছি। ধনুর্বাণের ব্যবহার তুমিই তাকে শিখিয়ে দিয়েছ। তৃতীয়
ান্ডব বীর, মহা শক্তিধর। কর্ণ তার সমকক্ষ। তাকেই তোমার ভয় ছিল। তার
তে বিরাগ সৃষ্টির জন্য কৃষ্ণাকে বলেছি কুলশীল মানে যে নিকৃষ্ট তাকে পতিরূপে
াণ কর না। কৃষ্ণা আমাদের সে সাধ পূর্ণ করেছে। কিন্তু তোমার মনোনীত
র তৃতীয় পান্ডব তাকে কি দিতে পারল? কৃষ্ণার বুকের মধ্যে বলিদানের নাকাড়া
ছে। পিতা হয়ে আমি কি করে স্থির থাকব? এক নারীর পাঁচ স্বামীর মত এমন
সামাজিক আচরণ পিতা হয়ে রাজা হয়ে কেমন করে অনুমোদন করি? সত্যাশ্রয়ী
ুধিষ্ঠির জননীর সত্যভঙ্গ করবে না কখনও। জননীর আদেশ শিরোধার্য করতে
াবদ্ধ পরিকর। তুমি পান্ডবদের পিতামহ। শুধু তুমি পার তাদের নিবৃত্ত
রতে। একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন আর অভিযোগ করে দ্রুপদ উত্তেজনায় হাঁফাতে
গেল। জোরে জোরে তার শ্বাস পড়ছিল। একটা বোবা কান্নায় তার বুক
ঠানামা করছিল।

বেদব্যাস একটু সংকোচ বোধ করছিল। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
স্মিত মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : যদুপতি, তুমি কিছু বলবে না?

কৃষ্ণ একটু ভেবে বলল : বিধি নির্বন্ধ কে কবে অতিক্রম করেছে মহর্ষি?
যোধ্যায় রাজা রামচন্দ্র অভিষেকের দিনে হলেন নির্বাসিত। মানুষ বিধিলিপির
াস। পাণ্ডবদের কথাই ধর না। তারা রাজপুত্র এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী।
য়ও রাজ্যহীন, বনবাসী, ভিখারী। অদৃষ্টই তাদের ভিখারী করেছে। সেজন্য
ন্তু কাউকে দোষ দেই নি তারা। অদৃষ্টের দোষেই তারা কষ্ট ভোগ করছে।
ধিলিপিকে শুধু মেনে নিতে হয়। বিধাতার ইচ্ছা নির্ণয় করা মানুষী শক্তিতে
ম্ভব নয়। তবে এটুকু বুঝতে পারি একেবারে মাটি থেকে উঠে এসেছে তারা।
াগ্য বিপর্যয় না ঘটলে এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তাদের হত না।

দ্রুপদ নিরুত্তর। উদ্দীপ্ত চোখে বিস্ময়। বুকের ভেতর তার একটা অসহায়
ষ্টকর অবস্থা।

কৃষ্ণের কথাটা শুনে দ্রুপদ খুব স্থির চোখে অনেকক্ষণ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বলল :
দুপতি তিলোত্তমার অসামান্য রূপলাবণ্য সুন্দ-উপসুন্দ'র ভ্রাতৃপ্রীতির সংকট ঘনিয়ে
তুলল। ভ্রাতৃপ্রীতির চেয়ে বড় হল জীবনের দাবি। জীবনের সব কিছু সমানভাবে

ভাগ দেয়া যায়, কিন্তু নারীর সঙ্গ, প্রেম ভালবাসার কোন ভাগ কিংবা অংশীদা কল্পনা করা যায় না। সুন্দ-উপসুন্দের সেই পুনরাবৃত্তি পাণ্ডবদের জীবনকে বিষম করে তুলবে।

কৃষ্ণা একটু থমকে চেয়ে থাকল। তারপর একটা ভারি সুন্দর হাসি হাসল বলল : মহারাজ, পান্ডবদের সঙ্গে সুন্দ-উপসুন্দের কোন তুলনা চলে না। পান্ডবে জীবন থেকে পাঠ নিয়েছে। তাদের জীবনে বেশীভাগ সময় রাজপ্রাসাদের বাই অরণ্য পরিবেশে কেটেছে। অরণ্যের জীবন মুক্ত স্বাধীন এবং উদার। সেখানে কো অবগুন্ঠণ নেই, ছলনা, প্রতারণা, মাৎসর্য্য কিছু নেই। এই অরণ্য পরিবেশে উপলব্ধি করা সম্ভব, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ঐক্য ও সহযোগিতা চাই জংলীদের সমাজে কোন কিছুর উপর কারো একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা স্বত্ব-স্বামীত্ব নেই সব সম্পদের উপর গোষ্ঠীর সকলের সমান অধিকার, সমান ভাগ। কুন্তী ছোটবেল থেকে তাদের শিখিয়েছে যা কিছু ভোগ্য তা পাঁচজনে ভাগ করে নেবে। যা কিছ শক্তি তাও পাঁচজনের। এই ঐক্যবোধই দুর্দ্দিনে ও বিপদে আপদে তাদের রক্ষা করবে। এই শিক্ষাই পান্ডবদের জীবনে রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে। দ্রৌপদী তাদে বিশ্বস্ততা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের এক দুরন্ত পরীক্ষা।

ব্যাসদেব নিজের মনে মাথা নাড়ল। কৃষ্ণও যে তার মত পঞ্চপান্ডবের স দ্রৌপদীর বিয়ে চায় এটুকু তার বক্তব্য থেকে বুঝতে কষ্ট হল না। তবে এক নারী বহুপতি থাকার যে সমস্যা তা নিয়ে ব্যাসদেবের মনে অস্পষ্ট আলো আঁধারের সীমা অনেক প্রশ্ন উত্তর না পেয়ে বারংবার ফিরে এল। ব্যাসদেব অম্বিকার প্রেম, ঘৃ প্রত্যাখানের অভিজ্ঞতা যেমন তাকে দিবারাত্র জ্বালায় তেমনি পঞ্চস্বামী দ্রৌপদী নিভৃত মনের এক গোপন জ্বালা হয়ে থাকবে। সে দাহ শীতল করবে কি দিয়ে দ্রৌপদীর অন্তরের জ্বালা আর যন্ত্রণা শুধু পান্ডবদের বিব্রত করবে না, তার চারপাশে পরিবেশকে বিষিয়ে তুলবে। স্বয়ম্বরে যে বিরোধ ও বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রতিহিংসা দা বাঁধল পান্ডব ও কৌরবের সঙ্গে এবং অন্যান্য প্রতিযোগী নৃপতিদের সঙ্গে দ্রৌপদী তা ইন্ধন যোগাবে চিরকাল। গোটা ভারতবর্ষে প্রতিহিংসা, বিদ্বেষের আগুন ছড়ি যাবে। ভষ্ম হবে আর্য্যাবর্তের বিশাল সভ্যতা সংস্কৃতি। ব্যাসদেবের বুকে ভেতর একটা উত্তেজিত আনন্দের কাঁপুনি টের পাচ্ছিল। একটা যন্ত্রণার মত দ দপ করছিল বুকের খাঁচায়। কৃষ্ণা আর্য্যাবর্তের ঘরে ঘরে একদিন আগু জ্বালিয়ে তুলবে এই অনুভূতিতে তার রক্তস্রোত কিছু উদ্দাম হল। বুক গু গুরু রবে ডেকে উঠল। চোখ বুজে সে অপ্রতিরোধ্য আনন্দের ঢেউ ও বিস্ময় চ করে নিজের মধ্যে লুকোনো চেষ্টা করল। ব্যাসদেব কয়েক পলক চোখ বন্ধ ক কৃষ্ণার মুখটা দেখতে পেল কল্পনায়। কন্যাটি যেন অন্য এক পরিমণ্ডল থেকে আসা বড্ড অচেনা, বড্ড অন্যরকম।

ব্যাসদেব মৌন বিস্ময়ে দ্রুপদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একটু হাসল। লল ঃ দ্রুপদ, অদৃষ্টলিপিকে কে কবে ফাঁকি দিতে পারল? যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব শাস্ত্রীয় কিছু নয়। অসামাজিকও নয়। বৈদিক যুগে এক নারীর বহুপতি গ্রহণের রওয়াজ ছিল। মুনিকন্যা ব্রাহ্মী একসঙ্গে দশজনকে পতিত্বে বরণ করেছিল। র্বাচীনকালে গৌতমী জটিলা সাতজন ঋষিকে পতি করেছে। সুতরাং এ বিবাহ াস্ত্রসিদ্ধ এবং নিয়তি নির্ধারিত। তুমি আমি নিমিত্ত। তুমি আমি শুধু কালের ারা, নিয়তির দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছি। দ্বিধা ত্যাগ করে মহাকালের বোধন পুজার ায়োজন কর।

দ্রুপদ খুব বিস্বাদ অনুভব করল মনটায়। ভিতরটা তার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কন্তু কথা বলার মত কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। বিমূঢ়ের মত ব্যাসদেবের দিকে চয়ে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল ঃ ভবিতব্যও হয়ত। তবু, আশংকা, উৎকণ্ঠা ামাকে নিশ্চিত থাকতে দিচ্ছে না। আমি সব অন্ধকার দেখছি। মেয়েটাকে ন্ধকারেই নিক্ষেপ করতে হবে। আমি শুধু উপলক্ষ্য।

কৃষ্ণ করুণ মুখে মাথা নাড়ল। চুপ করে একটু ভাবল। তারপর একটা ীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ বন্ধু, অমন করে তাকিয়ো না। বলার কিছু নেইও। কী লব? পাণ্ডবের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিজয়লক্ষ্মী কৃষ্ণাকে তারা পাঁচটি হৃদয় শতদল দয়ে আরতি করতে চায়। প্রেম শুধু চিত্ত নন্দিত করে না, চিত্তকে নিবেদিত করাও প্রমের অন্যতম ধর্ম। পঞ্চপাণ্ডবের প্রেমের কণ্ঠহার হয়ে কৃষ্ণা তাদের সারা ারতের অচল, অনড় জনরথ টেনে নিয়ে যাওয়া শক্তি ও প্রেরণা জাগানোর মন্ত্র যাগাবে। সে মন্ত্রের শক্তি তার রূপের ঔজ্জ্বল্যে, ব্যক্তিত্বের তেজে, মোহের তীব্র াকর্ষণে, প্রেমের দীপ্তিতে। সখা, কৃষ্ণা শুধু তোমার প্রতিহিংসার আগুন জ্বালানোর শিখা নয়, সে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, ভাগ্যহারা মানুষে মুক্তির শাল। তুচ্ছ মানুষী বাসনার অদৃষ্টের করুণার প্রসাদ কিছু বর্তেছে তাই দবতার শক্তিতে সে বড়। আরো বড় রিপুর আকর্ষণে। এটা কৃষ্ণার জীবনে কখনো াশির্ব্বাদ, কখনো অভিশাপ। কিন্তু মানুষের জীবনে সব প্রচেষ্টা আর পুরুষকারের পছনে বিধাতার মুচকি হাসির মত নিয়তি আছে। কোন মানুষ নিয়তি ছাড়া য়। দৈবী ইচ্ছার উপরে মানুষের কোন হাত নেই। কোন শক্তি নেই, সেই চ্ছাকে অবহেলা করে। মরভাগ্যে দৈব-ইচ্ছার ফল কৃষ্ণা ও তার পঞ্চস্বামী। খোলা নেই তুমি এ বিবাহের আয়োজন করতে পার।

বুড়ো বয়সে কন্যার জন্যে উদ্বেগে দ্রুপদের মনটা কেমন হয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে দ্রুপদ উথলে উঠা একটা কষ্ট নিবারণ করল।

কৃষ্ণ দ্রুপদের বিষণ্ণ মলিন মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণেকের একটা প্রবল সমবেদনা অনুভব করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল সখা পাণ্ডবদের রাজনৈতিক অধিকার

লাভের মশালচী বলে ইতিহাসের পাতায় তোমার নাম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। এঃ
তোমার সামনে অনেক দায়িত্ব, কর্ত্তব্য। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করলে হবে কেন
রথ আবার ছুটল। সরস্বতীর ধার ঘেঁষা রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থেকে দু'প
এই দারুণ দুঃখের মধ্যেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপ জ্বালা ভরা চোখে দেখছিঃ
আর নিজে স্নিগ্ধ হচ্ছিল।

কক্ষের একপাশে নক্সা করা মেহগিনি কাঠের তৈরী মনোরম আরাম কেদারা
সমস্ত শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র। অন্যপাশে স্বর্ণনির্মি
পালঙ্কের উপর বসেছিল গান্ধারী। দু'জনের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল ন
গান্ধারী ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে আছে দরজার দিকে। চক্ষু আবরণী দিয়ে চোখ ঢাক
জন্য মুখটা একটু নত। ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিহীন চোখ দুটি গান্ধারীর মুখের উপ
ন্যস্ত। শূন্যচোখ। কেমন যেন অন্যমনস্ক, কি ভাবছে, কে জানে?

ঘরে ঢুকতে বিদুরের বুক কেঁপে উঠল। তার মৃদু শ্বাসপতনের শব্দ ধৃতরাষ্ট্র
পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারল। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা তাকে ঢেউ
দিয়ে গেল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল: কে? বিদুর? বিদুর এসেছ:
এস ভাই। আমি গান্ধারী তোমার প্রতিক্ষাতে বসে আছি। সময় কাটে না আর।
বড় দীর্ঘ আর দুঃসহ মনে হয়। দুর্যোধন, কর্ণ ফিরেছে? পাঞ্চাল রাজকন্যা
কার জয়লব্ধ হল? দুর্যোধন, না কর্ণের?

বিদুর চোখ বুজে শরীরের গভীরে ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাগ্র ব্যাকুল জিজ্ঞাসার প্রতিটি
শব্দের ঝংকার স্পর্শ করে গেল। পলকের জন্যে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে যেন দেখিয়ে
দিয়ে গেল ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়। বিদুর চোখ খুলে হাসল। কিন্তু তার সে হাসি
দেখার দৃষ্টি ছিল না কারো। ইতস্তত: ভাবটা কাটিয়ে বলল: মহারাজ, স্বয়ম্বর
সভায় এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি
না। বারণাবতের অগ্নিদাহে দগ্ধ জতুগৃহে আমরা যে ছ'টি দগ্ধ মৃতদেহ পেলাম,
সে কার? পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণদের আসনে যে পাঁচটি তরুণ বসেছিল
তারা কে? নিজের চোখ নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল কি? সব কেমন
গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সেদিনের দেখাতেই বোধহয় ভ্রম জন্মেছিল। কি জানি?

বিদুর কী বলছে তা কিছুতেই বোধগম্য হল না ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু ধীর, স্থির
মানুষ। বেশী কথা বলা বা তর্ক করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই খানিকক্ষণ
বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। খুব বিস্বাদ অনুভব করছিল
মনটায়। মাথা নেড়ে বলল: আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

গান্ধারীও ধৃতরাষ্ট্রের মত মাথা নাড়ল। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল: দেবর, কোন কথা সোজা করে বলতে পার না তুমি। এটা তোমার চিরকালের অভ্যাস।

অধীর উৎকণ্ঠায় ধৃতরাষ্ট্রের ভিতরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাই একটু রূঢ় স্বরে বলল: আমি চাইছি এক উত্তর, তুমি শোনাচ্ছ আর এক কাহিনী। পরিষ্কার করে বলতে হবে, পাঞ্চালী কার হল?

বিদুর অপ্রস্তুত অবস্থায় চুপ করে রইল। তারপর বলল: মহারাজ, আমার অবাক লাগছে, দুর্যোধনের মত বীর লৌহশকটে রক্ষিত একটা ধনু আর শর তুলতে পারল না কেন? দুর্যোধন কেন, বাঘা বাঘা বীর—জরাসন্ধ, শিশুপাল, শল্য—আর কত নাম করব, এদের কেউ ঐ মায়া ধনু তুলতে পারল না। কিন্তু কর্ণের বেলায় ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। লৌহ শকটের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করে কর্ণ ধনু-শর স্পর্শ করল, অমনি কৃষ্ণা ঘোষণা করল, সূতপুত্রে বরণ করব না কভু। অপমানে কর্ণের মাথা হেঁট হল, লজ্জায় মুখখানি রাঙা হয়ে গেল। আহা বেচারা! তবু বীরের মলিন মুখে এক অদ্ভুত কষ্টের হাসি লেগে রইল। কর্ণের ও হাসি, আর চাহনিকে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। কর্ণের জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হল।

ধৃতরাষ্ট্রের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। গান্ধারী গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। দুজনের চোখ মুখে দুশ্চিন্তা। বিদুর সেটা লক্ষ্য করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল বিদুর ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ভয় পাচ্ছিল। নিজের ভিতরে এই পরিবর্ত্তনে সে কম অবাক হল না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। ধৃতরাষ্ট্র গম্ভীর মুখে বলল: তা হলে কৃষ্ণা কার জয় লব্ধ হল?

বিদুর খুব সহজ ভাবে বলল: কৌরবের? হস্তিনাপুরের রাজলক্ষ্মী হল সে।

ধৃতরাষ্ট্র চমকে উঠল। তার ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হল এখন; এই মুহূর্তে। নিজের ভেতর একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল সে। শরীরের ভেতর অব্যক্ত এক আনন্দের যন্ত্রণা। ব্যস্ত ব্যাকুল স্বরে উচ্চারণ করল: সেই ভাগ্যবান তবে কি দুঃশাসন?

বিদুর একথার কোন জবাব দিল না। নিজের মনে একটু হাসল। সামান্য একটু কথা মানুষের মনের ভেতর কত ঝড় বইয়ে দিতে পারে। একই সঙ্গে নিজের সঙ্গে নির্মম দূরত্ব রচনা করে অন্যের অভ্যন্তরে গভীরতম স্থানে তাকে আশ্চর্য ভাবে পৌঁছে দেবার কৌশল তার জানা আছে। বিদুর স্নেহময় হাতখানি দিয়ে ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় গভীর চুলের ভেতর বিলি কেটে দিতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে মৃদু স্বরে বলল: ব্রাহ্মণদের আসন থেকে একটি তরুণ উঠে এল। সে বীর্যশুল্কে পাঞ্চালীকে জয় করল।

ধৃতরাষ্ট্র একটা শীতলতা অনুভব করল। ভিতরটা তার অপমানে পুড়ে যাচ্ছিল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ ব্রাহ্মণ ?

বিদুর একটু হাসার চেষ্টা করল। বলল ঃ একটুও না। সভাশুদ্ধ লোকের প্রশ্ন কে এই ব্রাহ্মণ ? দ্রুপদেরও বিস্ময়ের অন্ত নেই! বিজয়ী ব্রাহ্মণের পাশে স্বাস্থ্যবান, বিশাল দেহী ঐ যুবা পুরুষটি কে ? ব্রাহ্মণদের সারিতে যে তিনজন যুবক উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করছে তারা কে ? দেবী, আমার সব কেমন গুলিয়ে গেল। জতুগৃহে পান্ডবেরা তা-হলে পুড়ে মরেনি ? পাঞ্চালী-জয়লব্ধ ঐ বিপ্র যে অর্জুন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ধৃতরাষ্ট্র উত্তেজিত হয়ে আরাম কেদারায় টান টান হয়ে বসল। এস্তভাবে বলল ঃ পান্ডবেরা জীবিত ?

ধৃতরাষ্ট্রের মুখে ভয়, আর আতঙ্ক। একটা কিসের অস্থিরতায় তার ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ধৃতরাষ্ট্রের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিদুর একটু হাসল। কিন্তু একটু ভাবলও। বলল ঃ কর্ণ তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনল। যথার্থ সত্য কথাটা সে শুধু বলতে পারল। দ্রুপদ জেনেশুনে নৃপবর্গকে আপমান করেছে। পান্ডবেরা বেঁচে আছে। এই সত্যটা প্রকাশ করতে এত নিমন্ত্রণের ঘটা। কন্যাপণের সর্তও তাই বিচিত্র। পান্ডবদের স্বার্থে এবং তাদের নিরাপদ আত্মপ্রকাশের এই পটভূমি দ্রুপদের নিজের সৃষ্টি।

ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ। ধৃতরাষ্ট্র নিজের মনে দু'বার উচ্চারণ করল। তারপর একটু গম্ভীর ও ম্লান স্বরে বলল ঃ কিন্তু পান্ডবদের'ত কখনো শত্রুর চোখে দেখিনি। তাদের কোন অনিষ্ট চিন্তাও করি না। তবু লোকের চোখে আমাকে তারা অপরাধী করে রাখল। জতুগৃহ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তারা হস্তিনায় ফিরল না কেন ? আত্ম-গোপন করল কোন্ মতলবে ? তবে কি বুঝব, গোপনে গোপনে সংগঠিত হয়ে কোন রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটাতেই তারা আত্মগোপন করেছিল ? দ্রুপদের ছত্রছায়ায় এই আত্মপ্রকাশ তাদের গৌরব কিছু বাড়ায়নি বরং সত্যটাকে প্রকাশ করেছে। তারা হস্তিনাপুরের সঙ্গে বিরোধ চায়। হস্তিনাপুরের সিংহাসন নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবতীর্ণ হওয়ার এ শুধু সূচনা। দ্রুপদ নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পান্ডবদের রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা মদত দিয়েছে। পান্ডুপুত্রদের এই স্পর্ধায় আমার হৃদয় বিচলিত।

বিদুর কিছুক্ষণ নতমুখে থেকে কথাগুলো মনের ভেতর গুছিয়ে নিল। তারপর বলল ঃ মহারাজার ক্ষোভ থাকা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সব কিছুর পেছনে কারণ থাকে। হয় ত এই ঘটনার জন্যে আমরাই দায়ী।

ধৃতরাষ্ট্রের ভুরু কুঁচকে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করল ঃ এর অর্থ কি বিদুর।

বিদুর ভ্রূক্ষেপ না করে বলল: চিরকাল সত্য বলিছি, হিতৈষীর কাজ করেছি। ধর্ম পথে চলেছি। আজ সকলে জানে, কুরু বংশ ভাগ হয়ে গেছে। পাণ্ডু পুত্রেরা পাণ্ডব হল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ধার্তরাষ্ট্র না হয়ে কৌরব হল কেন? খুব কৌশলে পাণ্ডদের কৌরব বংশ থেকে আলাদা করা হল। তারা কৌরববংশের কেউ নয়, একথাটা বোঝাতে বারাণাবতে পাঠান হল।

ধৃতরাষ্ট্র অস্বস্তির মধ্যে কোন কথাই বলতে পারল না কিছুক্ষণ। অবাক হওয়ার ভান করে বলল: বিদুর এসব তোমার কল্পনা। তারা আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। কখনও অন্য চোখে দেখি না।

বিদুর একটু হাসল। বলল: মানুষে মানুষে কোন স্থায়ী সম্পর্ক নেই। আত্মীয়তা সংস্কার মাত্র। আমি এই জীবনে তা বহুবার প্রত্যক্ষ করিছি। একটু আগেই মহারাজার প্রশ্ন ছিল, পাঞ্চালী কার জয়লব্ধা হল? আমি বলি কৌরবের। হস্তিনাপুরের রাজলক্ষ্মী সে। বিপ্রবেশী যে যুবক লক্ষ্যভেদে সমর্থ হল তাকে নিরুদ্দিষ্ট পাণ্ডবদের কেউবলে মনে হল না কেন? আমিত কখনও জ্যেষ্ঠের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিনা। রাজার প্রাপ্য মর্যাদাই দিয়ে থাকি। তবু পাঞ্চালীকে হস্তিনাপুরের রাজলক্ষ্মী বলায় তুমি কেমন বিচলিত হলে। কেন? আসলে তোমার নিজের মনেই তাদের কোন ঠাঁই নেই। পাণ্ডবেরা নিজেদের অনুভূতি দিয়ে হয়ত টের পেয়েছিল, তারা হস্তিনাপুরের পরগাছা, এই বংশের কেউ নয়। তাই তাদের মোহভঙ্গ হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। হঠাৎ ঘরের ছাদ উড়ে গেলে মানুষের যেমন অসহায় লাগে তেমনি বারাণাবতে গিয়ে তারা হঠাৎ হস্তিনাপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই হয়ত অভিমানে জতুগৃহ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পিতৃব্যের কাছে ফেরেনি। তোমার আমার, ও পিতৃব্য ভীষ্মের উপর অভিমান নিয়ে তারা হয়ত বন্ধু খুঁজে বেড়িয়েছে। নিজেদের পৌরুষ বলে তারা ভাগ্যকেই ফেরাতে চেয়েছে। একে দোষ না বলে, অভিমান বলাই ভাল।

পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র তেমন কর্তব্য করেনি বলে ভিতরে ভিতরে নিজেকে দোষী মনে করল কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। একটা তীব্র অপমানে তার বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল। এব ঝলক বিদুরের দিকে চেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে থমথমে মুখে বলল: যদি আমাকে দোষী ভেবে খানিকটা স্বস্তি পাও তো, পাও তুমি।

বিদুর তৎক্ষণাৎ বলল: ঠিক এরকম একটা নির্বিকার ঔদাসীন্যে তুমি তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছ। অকৃতজ্ঞতা পাণ্ডবদের স্বভাবে নেই। তারা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলেই হস্তিনাপুরের কোন করুণা প্রার্থনা করেনি।

ধৃতরাষ্ট্র তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলল: আমাকে অপদস্থ আর অপমান করতেই তারা বারণাবতের আগুন লাগিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আমার গৌরব মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন

করতেই তারা হস্তিনাপুরের শত্রু দ্রুপদের কৃপা প্রার্থী। তারপর, সহসা একটা বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা বোধ হয় প্রিয়জনের কাছ থেকে অকারণ আঘাত পাওয়ার বেদনা। আমি জানি, তুমি পাণ্ডবদের আমার চেয়ে অধিক স্নেহ কর। কিন্তু অত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। তুমিও নিশ্চয়ই বোঝ যে, পাণ্ডবেরা যা করল তাতে হস্তিনাপুরের মান সম্মান নষ্ট হল। আর আমাকেও লোক সমক্ষে চূড়ান্ত অপমান করল। আমি তাদের বৈরী, আত্মপ্রকাশের বিঘ্ন এই ধারণা নিয়ে বাইরের দেশের মানুষ ফিরে গেল। এরপরে যদি অসন্তুষ্ট হয়ে রাজ্য সিংহাসনের অধিকার তাদের হাতে ছেড়ে না দিই, তুমিই আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে।

বিদুর স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধৃতরাষ্ট্র ইচ্ছে করেই তার মনের গতিবিধি বুঝবার জন্যে প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। এখন কি বলবে? তার মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

বিদুর জানে ধৃতরাষ্ট্র দুর্বল প্রকৃতির মানুষ না। মানুষ পটাতে এবং তাকে নিজের অনুকূলে টানতে ধৃতরাষ্ট্র ওস্তাদ। ধৃতরাষ্ট্রের এহেন চতুর কূটনৈতিক প্রশ্নে সে একটু থমকে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। স্তব্ধতা ভেঙে বলল: অত কঠিন হয়ো না তাদের উপর। তুমি কঠিন হলে তারা কোথায় দাঁড়ায় বলতো? বিদুরের গলাটা একটু দুর্বল শোনাল।

নয়

বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের বাইরে যমুনাতীরে বিস্তীর্ণ অরণ্যাঞ্চল খান্ডববনে যুধিষ্ঠিরকে নতুন রাজ্য স্থাপনের অনুমতি দিল। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ও উৎসাহে ভারত শ্রেষ্ঠ স্থপতি ময়দানবের পরিকল্পনায় এবং পান্ডবদের উদ্যোগে নতুন রাজ্য ও রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হল। নবনির্মিত রাজ্যের অধিশ্বর যুধিষ্ঠিরের খ্যাতি ও গৌরব যত ব্যাপ্ত হতে লাগল, ততই দেশ-দেশান্তর থেকে নানা শ্রেণী ও নানা বর্ণের মানুষ সেখানে এসে বসবাস করতে লাগল। এবং অল্পকালের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ এক বিরাট জনপদে পরিণত হল।

দেখতে দেখতে ইন্দ্রপ্রস্থের বয়স হয়ে গেল বিশ বছর। দ্রৌপদীর বিবাহের পর পান্ডবদের জীবনে আরো পঁচিশটি বছর কাটল। যুধিষ্ঠির বিশ বছরের অধিক রাজত্ব করছে। ইন্দ্রপ্রস্থ এখন আর শিশুরাজ্য নয়। ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে, সমৃদ্ধিতে, ব্যাপ্তিতে তার যৌবন টলটল। সুখ সমৃদ্ধিতে সমগ্র ভারতরাজ্য গুলিকে ছাড়িয়ে গেল। ভীম অর্জুনের মত বীর আছে তার। তাদের দ্বারা গঠিত ও শিক্ষিত চতুরঙ্গ সেনাদল আছে ইন্দ্রপ্রস্থের বিশ্বস্ত প্রহরী। তবু যুধিষ্ঠির কোন বৃহৎ রাজ্য আক্রমণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের রাষ্ট্রভুক্ত করতে চেষ্টা করেনি। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে এবং খুব নিকটের কিছু কিছু রাজ্য পারস্পরিক প্রীতি, মৈত্রী ও সহযোগিতার ভাব নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নিজ নিজ ক্ষুদ্র সীমায় বসবাস করতে লাগল।

রাজ্য ও রাজনীতিতে যুধিষ্ঠিরের এই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মনোভাব ব্যাসদেবকে ভাবিয়ে তুলল। যত ভাবল তত বুকটা আনন্দে বিষাদে উথাল পাথাল করল। চোখের উপর দিয়ে একটা অন্তহীন সময় বড় মন্থর গতিতে চলে গেল। পান্ডবদের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে ধৃতরাষ্ট্রের উপর অম্বিকার অপমানের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেয়ার কত স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ছিল তার মনে। যত দিন যেতে লাগল তত হতাশা বাড়তে লাগল। বিষাদে মনটা ভরে গেল। তাহলে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে তাকে? আর কতকাল? দৈব ভেবে যাকে নিশ্চিন্ত ছিল, সে কি নিছক মনগড়া কল্পনা তার? কোন সত্য কি নেই তাতে?

ব্যাসদেবের চেষ্টা করতে হল না। প্রশ্নের উত্তর, আপনা থেকেই বুকটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। পান্ডবদের সব কাজই আশ্চর্যের মনে হল। দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও কুলের গৌরব ও সুনাম রক্ষার জন্য গনতান্ত্রিক আদর্শকে ভারতময় করার

দায়িত্ব দিয়ে অর্জুনকে ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে পাঠাল। নির্বান্ধব পাণ্ডবের মিত্র ও অস্ত্র সংগ্রহের এর চেয়ে ভাল কৌশল আর কিছু ছিল না। অথচ, লোকে জানল পঞ্চভ্রাতা কৃষ্ণার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সহবাসের যে নিয়ম ও শর্ত করেছিল, অর্জুন তা ভঙ্গ করার জন্যেই বনে নির্বাসিত হল। কৃষ্ণা বিজয়ী অর্জুন, পাণ্ডবের গৌরব, গর্ব, এবং বল ভরসা এবং যুধিষ্ঠিরের প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও নীতি ভঙ্গের কঠোর শাস্তি তাকেও ভোগ করতে হল। ভাইবলে যধিষ্ঠির ক্ষমা করল না তাকে। এর ফলে সৎ-শাসন নীতির এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হল মানুষের মনে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক কৌশল এবং চাতুরী ব্যাসদেবকে চমৎকৃত করল।

ব্যাসদেব-নিজের মনে পাণ্ডবদের কার্যের আরো পর্যালোচনা করল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সৌভ্রাত্র স্থাপন করে তৃতীয় পাণ্ডব কার্যতঃ কৃষ্ণের অখণ্ড ভারত ভূমি গঠনের স্বপ্নকে শুধু এগিয়ে নিয়ে গেল না আর্যাবর্তের বাইরে দক্ষিণে, পশ্চিমে ও পূর্বদেশীয় রাজ্যগুলিতে তাদের নতুন নতুন মিত্রের সন্ধান করল। কার্যতঃ আর্যাবর্তের পরিধিতে কোন রাজ্যই নবগঠিত পাণ্ডব রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কল্পনা করে না। একশতটি ছোট বড় রাজ্য জরাসন্ধে রাজছত্র'র অধীনে। জরাসন্ধ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ইন্দ্রপ্রস্থের জন্মসময় থেকেই লেগেছিল। দুর্যোধনের মতি-গতি ভাল নয়। অদূর ভবিষ্যতে তার ও জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। এরকম ভাবনা চিন্তা করেই যুধিষ্ঠির মনে মনে একটা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে। অর্জুনকে সেই কাজটাই গোপনে সম্পন্ন করতে বনবাসে পাঠিয়েছে। অর্জুনও আর্যাবর্তের বাইরে অনার্যদের মধ্যে পাণ্ডবদের রাজনীতি ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করে দ্বারকায় উপস্থিত হল। যাদবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক মৈত্রী সম্পর্কে আরো মজবুত ও স্থায়ী করতে কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার হৃদয় জয় করে তার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল। তেরো মাসের বনবাসে জীবনে ভারতবর্ষের তিন প্রান্তে তিনটি মুগ্ধা রমণীকে শুধু বিবাহ করল না তাদের সঙ্গে আপন বংশের রক্তধারা মেশাল। এর চেয়ে বড় বিজয় আর সাফল্য কি হতে পারে?

ব্যাসদেবের বিস্ময়বোধ স্তিমিত হল না। বিরাট সংঘর্ষের একটা পরিবেশ একটু একটু করে শত্রুর অগোচরে তৈরী করে নিয়ে যুধিষ্ঠির নির্বিকার ও নির্লিপ্ত রইল। থাকাই কথা। যাদের কৃষ্ণ সহায় তাদের আবার ভাবনা কি? কৃষ্ণ নীরব কর্মী। পাণ্ডবদের পথপ্রদর্শক। পাণ্ডবদের হিতসাধনের প্রতি দৃষ্টি রেখে নীতি নির্ধারণ করতেই যেন তার দেরী হচ্ছে। এজন্যে নিরাশ বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই তার।

ব্যাসদেব নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়ে হঠাৎ শিউরে চোখ বুজল। দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল। ভীমের সারা অঙ্গটা তপ্ত লোহার মত গণগণ করছে। চোখ

দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। মুখখানা নিষ্ঠুরতায় কঠিন হয়ে গেছে। জরাসন্ধকেও ভয়ংকর একটা রাক্ষসের মত দেখাচ্ছিল। দুরন্ত বিক্রম নিয়ে দুই মহাবল লড়ছিল। ধরাশায়ী জরাসন্ধ উঠে দাঁড়ানোর আগে ভীম দুটি পা ধরে প্রাণপণে তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। আর তীব্র রুধিরসিক্ত জরাসন্ধ তীব্র যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগল। করুণসুরে কাতরাতে লাগল। কিন্তু ভীম তখন খুনের নেশায় উন্মাদ। এসব দৃশ্য সে কিছু দেখছিল না বা তার কানে শুনছিল না জরাসন্ধের বিলাপ। শরীরের পেশীগুলো তার ফুলে ফুলে উঠল। রক্তে রাঙা হয়ে গেল তার দুই হাত।

দৃশ্যটা ব্যাসদেব কল্পনায় দেখল। ভিতরটা যেন ফুঁপিয়ে উঠল। জরাসন্ধের অসহায় মৃত্যুবরণ আর ভীমের নিষ্ঠুরতায় সে কেমন বোবা হয়ে গেল। একটা মানুষ এ শক্তি পায় কোথা থেকে? এই বল শরীরে কখন ভর করে? ব্যাসদেবের মনে হল, মৃত্যুর এক আবছা অন্ধকার জগত থেকে ফিরে এসেছে সে, কিন্তু এখনো সেই মৃত্যুর একটু শীতল স্পর্শ মাথায় ভিতরে রয়ে গেছে। দুই জগতের মধ্যবর্ত্তী মানসিক অবস্থার ভিতরে সে অনুভব করতে পারল: ভীম তার সব শক্তি আহরণ করেছে অবিচার, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অপমানের অন্তর্নিহিত তাপ থেকে। অন্তরের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসা নিয়ে সে জ্বলে উঠেছে। পাণ্ডবদের শক্তিকে তুচ্ছ কিংবা অবহেলা করা যায় না, এই কথাটা জানান দেবার জন্যে সে যেন বড় বেশী নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। ভীম তার বল বিক্রম, সাহস, স্পর্ধা দিয়ে যেন আরো প্রমাণ করল স্বভাব নিরীহ পাণ্ডবেরা অত্যাচারীর যম। অপরাধ, অন্যায়, অধর্মের কোন ক্ষমা তারা জানে না। প্রয়োজন হলে তারা কত নির্দয় আর নিষ্ঠুর হতে পারে জরাসন্ধকে হত্যা করে তার সংকেত দিলে। এটা পরোক্ষভাবে তাদের শত্রুদের পাণ্ডব বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক এবং সাবধান হওয়ারই সংকেত।

এইসব ঘটনা ব্যাসদেবের ভিতরে উপর্যুপরি বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল। গম্ভীর, ধীর, সাহসী ও বিচক্ষণতা মিশিয়ে বেশ একটা অদ্ভুত ভাবমূর্ত্তি তৈরী করেছে পাণ্ডবেরা। ব্যাসদেবের ভিতরটা গমগম করতে থাকে এক অদ্ভুত উত্তেজনায়। এক বৃহৎ দেশের অগণিত দুঃখী ব্রাত্য মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে অনার্য কন্যা হিড়িম্বা উলুপী এবং চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে পাণ্ডবদের গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক হঠাৎ ব্যাসদেবের বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল করে তুলল।

অন্তর্গত এক উত্তেজনায়, আশায়, প্রত্যাশায় ব্যাসদেবের বুকের ভেতরটা দপদপ করছিল। একটু আশা ভরসা জাগল। মনের ভিতর একটু জোর পেল। নানা ঘটনার ওলট পালট স্রোতে যেভাবে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দূরে তাতে বেশ হতাশ হতে হয়েছিল তাকে। তবু একটা স্থির প্রত্যয়ভূমি ছিল পাণ্ডবদের উপর। আজ তাকে ফিরে পাওয়ায় অসীম আনন্দে তার দুই চোখ সহসা ঝাপসা হয়ে গেল।

ব্যাসদেব তার অশান্ত মনকে স্নিগ্ধ আর প্রসন্ন করতে প্রকৃতির দিকে চেয়ে রইল। ভারী মোলায়েম একটা হাওয়া বইছিল। গভীর নীল আকাশে সাদা মেঘ তার খুশি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ভিতরকার ক্ষত ও রক্তপাত ব্যাসদেব ভুলে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

জরাসন্ধ নিহত হলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করল। যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক হল ব্যাসদেব। তাই ব্যাসদেবকেই যুধিষ্ঠির বলল: পিতামহ যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ কাকে দিলে ভাল হয় আপনি স্থির করুন।

ব্যাসদেক অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ যুধিষ্ঠিরের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করল। একটু হেসে বলল: এই দায়িত্ব তুমি না নিয়ে আমাকে দিচ্ছ কেন? কৃষ্ণ আছে, তাকে'ত দিলে পারতে।

একটা ভয় ছুঁয়ে গেল যুধিষ্ঠিরের ভেতর। নিজের সেই আশংকটাকে চট করে লুকিয়ে ফেলে বলল: পিতামহ, এত বড় গুরু দায়িত্ব আপনাদের মত প্রাজ্ঞ প্রাচীণ আত্মীয় উপস্থিত থাকতে যদি আমি করি তা-হলে আমার অহংকার ও স্পর্ধা প্রকাশ করা হয়। শুভদিকে আপনাদের আশীর্বাদ আমায় একমাত্র পাথেয়।

একথায় ব্যাসদেব কেমন যেন বিকল হয়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের বিনয়, শ্রদ্ধা, অনুরাগ এবং ভালবাসার এক অদ্ভুত সম্মোহনী আকর্ষণ ব্যাসাদবকে অভিভূত করল। কিন্তু যুধিষ্ঠির তার মুগ্ধতার দিকে না তাকিয়ে বলছিল: সখা কৃষ্ণ'র মনের অবস্থা ভাল নয়। হয়ত কোন ছোটখাট ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি, অপরাধে তার মন বিষণ্ন। হয়ত একটু অভিমানও আছে। তাই, কোন কিছুই গায়ে মাখছে না। সব তাতে কেমন একটা উদাসীন অন্যমনস্কভাব। এই সভায় কৃষ্ণের মত আপনিও আমাদের পরম আত্মীয় ও শুভাকাংখী। আমাদের স্বার্থ, সুবিধে এবং ভাল দেখবেন এবং বুঝবেন, আর কেউ সেটা করবে না।

ব্যাসদেবের মুখে কোন কথা যোগাল না। যুধিষ্ঠির চিরকাল গম্ভীর, কম কথার মানুষ। কিন্তু কৃষ্ণের মত সেও যে চতুর হয়েছে ব্যাসদেবের জানা ছিল না। তাই বেশ কিছুটা অবাক হয়ে ব্যাসদেব তাকে দেখতে লাগল।

কৃষ্ণপ্রাণ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচন করতে চায় আভাসে ইংগিতে তা বলেছে। কিন্তু নিজে মুখে সে কথা উচ্চারণ করলে রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠবে। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ঐ প্রস্তাব আনলে যুধিষ্ঠিরের কোন দায়িত্ব থাকবে না। তাই, রাজনীতির বাইরের এমন একজন লোক যুধিষ্ঠির নির্বাচন করল যার সম্পর্ক কারো

কোন সন্দেহ নেই। এতে যুধিষ্ঠিরের এক ঢিলে দুই পাখী মারা হল। তাকেও সম্মান জ্ঞাপন করা হল। নিজেও সে দায়মুক্ত হল।

দীর্ঘকাল ধরে কৃষ্ণ খুব ধীরে সুস্থে যে মহৎ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মানুষের অন্তরে পুরুষোত্তমের ভাবমূর্তিটি তৈরী করল যুধিষ্ঠির তাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ দিয়ে গৌরবান্বিত করতে চায়। কৃষ্ণ পুরুষোত্তমের অর্ঘ পাওয়ার একমাত্র যোগ্য। তথাপি কৃষ্ণ বিরোধী রাজন্যবর্গের ক্রোধ, আক্রমণ, বিরোধিতা থেকে কৃষ্ণ রেহাই পাবে না। তাই, কৃষ্ণবিরোধী রাষ্ট্রজোটের অন্তর্গত কোন কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে কৃষ্ণের নির্বাচন করলে ঐ সংকট হয়ত এড়ানো সম্ভব বলে ব্যাসদেবের বিশ্বাস। কৃষ্ণানুরাগী সেই ব্যক্তিটি হল পাণ্ডব কৌরবের পিতামহ ভীষ্ম। ব্যাসদেব তার কূটবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল আসন্ন কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষে ভীষ্মকে জড়িয়ে রাখাটাই উচিত হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ব্যাসদেব বলল: বৎস, নিজেকে কোন জটিল রাজনীতিতে আমি জড়িয়ে ফেলব না। সামনে যে নিদারুণ সংকট আসছে, তার কথা ভেবে আমার চিত্ত চঞ্চল। আমার প্রচ্ছন্ন থাকাই মঙ্গল। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বপ্রাচীন এবং প্রধান হল মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ সত্যব্রত ভীষ্ম। বিদুরের মুখে শুনেছি ভীষ্ম কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, চরিত্রমাধুর্য, শৌর্য, বীর্য, মহানুভবতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তুমি তাকে অর্ঘলাভের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করলে সব কুল রক্ষা পায়। অর্ঘলাভের অধিকার থেকে তাকেও যেমন বঞ্চিত করা যাবে তেমনি কৃষ্ণকে এত বড় দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করার জন্যে বিরোধীরা খুশি হবে। ভীষ্ম কৃষ্ণকে নির্বাচন করলে তুমিও অপ্রিয় হবে না এবং বিরোধীরাও সহজে সন্দেহের চোখে দেখবে না। ভীষ্ম ধার্মিক সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেচক। ভীষ্ম তোমাদেরও পিতামহ। এই মর্যাদা তাঁকে তোমাদের প্রতি আরো স্নেহপরায়ণ করে তুলবে।

ব্যাসদেবের পরামর্শে যুধিষ্ঠির সমবেত রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে কৃতাঞ্জলিপুটে বলল: সমাগত মহামান্য অতিথিবৃন্দ, আজ আমাদের পরম আনন্দ ও গর্বের দিন। আপনাদের সকলের সঙ্গে এই সুখ ও তৃপ্তি আমরা বণ্টন করে নিতে চাই। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা বিভেদ বিদ্বেষের রাজনীতির অবসান হোক, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার শুভ অঙ্গীকারকে জয় যুক্ত করতে পারে এমন একজনকে রাজসূয় যজ্ঞের শ্রেষ্ঠব্যক্তির অর্ঘ দেওয়া হোক। এই নির্বাচনের দায়িত্ব আমি পিতামহ ভীষ্মকেই দিলাম। পিতামহ আমার অনুরোধ গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

অমনি যজ্ঞ সভার চতুর্দিকে বেশ একটা উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির মূলে তারা পৌঁছিতে পারল না বলে একটা উৎফুল্লভাবের জোয়ার এসে লাগল তাদের খুশিতে।

ভীষ্ম সহসা অতল সাগরে গিয়ে পড়ল। সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তির যোগ্যতা নিরূপণ অতীব দুরূহ। তবু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কৃষ্ণকেই তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির

অর্ঘদানের যোগ্য বলে মনে হল। সত্যিকারে কৃষ্ণই বিভেদ-বিদ্বেষের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে এক মুক্ত মহান ভারতবর্ষ গঠন করতে চেয়েছে। মানুষে মানুষে ও রাজ্যে রাজ্যে প্রীতি, মৈত্রী, সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা এবং সহবস্থানের উপর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্বন্ধ স্থাপনের যে উদ্যোগ কৃষ্ণ করে চলেছে তাকে মনে প্রাণে স্বাগত জানানোর জন্যে উন্মুখ হয়েছিল ভীষ্মের প্রাণ মন। আকস্মাৎ এরকম একটা সুযোগ পেয়ে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠব্যক্তি অর্ঘদানের যোগ্যতম ব্যক্তিরূপে নির্বাচন করল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের উদ্দেশ্যকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হলে কৃষ্ণকে ছাড়া আর কারোকে ঐ অর্ঘের প্রার্থী বলে কল্পনা করা যায় না।

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধের পর বশ কিছুক্ষণ সময় কাটল। সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের ভেতর নীচু স্বরে নানারকম কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। ভীষ্ম ঘোষণার জন্যে উঠে দাঁড়ালে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ তৎক্ষণাৎ শান্ত ও নীরব হয়ে গেল। ভীষ্ম চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ আমন্ত্রিত নৃপবর্গের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল: মহামান্য অতিথি-বৃন্দ ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি যুধিষ্ঠির আমাকে অগ্রজের যে মর্যাদা ও সম্মান দিল তার আনন্দ ও তৃপ্তিতে আমার হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সে জয়ী হোক, রাজা হোক, সত্যে সুন্দর হোক এই কামনা করি। পঞ্চ পাণ্ডবের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় শুধু নয় যার ইচ্ছায় এই যজ্ঞ সভা মহামানবের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল, যার সান্নিধ্য সর্বজনকে তৃপ্ত করে, যার বচন শ্রবণে হৃদয় আকুল হয়। সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কারও কথা আমার মনে আসছে না। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, তেমনি সমাগত সকল জনের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রমে মানবিকতায় কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। তারই জন্য এই সভা আলোকিত ও আহ্লাদিত হয়েছে—তুমি তাকেই ঐ অর্ঘদান কর যুধিষ্ঠির।

ব্যাসদেবের বুকের গভীর থেকে একটা নিঃশ্বাস উঠে এল। জরাসন্ধের তিরো-ধানের পর ভারত রাজনীতিতে দুর্যোধন ও শিশুপালের অশুভ প্রভাব এবং দৌরাত্ম্য ক্রমবর্ধমান। আপাতত তা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়ার একটা রাস্তা তৈরী হল। কিন্তু এইবারে রাজনীতিতে এক নতুন খেলা শুরু হবে যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের মধ্যে।

পাণ্ডবদের সৌভাগ্য দুর্যোধনের অন্তরে যে ঈর্ষাগ্নি প্রজ্বলিত করল তার আগুন দুর্যোধনের বুক থেকে কোনদিন নিভবে না। দুর্যোধন এক জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে যাচ্ছে। যার আগুনে সে নিজে দগ্ধ হবে অন্যকেও দগ্ধ করবে। ঈর্ষার আগুন শুধু নিজের জ্বলার জন্য নয়, অপরকেও জ্বালানোর জন্যে। তার মানে দুর্যোধনের মনের আগুনে তার রাজ্য জ্বলবে, রাজপরিবার পুড়ে ছারখার হবে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি এক অদ্ভুত আরাম আর তৃপ্তিতে তার দুই চোখ বুজে এল। বহুকালের ইচ্ছেটা ঈর্ষার শিখা হয়ে যেন ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে জ্বলতে

লাগল। ব্যাসদেব কল্পনায় দেখতে লাগল বিশাল হস্তিনাপুর নগরী আগুনে পড়ছে, অগ্নিশিখার লাল হয়ে আছে পিঙ্গল আকাশ। সামনের দিকটা অন্ধকার।

রাজসূয় যজ্ঞ থেকে কৌরবেরা যে অপমান, আত্মগ্লানি আর ঈর্ষা নিয়ে ফিরল তাতে পাণ্ডব ও কৌরবের আত্মীয়তা চিড় খেল। কৌরবেরা এই অপমান যে কোনদিন ভুলতে পারবে না তা ব্যাসদেব রাজসূয় যজ্ঞ থেকে ফিরেই টের পেয়েছিল। প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে এবার প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেবে তাতে ব্যাসদেবের মনে কোন সন্দেহ রইল না। শীঘ্রই পাণ্ডব ও কৌরবের বিরোধ দ্বন্দ্ব প্রতিহিংসানলে জ্বলে উঠবে। এরকম একটা ছবি নিজের মত কল্পনা করে নিয়ে ব্যাসদেব ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করল।

কিন্তু খুব বেশিদিন ব্যাসদেবকে অপেক্ষা করতে হল না। অল্পকাল পরে বিদুরের দূত খবর দিল পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে বনগমন করেছে। ধৃতরাষ্ট্রেরা ক্রোধে, অপমানে অন্ধ হয়ে দ্যূতপণে পরাজিত পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়তম মহিষী কৃষ্ণাকে সভাকক্ষে সর্বজনসমক্ষে বিবস্ত্র করতেও ধৃতরাষ্ট্রেরা কুণ্ঠিত হয়নি। এতবড় একটা নারী নির্যাতনের নীরব সাক্ষী ছিল পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র বিদুর, অস্ত্রগুরু দ্রোণ, আচার্য কৃপ প্রমুখ সম্মানীয় ব্যক্তিরা। কৃষ্ণার কাতর আকুতিতে পাষাণ ফলক বিদীর্ণ হল. কিন্তু এদের কারো হৃদয় গলল না। যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেই থাকল। বর্বরদের হাত থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতেও এল না। এমন কি তাকে দুটো সান্ত্বনার কথাও কেউ শোনাল না। অসহায় কৃষ্ণা, নিরুপায় কৃষ্ণা পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়া পঞ্চস্বামীর সম্মুখে নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা এবং অপমানিতা হল। পঞ্চপাণ্ডবের ভাষাহীন, অভিব্যক্তিহীন নীরব ক্রোধ ক্ষোভ অপমান যেন তাদের ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসের হিস্ হিস্ শব্দে সাপের মত গজরাচ্ছিল। তাদের উত্তেজিত মুখ দুর্যোধন দুঃশাসনের মুখোমুখি স্থির। তাদের জ্বলন্ত দুই চোখ বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে উঠল প্রাণ প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত ভয়ংকর আর অপরূপ দেখায়।

এই ঘটনায় ব্যাসদেবের সমস্ত কল্পনা. চিন্তা ভীষণ ভাবে নাড়া খেল। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল। এমন ভাগ্য বিপর্যয় যে বাস্তবে সত্যিই হয়, অথবা, আদৌ হওয়া সম্ভব, পাণ্ডবদের না দেখলে ব্যাসদেবের প্রত্যয়ই হত না। হবে কোথা থেকে? কত দুঃখ কষ্ট, দুর্ভাগ্য আর প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তারা স্বপ্নের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল ইন্দ্র প্রস্থে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাস্তা, ঘাট, নগর সৌন্দর্যের সব কিছু ছিল—পাণ্ডবদের বড় মমতার সামগ্রী। প্রতিটি সামগ্রী সংগ্রহ করতে তাদের বহু

মেহনত করতে হয়েছিল। নিজেদের সুনাম গর্ব, খ্যাতি আগামী বংশধরদের কাছে পাকা করার জন্যেই এসব করা। কিন্তু এমন করে তাদের জীবদ্দশাতেই ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার চ্যুত হবে, স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কি করে জানবে যুধিষ্ঠিরের দ্যূত ক্রীড়ার আসক্তি এমনি করে একটা খেলার স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে পারে। এই স্বপ্ন ভঙ্গ শুধু পাণ্ডবদের হয়নি, ব্যাসদেবের নিজেরও হল।

ব্যাসদেবের ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হল এই মুহূর্তে। কত প্রতীক্ষা, পরিকল্পনা। চাতুরী, সহিষ্ণুতা, শ্রম এবং দৈব আনুকূল্যে অম্বিকার উপর প্রতিহিংসার যে দুর্গটি গড়ে উঠেছিল তা যেন তাসের ঘরের মত হঠাৎ ভেঙে গেল। পাণ্ডবদের দাঁড়ানোর মত পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত থাকল না। রাজ্য, সিংহাসন, রাজ মর্যাদা গৌরব, ঐশ্বর্য, সম্পদ সব এখন দুর্যোধনের। অথচ এজন্যে দুর্যোধনকে কোন অভিযান, যুদ্ধ, কিংবা রক্তপাত পর্যন্ত করতে হল না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এরকম অসম্ভব অকল্পনীয় ঘটনা ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদের জীবনে কেমন করে ঘটল ? ভাবতে ব্যাসদেবের বুক ভেঙে গেল।

পাণ্ডবদের দৈব দুর্বিপাকের বিড়ম্বনা তার নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হল। বারংবার মনে হতে লাগল তার জীবনেও দুর্ভাগ্যের কালো রাত্রি নেমেছে। এক ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে নতুন করে আবার যাত্রা শুরু করতে হবে আর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু ততদিন কি তার নিজের স্বপ্ন, আকাংখা, স্পৃহা সজীব থাকবে ? এ জীবনে অম্বিকার অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হবে কি ? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল ব্যাসদেব। রাত্রির তপস্যার শেষে নতুন করে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য পাণ্ডবদের হবে কি ? কিন্তু কবে সে সূর্যোদয় হবে ? এক, দুই তিন, নয় বারোটা বছর কাটবে। তারপর, আরো এক বছর অজ্ঞাতবাস। এই সময় কোন ক্রমে যদি তাদের আত্মগোপন কেউ টের পায়, তা-হলে আবার বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে।

ব্যাসদের হতাশ হয়ে বসে পড়ল বারান্দায়। উঠার শক্তি পর্যন্ত তার আর রইল না।

ব্যাসদেবের বয়স হয়েছে অনেক। শক্তি, সামর্থ, উদাম, তেজ ও কমে গেছে। মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন এখন নিভন্ত। তার তেজ গিয়েছে কেবল তাপটুকু আছে। অম্বিকার অপমানের স্মৃতি এখন অস্তগামী সূর্যের মত মনকে রাঙিয়ে রেখেছে। বার্ধক্য জনিত অক্ষমতা, অবসাদ, ক্লান্তি মাঝে মাঝে তাকে নিরুৎসাহ করে দেয়। কেবল একটা অভ্যাস আর জেদের নেশায় যেন কিছু করতে চাওয়া। কিন্তু ভিতরে ঘুমন্ত প্রতিহিংসাকে আর জাগাতে পারে না। কতবার চেষ্টা করেছে। তবু পারে নি। হেরে গেছে। কিযে করতে চায় মন কিছুই ভাল করে বুঝতে পারে না। অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতার হয়। মনে হয় মহৎ কিছু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু

প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব, প্রতিশোধের উন্মত্ত তাতো যেন ঋষি থেকে একজন সাধারণ মানুষে নামিয়ে এনেছে। কিন্তু তবু সাধারণ মানুষও হতে পারি নি।

পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাস ব্যাসদেবকে ক্লান্ত করল। একটা বিপর্যয়ের পর দীর্ঘ প্রতিক্রিয়ার দিনগুলো ভয়ংকর আর দুঃসহ লাগল। জীবনের গতি কত বিচিত্র। এর বাঁকে বাঁকে কত অঘটন, বিপর্যয়, রঙ্গ তামাশা। মানুষ কত আশা করেই সংসার গড়ে, আর মানুষের সৃষ্টিকর্তা কত নিপুণ ভাবে সেই সংসার, স্বপ্ন আবার ভাঙে। মানুষের জীবনটা নদীর ভাঙা গড়ার মত।

পাণ্ডবদের জীবনে যা ঘটল তা যে খুব একটা বড় কিছু ছিল, তাদের দেখে কখনও তা মনে হল না ব্যাসদেবের। সততা, নিষ্ঠাঃ বিশ্বাস ও ধৈর্যের সঙ্গে তারা বছরের পর বছর বনে কাটাতে লাগল। অথচ সেজন্যে কোন প্রতিবাদ বিদ্রোহ কিংবা নিয়ম ভাঙার প্রবণতা তারা দেখাল না। একমুখী লক্ষ্যের দিকে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল অবিচল ভাবে।

কয়েকটা বছর কাটল। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের সংযম, নিষ্ঠা, সত্য ও ধর্মের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর অনুরাগ দেখে শুধু আশ্চর্য হল না, তার ভিতরেও এক কোমল অনুভূতির সৃষ্টি হল। সত্য ও ধর্মের যে নিজস্ব একটা দীপ্তি আছে শক্তি আছে পাণ্ডবদের চোখে মুখে তার দীপ্তি ও তেজ দেখল ব্যাসদেব। লাঞ্ছনা, অপমান, প্রতিহিংসার জ্বালা যন্ত্রণা বুকের মধ্যে সংহত করে বিপুল শক্তি ও তেজে যেন তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই জ্যোতির্ময় মুখশ্রী, দীপ্ত বরাভয় রূপ একটা ফুৎকারে ব্যাসদেবের অন্তরে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উড়িয়ে দিল। বুকে বল এল। বৃদ্ধ বয়সেও নতুন উদ্যমে, উৎসাহে তাদের পাশটিতে এসে দাঁড়াল। পাণ্ডবদের স্পর্শে তার ভিতরে তেজ ও সাহস সংক্রামিত হল আবার। মনে হল, পৃথিবীর দুঃখ, সন্তাপ, দুর্দৈবের সঙ্গে আরো বহুকাল সংগ্রাম করতে পারবে। শুধু অধিকার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে যুদ্ধ চাই। একটা ভয়ংকর বড় যুদ্ধ। যে যুদ্ধের স্মৃতি আর চোখের জল আগামী প্রজন্মেও মুছবে না।

ব্যাসদেব একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল। মনে মনে বলল ঃ চলাই আমার নিয়তি। আমি কোথাও থাকবার জন্যে জন্মাইনি। কারো ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কাজও আমার নয়। আমি চলমান মহাকাল। ঈশ্বর আমার মাধ্যমেই তাঁর কাজ করান। মনের মধ্যে তাঁর নির্দেশ এসেছে। আর বসে থাকবার জো নেই। ঈশ্বরই তাকে পায়ে চলার শক্তি দিল।

ব্যাসদেব ধীরে ধীরে উঠল। কুটীর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার বেশ ফিকে হয়ে গেছে। গাছের ডালে ডালে পাখীরাও জেগে উঠেছে।

ব্যাসদেবের জীবনে এক মহাসংগ্রামের সময় শুরু হল। সংগ্রাম সারা জীবনই করেছে। কিন্তু একটা সংগ্রামকে অতিক্রম করতে গিয়ে আর একটা সংগ্রামের

কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আত্মপরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তার সংগ্রাম বাইরের সঙ্গে শুধু নয়, ভেতরের সঙ্গেও। ভেতরের সঙ্গে যে সংগ্রাম আর বিরোধ তা হল সবচেয়ে ভয়ংকর আর কঠিন। ব্যাসদেব সেই কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েই দ্বৈতবনে যাত্রা করল।

দ্বৈতবনের পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে যুধিষ্ঠির। প্রতিদিন ভাবে, আজই বুঝি তাদের পিতামহ আসছে। কিন্তু দিন মাস বছর যায়, তবু ব্যাসদেব আসে না। এর ভেতর সখা কৃষ্ণ, বলরাম এবং যাদব প্রধানদের নিয়ে সদলবলে দ্বৈতবন ঘুরে গেল। অনেক ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষিরা এল। কেউ কেউ তাদের সঙ্গে থেকে গেল। কিন্তু পিতামহ ব্যাসদেব তখনও পর্যন্ত এলনা।

অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হল। তখন মধ্যাহ্ন। রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাতাস বেশ গরম। ব্যাসদেবের সর্বশরীর স্বেদবিন্দু ছোট ছোট মুক্তার মত টলটল করছিল।

পঞ্চপাণ্ডবের কেউ ছিল না কুটীরে। দ্রৌপদী আপন মনে রন্ধনের নিমিত্ত কিছু কাঠ কাটারি দিয়ে কাটছিল। সহসা সেখানে মানুষের ছায়া পড়তে দ্রৌপদীর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস শব্দ করতে লাগল। বিদ্যুৎগতিতে সে কাটারি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ব্যাসদেবকে দেখে ভীষণ লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়ে টেনে দিয়ে লজ্জা ঢাকল। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করল। তারপর নিজের হাতে পাদ প্রক্ষালন করে তাঁকে বারান্দায় বসাল।

ছোট ছোট দু' একটা প্রশ্ন এবং কুশল জিজ্ঞাসার পর ব্যাসদেব কি বলবে. বুঝতে পারল না। দ্রৌপদীর জন্যে মনটা ভিতরে টাটাচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। তাকে সান্ত্বনা দিতে নয়, তার প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি জানাতে নিজের মনে বলল ঃ কল্যাণী, তোমার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। বুকটা কেমন করে। কিন্তু সবই কালের খেলা। এমনি করে মহাকাল মানুষের লোভ, অহংকার, মাৎসর্যের প্রতিশোধ নেয়। একটা সংসার, একটা বংশের ভূগোল, ইতিহাস এই ভাবেই মুছে যায়। একটা তুচ্ছ ভুলের উন্মাদনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের, কিংবা একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের সম্পর্কে চিড় ধরে। আর সেই ফাটলের ফাঁকে একটা অশ্বত্থের সর্বনাশা অঙ্কুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু সে অঙ্কুরটি যে কালের নিয়মে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটু একটু করে শাখায় প্রশাখায় বেড়ে উঠছে কেউ তা টের পায় না, লক্ষ্যও করে না কৌরব পাণ্ডবের পুরনো বিরোধ বিদ্বেষের ফাটলের ফাঁকে সেই অশ্বত্থ গাছটি তুমি। তুমি কালের ইন্ধন। পাণ্ডবদের এই বনবাস এও কালের নিয়মের ফলশ্রুতি। কাল

পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সকলকে প্রতীক্ষা করতে হবে। আর ঐ অশ্বত্থ গাছটির মত নিঃশব্দে নিজের ভেতরের শক্তি ও তেজ সংগ্রহ করতে হবে। মহাকালের অচল অনড় রথকে টেনে নিয়ে যাওয়ার তেজ তোমার মধ্যেই আছে। তুমিই পারবে। কালের রথের সারথী তুমি।

তাদের কথোপকথনের মধ্যে যুধিষ্ঠির এল। কুটীরে দ্রৌপদীর সঙ্গে ব্যাসদেবকে আলাপরত দেখে সে একটু অবাক হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল।

দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা দিন আনন্দেই কাটল দ্বৈপায়নের। এতদিনের সমস্ত ঘটনাটা পর্যালোচনা করে ব্যাসদেব অনেক ঘটনার অনেক ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু একবারও মনে হল না যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্যে কিছু করছে। তবে, একটু অনুভব করতে পারল সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে সে সংগ্রাম করতে চেয়েছে সত্যের জন্যে ধর্মের জন্য। এই আদর্শ নিয়েই সে বৎসরগুলো কাটাচ্ছে। কিন্তু এভাবে দিনগুলো কাটিয়ে যুধিষ্ঠির হয়ত ভুল করছে। হয়ত তার জীবনের যোগ বিয়োগের ভুল। এভুল শোধরাতে হবে।

ব্যাসদেব পাশের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকল ঃ যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ব্যস্ত ভাবে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠার ভাব। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল ঃ পিতামহ এত রাতে? আপনার শরীর কি অসুস্থ?

ব্যাসদেব চমকে তাকাল, সত্যি তখন অন্ধকার চারদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় বেশ একটু লজ্জা পেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যে। পরক্ষণে মনে মনে বলল ঃ হোক রাত। যুধিষ্ঠিরের ঘুমের যত ব্যাঘাতই হোক, তার লজ্জা পেলে চলবে না, সংকোচের বশে থেমে গেলেও হবে না। এই নিরিবিলি, নির্জন, নিঃশব্দ অন্ধকারই ভাল। এখন সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় এটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল সময়।

ব্যাসদেবের কণ্ঠস্বরে অন্য পাণ্ডবদেরও নিদ্রাভঙ্গ হল। তারাও উৎকর্ণ হয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। ব্যাসদেব সকলকে নিয়ে একটি শাল্মলী বৃক্ষের মূলদেশে বসল। সামান্য শব্দ করে হেসে বলল ঃ আমার চোখে ঘুম নেই বলে তোমাদের সকলের ঘুম ভাঙালাম। যতদিন যাচ্ছে তোমাদের দেখে অবাক হচ্ছি। তোমরা কত নিশ্চিন্তে কাল কাটাচ্ছ। একবারও ভাবছ না হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে তোমাদের কি করতে হবে? দুর্যোধনকে জেনেও তোমরা এতবড় ভুল করলে কেন? একবার অধিকার হারালে ফিরে পাওয়া শক্ত হয়। তোমরা'ত ভাল করেই জান, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। কিন্তু তোমাদের সে উদ্যোগ কোথায়?

যুধিষ্ঠির বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসের শর্ত পূরণ হলে দুর্যোধনের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা।

ব্যাসদেব গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল: শর্ত সে মানল না। তখন কি করবে?

তা-হলে আমরা যুদ্ধ করব।

যুদ্ধের জন্য তোমাদের প্রস্তুতি কোথায়? কি নিয়ে যুদ্ধ করবে? সৈন্য, অস্ত্র, রথ কোথায় পাবে? কে দেবে তোমাদের সাহায্য? কি আছে তোমার?

যুধিষ্ঠির চমকে তাকাল। গনগনে অভিমানে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। বলল: পাঞ্চাল বৃষ্ণি এবং যাদবরা সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে। তাদের প্রতিশ্রুতিকে আমরা সন্দেহ করব কেন?

ব্যাসদেবের ভুরু কুঁচকে গেল। ভ্রূকুটি করে বলল। স্থান কাল ও পরিস্থিতি আজ যেমন আছে কাল সেরকম নাও থাকতে পারে। আজকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আগামীকালকে বিচার করব কেমন করে? স্থান-কাল-পরিস্থিতি ভেদে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা বদলাতে হয়। একে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ মনে করলে তার উপর অবিচার করা হবে।

যুধিষ্ঠির একটু অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল: মহর্ষি এরকম কোন উৎকণ্ঠা কিংবা সংশয় প্রকাশের কারণ আছে কি?

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের সংশয়ে রাগ করতে পারত। কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীষণ সহজ সরল। কূটবুদ্ধিতে একদম পাকা নয়। তাই যথাসম্ভব শান্ত চিত্তে একটু হেসে বলল: আছে বৈকি? দুর্যোধনে বিশাল আর্যাবর্তের তিন চতুর্থাংশ নরপতির সমর্থনপুষ্ট। অগণিত বীর তার পক্ষে। এ অবস্থায় যে কোন দেশের পক্ষে তার বিরুদ্ধাচরণ করা সহজ নয়। দুর্যোধন আক্রান্ত হলে বৃহৎ আর্যাবর্ত তার সাহায্যে এগিয়ে যাবে। এর অর্থ, বৃষ্ণি বা পাঞ্চালেকে এক বিরাট যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। আমার ধারণা কার্যকালে তারা কেউ তোমার পাশে থাকবে না। তোমাকে নিজে কিছু করতে হবে।

যুধিষ্ঠির কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ব্যাসদেব বলল: কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, দুর্যোধন, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ও শল্যর মত অগনিত শ্রেষ্ঠ বীরের ছড়াছড়ি। এ অবস্থায় তোমরা যদি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সংগ্রহ ও মিত্রলাভ করতে না পার তাহলে তোমরা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। বনবাসে তোমরা সত্য পালন করছ, কিন্তু ধর্ম পালন করছ না। রাজার ধর্ম হল রাজ্য জয় করা, বাহুবল, অস্ত্রবল, সৈন্যবল সম্প্রসারিত করা। রাজার কর্মোদ্যম কখনও থেমে থাকে না। রাজা কখনও নিজের ক্ষুদ্র রাজ্য সীমানায় সন্তুষ্ট

থাকে না। সে চায় বিস্তার। নব নব জয়। তোমাদের সেই রাজদর্প শৌর্যবীর্যের তেজ কোথায়? বনবাসে সময়টাকে তোমরা অলসভাবে শুধু অপচয় করছ। অথচ, তোমাদের কত কি করার আছে? এত ঘা খেয়েও তোমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারলে না। আজও তোমরা বালকের মত নির্ভরশীল এবং পরমুখাপেক্ষী।

ব্যাসদেবের কথাটা যুধিষ্ঠিরের মনে গিয়ে বিঁধল। কর্তব্য না করার জন্যে ভিতরে ভিতরে নিজেকে তার দোষী মনে হতে লাগল। সত্যিই, এটা তার অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। উদ্যোগ, উদ্যমই সৌভাগ্যের মূল। দৈববলের সঙ্গে উদ্যোগ উদ্যম যুক্ত হলে তবেই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়। এসব জেনে বুঝেও সে কিছুই করিনি তার। নিজের অপরাধ অনুভব করে যুধিষ্ঠির চুপ করে রইল। ভারী অন্যমনস্ক-ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্য পাণ্ডবেরা গোঁজ হয়ে রইল। তাদের মুখের কথা যোগাল না।

ব্যাসদেব কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ করল না। খুব সহজ ভাবে অবলীলায় বলল: শোন বৎস। তোমাকে ও অর্জুনকে আমি স্বর্গলোকের ভাষা শিখিয়ে দিচ্ছি*। এই ভাষা আয়ত্ত করে অর্জুন উত্তর পশ্চিমে ইন্দ্রলোকে গিয়ে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বিদ্যা শিখে আসুক এবং ঐসব অস্ত্র সংগ্রহ করে আনুক।

ব্যাসদেবের কথাটা একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল অর্জুনকে। তার গায়ে কাঁটা দিল। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত আনন্দ ঢেউ দিতে লাগল। উৎফুল্ল হয়ে বলল: মহর্ষির কথায় আমি নতুন করে জীবন পেলাম। জ্যেষ্ঠ্যের আদেশ পেলে আমি এই দণ্ডেই যাত্রা করতে রাজি আছি।

যুধিষ্ঠির সস্নেহে অর্জুনের দিকে একটু তাকাল। তারপর ব্যাসদেবের দিকে চেয়ে বলল: মহর্ষি ইন্দ্র বিদেশী অর্জুনকে অস্ত্র শিখা দেবে কেন?

অর্জুন ইন্দ্রের ক্ষেত্রজ পুত্র বলেই দেবে। খুব সহজ কণ্ঠে ব্যাসদেব কথাগুলো উচ্চারণ করল। তারপর একটু থেমে বলল: শোন তৃতীয় পাণ্ডব, গন্ধমাদন ইন্দ্রনীল পর্বত পার হয়ে যখন যাবে তখন যাত্রা পথে কিন্নর দেশের গন্ধর্বগণের সঙ্গে এবং কিরাতদের সঙ্গে অবশ্যই বন্ধুত্ব করবে। তাদের অতিথি হয়ে সম্পর্ককে আরো গভীর এবং আন্তরিক করে নিও। প্রীতিমন্ত্রবলে মানুষের হৃদয় জয় করার কৌশল তোমার অধিক কে জানে? এই সব পাহাড়ী অনার্যরা অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী। এদের সাহায্য সহযোগীতা ব্যতিরেক তুমি ইন্দ্রলোকে পৌঁছতে পারবে না। ওরা তোমার যাত্রার সুবন্দোবস্ত করে দেবে। ইন্দ্র যাতে তোমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করে তার সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

অদ্ভুত! অদ্ভুত। মনে মনে বার বার বলল: যুধিষ্ঠির। তার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। এক অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল তার দুই চোখে।

*মহাভারতে বর্ণিত প্রতিস্মৃতি বিদ্যাকেই স্বর্গলোকের ভাষা বলেছি। —লেখক

আর, এক পরিপূর্ণ আনন্দে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল। আচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ অর্জুন, নিশান্তে, মহর্ষির আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুমি যাত্রা কর। আর কোন কালক্ষয় আমরা করব না।

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যেবেলায় ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে তার কুটীরে ডেকে পাঠাল। দরজাটা ভেজানো ছিল। যুধিষ্ঠির খুব সন্তর্পণে দরজাটা ঠেলে ঢুকল। তারপর থমকে দাঁড়াল। চৌকির উপর ব্যাসদেব চুপ করে বসে। চোখ বোজা। শিরদাঁড়া সোজা করে ধ্যান করছিল। কিছুক্ষণ কাটার পর মৃদুস্বরে ডাকল ঃ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বস। কাল প্রত্যুষেই দ্বৈতবন ছেড়ে যাব। তাই গুটি কয়েক কথা বলতে তোমায় ডেকেছি।

যুধিষ্ঠিরের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। কোমল কণ্ঠে বলল ঃ আদেশ করুন।

ব্যাসদেব একটু মুচকি হেসে বলল ঃ যদি তিরস্কার করি।

তা-হলে আমার প্রাপ্য বলেই জানব। কোমল স্বরে বলল ঃ যুধিষ্ঠির। বলার সময় তার মুখে একটা করুণ ভাব ফুটে উঠল।

ব্যাসদেব তার মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে হঠাৎ হেসে বলল ঃ তোমার এই বনে বাস করা আর ঠিক হবে না। এখানে বহু অনুরাগী প্রজাকুল নিয়ে যে বিরাট সংসার পাতিয়ে বসেছ তা মোটেই গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপযুক্ত নয়। এদের ইন্দ্রপ্রস্থে, হস্তিনাপুরে ফিরে যেতে বল। কেউ যদি ওখানে ফিরে যেতে ভরসা না পায় তাহলে পাঞ্চাল রাজ্যে এবং দ্বারকায় থাকতে বল। তোমরা তীর্থযাত্রার নাম করে এই অরণ্য ছেড়ে উঁচু পর্বতদেশে গিয়ে বাস কর। নৈমিষ্যারণ্য অতিক্রম করে গোমতী নদী পার হয়ে কন্যাতীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ হয়ে কালকোটি ও বিষগ্রস্থ পর্বতে গিয়ে বাস কর। সেখানে লোমশ ঋষি আছেন।

তাঁর কাছে বিবিধ শাস্ত্র পাঠ নেবে। এর মধ্যে অর্জ্জন সমগ্র দেবলোক, ঘুরে বহুবিধ অস্ত্র শিক্ষা করে শ্রেষ্ঠ এবং দুষ্প্রাপ্য দেব অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। তোমরা তার সঙ্গে বদরিকায় নরনারায়ণ আশ্রমে মিলিত হবে। যখন যে অঞ্চল অতিক্রম করবে তখন সেই অঞ্চলের যেসব পাহাড়ী অনার্য নরপতি আছেন তাদের সঙ্গে সখ্য সম্পর্ক স্থাপন করবে। বিশাল ভারতবর্ষে এদের সংখ্যাই বেশি। এরা খুবই বিশ্বস্ত এবং হৃদয়বান। তোমাদের অনার্যপ্রীতি সারা ভারতবর্ষে সুবিদিত। এদের বন্ধুত্ব অর্জন হবে তোমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের অনুকূলে একটি বৃহৎ কাজ। ভারত-যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয় তাহলে এরাই হবে তোমাদের বিশ্বস্ত আত্মনিবেদিত সৈনিক। দম না ফেলে কথাগুলো একটানা বলে থামল ব্যাসদেব।

যুধিষ্ঠির জবাবে কি বলবে ভেবে পেলনা। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে তার বুক ফুলে উঠল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কিছুক্ষণের জন্যে যে নিজের ভাবনায় অন্য-মনস্ক হয়ে গেল। দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারিয়ে যখন দূর বনে এসে বসবাস করতে

লাগল তখন তার চোখের সামনে ভবিষ্যত বলে কিছু ছিল না। বোধ হয় বর্ত্তমান বলেও কিছু ছিল না। শুধু ছিল একটা অতীত। তা সে অতীতটাও ছিল এত ভয়নক যে তা স্মরণ করতেও ভয় লাগত। আসলে ভবিষ্যৎ তারই থাকে যার আশা থাকে। একদিন কাম্যকবনে কৃষ্ণকে পেয়ে তার এই কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তবু সেই আশার দীপ জ্বালানোর মত কোন ইন্ধন ছিল না। ব্যাসদেব তাকে আজ আশার আলো দেখাল বলেই আশা হল। নিজের প্রতি একটা ভরসা বিশ্বাস জাগল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের একটা স্পষ্ট ছবি সে এখন কল্পনা করতে পারল।

কথাগুলো মনে হতে বুকটা একটু কেমন করল। গভীর শ্রদ্ধায় মনটা দীন হয়ে গেল। মাথা নুয়ে এল আবেগে। দীন নম্র হৃদয়ে অস্ফুট স্বরে বলল ঃ মহর্ষি, নিজের ইচ্ছায় কখনও কিছু হয়নি জীবনে। আপনার ইচ্ছায় ও চেষ্টাতে সব হয়েছে। আপনি না থাকলে হস্তিনাপুরে আমাদের কোন স্থান হত না। দ্রৌপদীকে পেতাম না। ইন্দ্রপ্রস্থও হত না। আজ যখন ইন্দ্রপ্রস্থ হারালাম আবার, তখন তাকে ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন আপনিই সৃষ্টি করলেন অন্তরে। আশার দীপ জেবলেছেন বুকে। আপনার এই অপার করুণা আর স্নেহের কোন তুলনা হয় না। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। শুধু একটা নিবেদন আছে আমার। অনুমতি করলে নিবেদন করতে পারি।

ব্যাসদেব বলল ঃ নির্ভয়ে বল।

বারো বৎসর সমাপনান্তে কোথায় কিভাবে আমরা অজ্ঞাত বাস করব আপনি তার উপায় নির্ধারণ করে দিন।

ব্যাসদেব একটু হেসে বলল ঃ বিরাট রাজার গৃহেই তোমরা থাকবে। যথাসময়ে আমি তাঁকে কয়েকজন কর্মী নিয়োগের অনুরোধ করব। আমার কথা বিরাট কখনও অমান্য করবে না। তোমরা তার কর্মচারী হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করবে। ভুলেও বিরাটকে জানতে দেবে না তোমাদের আসল পরিচয়।

দশ

বারো বছর বনবাস এবং একবছর অজ্ঞাতবাস নির্বিঘ্নে শেষ হল পাণ্ডবদের।

আত্মপ্রকাশ হল খুব নাটকীয় এবং রাজকীয়ভাবে। যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠল। অগণিত রথ, অশ্ব, হস্তী, রথী, মহারথী নিয়ে এক বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ হল বিরাট রাজ্যের সঙ্গে কৌরবদের। পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যের আশ্রিত। বিপন্ন বিরাট রাজকে রক্ষা করতে পাণ্ডবেরা সেই যুদ্ধে এক মহাবল দানবের মত শৌর্য, বীর্য, পরাক্রম, তেজ এবং রণকৌশল দেখিয়ে প্রমাণ করল তারা বেঁচে আছে। তাতেই জানাজানি হয়ে গেল। পাণ্ডবেরা যে রাজ্য লাভের আশা ছাড়েনি ; এই যুদ্ধ তার সংকেত এবং মহড়া। পাণ্ডবেরা বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে কিছু হারায়নি, তাদের শক্তি ক্ষয় হয়নি, মিত্রলাভ থেকে বঞ্চিত থাকিনি। বরং লোকচক্ষুর আড়ালে তেজও শক্তি সংহত করে আরো দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠেছে। এই যুদ্ধ তাদের ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রতিশোধ স্পৃহার একটা স্ফুলিঙ্গ। প্রতিপক্ষ এবং শত্রু কৌরবদের সতর্ক এবং সাবধান করার ইংগিত।

পাণ্ডবের বিক্রম দেখে দুর্যোধন মনে মনে প্রমাদ গণল। পুনরায় পাণ্ডবদের বনে পাঠানোর এক নতুন ছল সুরু করল। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ দাবি করার আগেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের দিনটি নিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ করল। গোলমাল পাকাল হস্তিনাপুরে, বললঃ পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস নির্দিষ্ট দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই জানাজানি হয়ে গেছে। সুতরাং ইন্দ্রপ্রস্থ ফেরৎ দেবার কোন কথাই উঠে না। বরং সত্য ও ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার আগে যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় দ্বাদশবৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে।

পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের ঘটনা নিয়ে এরকম একটা তর্কের যে ঝড় উঠবে ব্যাসদেব আগেই টের পেয়েছিল! পাণ্ডবেরা চান্দ্রবৎসরের হিসাব অনুসারে বনবাস এবং অজ্ঞাত-বাস করল। কিন্তু সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসরের হিসাবগত পার্থক্যের সুযোগগ্রহণ করে কৌরবরা পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস মানল না। সৌরবৎসর হিসাবে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার পাঁচ মাস বারো দিন আগেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বেদব্যাসের হিসাব হল চান্দ্রবৎসর মতানুসারে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার ত্রয়োদশ দিন পরে বিরাট রাজ্যে গোধন হরণকারী কৌরবদের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন থেকেই যুদ্ধ করেছে। তবু

দুর্যোধনের মতে পাণ্ডবরা নির্বাসনের শর্ত ভঙ্গ করেছে। সুতরাং হৃতরাজ্য প্রত্যার্পণের কোন দাবিই তাদের গ্রহণযোগ্য নয়।

পাণ্ডবদের সব দৌত্য নিষ্ফল হল। রণভেরী বেজে উঠল।

প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, অবিচার, আর অধর্মের আগুন জ্বলল হিরম্বতী নদীরতীরে কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে।

ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্যাসদেবের ঘুমই হল না সারা রাত। কত কথা কত ছবি মনে পড়ল তার। সে সব কথা মনে পড়লে স্বস্তি, শান্তি অন্তর্হিত হয়। দুঃখ বেদনায় মনটা বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ভীষ্মের সঙ্গে কোনদিন তার বনিবনা হয়নি, আবার কোন প্রকাশ্য চটাচটি কিংবা সংঘর্ষ-হয়নি। অথচ ভেতরে ভেতরে দুজনে দুজনের সঙ্গে লড়েছে গোপনে, খুব সাবধানে। সেই জটিল কুটিল নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণাম কৌরব-পাণ্ডবের মহাসমর। ভীষ্ম নিজের ভুলের, বিদ্বেষের, ঘৃণার, পক্ষপাতিত্বের প্রায়শ্চিত্ত করতেই যেন আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। কৌরবদের কাছে নিজের বিবেককে, সত্যকে, ধর্মকে বিক্রী করে দেবার আত্মগ্লানিতে জর্জরিত মন এমনিতে হাজার শরে বিদ্ধ হয়ে আছে। দৈহিক মৃত্যুর যাতনা তার তুলনায় কিছু নয় এটা বোঝাতে সে অস্ত্রত্যাগ করেছে। আগামী প্রজন্মের কাছে তার অন্যায়, অপরাধ, পাপকে চাপা দেবার এক অদ্ভুত কৌশল বলে ব্যাসের মনে হল। ভীষ্ম জানে মুখের ক্ষমা, ক্ষমা নয়। ক্ষমা সকলকে করা যায় না আবার। ক্ষমা চাওয়ার মধ্যেও কোন মহত্ব নেই। কিন্তু যাতে ক্ষমায় অতিরিক্ত শ্রদ্ধা পায় তার জন্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ। ভীষ্মের আত্মহত্যার সংবাদ তাই ব্যাসদেবের মনে কোন সহানুভূতি উদ্রেক করল না। এক ফোঁটা কপট চোখের জল ফেলে ভীষ্মকে অপমানও করতে পারল না। তবু ভিতরে ভিতরে তার জন্যে কেমন একটা দুঃখ হচ্ছিল।

রাত জেগে জেগে আত্মসমালোচনা করতে করতে ব্যাসদেবের মনে হল তারও কিছু ভুল হয়েছে। হয়ত তার জীবনের যোগ বিয়োগের ভুল। আশ্রমিক জীবনে মনে হয়েছিল সে বুঝি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। নিজের বন্ধনত তার কিছু নেই। আছে এক জননী। সেই কেবল তার সংসার এবং সমাজের বন্ধন। একদিন সেই বন্ধনটা তার জীবনের সব চেয়ে বড় বন্ধন হয়ে উঠল। কিন্তু সেদিন একবারও সেকথা মনে হয়নি। বরং ভেবেছিল যে নিজকে অস্বীকার করতে পেরেছে তার কাছে তো প্রয়োজনটা আর কোন বন্ধন নয়। দ্বৈপায়ন জানত, সন্ন্যাসজীবনের কামনা থেকে, ক্ষুধা থেকে, আঘাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। কিন্তু এ যে কত ভুল ছিল হস্তিনাপুরে গিয়ে বুঝল-প্রবৃত্তির ক্ষুধা থেকে সে পরিত্রাণ পাইনি। কিংবা 'তাকে নিবৃত্ত করতেই ঈশ্বর অম্বিকাকে দিয়ে অপমান, প্রত্যাখান করল।

কিন্তু আঘাত খেয়ে সে আরো জেগে উঠল। প্রতিহিংসা দুর্বার হয়ে উঠল রক্তে লক্ষ্য স্থির রেখেই সে এগিয়ে চলল আরো।

এই মুহূর্তে ব্যাসদেবের মনে হল, পথটাও সত্যি, পথের শেষটাও সত্যি সবই নিয়তির বন্ধন। এই পথটা অতিক্রম করল বলে সে জানতে পারল জীবনকে রাজনীতিকে। হয়ত সেজন্য তাকে একটু দুর্ভোগ পেতে হল, একটু যন্ত্রনা পেতে হল। কিন্তু তার নিজের যন্ত্রনায় একদিন সকলের কল্যাণ হয়ে সকলকে অভিষিক্ত করুক এটাই তার কামনা, এইটাই তার আকাংখা।

নিজেকে তার বড় নিঃসঙ্গ একা লাগল। পৃথিবীতে দ্বৈপায়নের মত মানুষদের কেউই থাকে না। কেউ থাকার জন্যে হয়ত দ্বৈপানের মত মানুষদের হয়ত জন্মই হয় না। কেউ যদি থাকবে তার, তা-হলে মানুষের মুক্তি কি করে আসবে? কি করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে? ইতিহাসের জন্যে তাকে ও ভীষ্মের দরকার। যদি ভীষ্মের সঙ্গে তার কোন ভিতরে ভিতরে বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঈর্ষা না থাকত তাহলে এই বিশাল যুদ্ধ হ'ত না। ইতিহাস তৈরী হত না। ধর্মের মুখোশ খুলত না। ভণ্ডামির সমাধান হ'ত না। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখের অবসান হত না। সাধারণ মানুষ, নিপীড়িত মানুষ জয়ী হ'ত না। এ যুদ্ধ নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এ সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে পাণ্ডবেরা ভেঙে পড়েছে। শোকে, দুঃখে পাণ্ডব শিবির স্তব্ধ। অর্জুন স্তম্ভিত। এক ভয়ংকর প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছে। জয়দ্রথকে হত্যা করে সে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে, কিন্তু দ্রোণের দুর্জয় আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত অস্ত্র পাণ্ডবদের কোথায়?

ব্যাসদেব সারা রাত নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল। ভোরের দিকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। সমস্ত তপোবনটা নিস্তব্ধ। ব্যাসদেব কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। তা-হলে? তাহলে কি করবে? সেত যোদ্ধা নয়; যুদ্ধের কিছু বোঝেও না। তবে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। তার ইন্ধন যোগাতে পারে, কিন্তু তাকে থামাতে পারে না। অবশ্য যুদ্ধ থামানোর কোন ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কিছু নেই তার। বরং এ যুদ্ধের কিছু ইন্ধন যোগানোর জন্যে তার এই মুহূর্তে পাণ্ডব শিবিরে যাওয়ার প্রয়োজন হল। ব্যাসদেব আর স্থির থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে সে এগোল।

সূর্যোদয়ের আগে পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছল ব্যাসদেব। অত ভোরে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে দেখে আশ্চর্য হল। হতভম্বের মত চেয়ে রইল। যুধিষ্ঠিরের চোখ দুটো হঠাৎ বড় কৌতূহলী হয়ে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির কি যেন দেখতে লাগল ব্যাসদেবের মুখের দিকে চেয়ে। একটা অজ্ঞাত বিপদ কল্পনা করে যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন স্বরে বলল: মহর্ষি! আপনি?

ব্যাসদেব কোন উত্তর দিল না। আপন মনে শিবিরে ঢুকল। তাতেই যুধিষ্ঠিরের মনে রহস্যটা ঘন ও গম্ভীর হল। কোন ভূমিকা না করে বলল : তোমরা যুদ্ধের সাজ-সজ্জায় সবাই ব্যস্ত এখন। এর মধ্যে কথা হয় না। তবু না বললেও নয়। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দুর্যোধনকে হতাশ করেছে। তাই তোমাকে বন্দী করার মতলব তার। আজ সর্ব শক্তি নিয়োগ করে যুধিষ্ঠিরকে হরণ করবে। যুদ্ধের শুরুতেই অনেকগুলি যুদ্ধের সূচনা করে সে সকলকে এমনি ব্যস্ত রাখবে, যাতে কেউ যুধিষ্ঠিরকে সাহায্য করতে না পারে। ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মা। পঞ্চভ্রাতা এবং তার সংশপ্তক বাহিনী নিয়ে অর্জুনকে আমরণ সংগ্রামে আহ্বান করবে। দ্রোণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যে কোন উপায়ে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে দুর্যোধনের হাতে দেবে। দুর্যোধন বন্দী ক্রীড়াসক্ত ধর্মরাজকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করে যুদ্ধের নিষ্পত্তি করবে। নিষ্ঠুর হানাহানি আর রক্তপাত নয়, দ্যূতক্রীড়ায় জয়পরাজয় নির্ণয় করা। এখন কি করলে ভাল হয় তোমরা স্থির কর।

যুধিষ্ঠিরের মুখ ভয়ে বিবর্ণ ও মলিন হল। কৃষ্ণের মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : সখা তুমি পথ বলে দাও।

কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে চেয়ে চোখের ইশারায় জানতে চাইল তার অভিমত। অর্জুন মাথা নীচু করে বলল : অগ্রজকে প্রাণপণে রক্ষা করব।

ব্যাসদেব অর্জুনকে প্রশ্ন করল : দ্রোণ সম্পর্কে তোমার কর্তব্য কি অর্জুন?

অর্জুন অসংকোচে বলল : গুরুহত্যা করতে আমি অক্ষম।

কৃষ্ণ কুপিত হয়ে বৃহস্পতির নীতি উদ্ধৃত করে বলল : সখা, গুণী, গুরু, বৃদ্ধও যদি আততায়ী হয়ে আক্রমণ করে, তাকে বধ করাই ধর্ম। এই হত্যায় কোন পাপ হয় না। সুকুমার বৃত্তিরও কোন ক্ষতি হয় না। বরং বিবেক পরিচ্ছন্ন থাকে। ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা গভীর হয়।

ব্যাসদেব বলল : দ্রোণকে হত্যা করার শক্তি ও অস্ত্র দুই পাণ্ডবদের নেই।

অর্জুন চমকে ব্যাসদেবের দিকে তাকাল।

যুধিষ্ঠির হতাশ গলায় বলল : তা-হলে?

ব্যাসদেব কৃষ্ণের চোখে চোখ রেখে অর্জুনের দিকে একপলক চেয়ে বলল : যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণরক্ষার্থে এবং শত্রুবধার্থে মিথ্যে বললে কোন পাপ হয় না। মিথ্যে ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হল যুদ্ধ কৌশল। তোমরা কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি কর। দ্রোণের মর্মদেশকে আঘাত কর। মর্মবিদ্ধ যন্ত্রণার তাপে, কষ্টে, দুঃখে, বেদনায় দ্রোণ অবসন্ন হয়ে পড়লে অস্ত্র চালনার আর কোন শক্তি থাকবে না তার বাহুতে। ভীষ্মের মতই দ্রোণ অসহায় মৃত্যু বরণ করবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

অগ্রাহয়ণের শেষ দিন।

সূর্য অস্তাচলগামী।

আকাশ রক্তের মত লাল। পাখীরা গাছেরডালে ডাক ভুলে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। একটু আগে ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধন দুই জানু ভেঙে রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।

অমাবস্যার কুয়াশা মাখা অন্ধকার ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে। জল স্থল অন্তরীক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কুহেলিকায়। দ্বৈপায়ন হ্রদের জল কালো হয়ে গেল।

কুরুবংশের শেষ বীর এবং বংশধর দুর্যোধন তখন দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আর তাকে ঘিরে মাংসভুক পশুর চোখগুলো ক্ষুধায়, হিংসায় লোভে অন্ধকারের মধ্যে জ্বল জ্বল করছে।

মাটিতে দুর্যোধন টান টান শুয়ে আছে। মুখ খোলা। ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের সারি। উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁকে দুর্বোধ্য কষ্টের একটা ক্ষীণ গোঙানির শব্দ থেমে থেমে হতে লাগল। পশুরা তাকে ঘিরে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তবু দুর্যোধন ক্ষীন ক্ষমতা দিয়ে হাত তুলে তাদের তাড়াতে লাগল! ক্রমে দেহ অবসন্ন আর নিস্তেজ হয়ে এল। একটু একটু করে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল তার সমস্ত চেতনা। একটা গভীর ঘুমের মধ্যে সে তলিয়ে যেতে লাগল। হাত তুলবার শক্তি পর্যন্ত রইল না। চোখের তারা উল্টে গেল। বুকের ওঠা নামা শ্বাসের শব্দ থেমে গেল। নিষ্প্রাণ দুর্যোধনকে নরমাংসভুক জানোয়ারেরা ঘিরে ধরল। থাবা দিয়ে, দাঁত বসিয়ে শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে নিতে লাগল।

দূরে, অন্ধকারে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল অনার্যরমণীর সেই জারজ পুত্র দ্বৈপায়ন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে দেখল অসহায় দুর্যোধনের করুণ যন্ত্রণায় মাংসভুক পশুর আক্রমণে তিলে তিলে কেমন করে মৃত্যু বরণ করল। দ্বৈপায়নের বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস নামল। কিন্তু মুখে কোন বিকার নেই। নির্বিকল্প মহাপুরুষ সে যে। তারই কোন দুঃখ কিংবা অনুশোচনা থাকতে নেই।

এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধের স্রষ্টা সে নিজে। [illegible] ঘৃণা প্রত্যাখ্যান, অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল দ্বৈপায়ন। দুর্যোধনের মৃত্যুতে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ হল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্ত হল। পাণ্ডবেরা শত্রুহীন হল। আর্যবর্ত বীরশূন্য হল। রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা শেষ হল।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত।

কর্মের গৌরবতৃপ্ত সমাপ্ত করতে দ্বৈপায়ন শেষ দর্শক হয়ে এল দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে। অমাবস্যার রাত্রি গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে সবাইকে, সব কিছুকে। কেউ আর কিছু দেখছে না, শুনছে না, জানছে না, কারও মুখে চোখে আর কোন প্রশ্ন নেই। কেবল ধারাবাহিক অবলুপ্তি।